জঙ্গীবাদ নির্মূলে গণমাধ্যমের ভূমিকা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

(Thesis Submitted For Mphil Degree)

Department of Public Administration
University of Dhaka

তত্ত্বাবধায়ক ঃ

প্রফেসর ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ
লোকপ্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

গবেষক ঃ

এ, বি, এম জিয়াউল কবির
বি এ (সম্মান), এম এ, এম ফিল গবেষক
রেজি নং: ১৬৮, সেশন: ২০০৯-২০১০
এস এম হল, লোকপ্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

DECLARATION

I declare that the dissertation entitled **"জঙ্গীবাদ নির্মূলে গণমাধ্যমের ভূমিকাঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত"** submitted to the University of Dhaka , Bangladesh for the degree of Master of Philosophy in Public Administration, is an original work of mine. No part of it, in any form has been submitted to any other University or institution for any degree or Diploma.

A.B.M Ziaul Kabir
Session 2009-2010

Dhaka University Institutional Repository

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to Certify that A.B.M Ziaul Kabir has Prepared this thesis entitled **"জঙ্গীবাদ নির্মূলে গণমাধ্যমের ভূমিকাঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত"** under my direct supervision. This is his original work. This thesis or any of its part has no where been submitted for any degree or publication.

Professor Dr. Nazmul Ahsan Kalimullah
Department of Public Administration
University of Dhaka

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

২০০১ সালের নাইন ইলেভেনের ঘটনার অব্যবহিত পরই জঙ্গীবাদ শব্দটি বাংলাদেশের গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হতো। রাজনীতিবিদরাও একে অন্যের বিরুদ্ধে জঙ্গীবাদ লালনকারী বা পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগ আনে। মূলত: তখন থেকেই এ বিষয়ে একটি গবেষণা করার সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী হওয়ায় সে বিভাগে এমফিল করার সুযোগ ছিলনা। অত:পর একদিন বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক স্যারের সাথে আলোচনা করলে স্যার অন্য বিভাগ থেকে এমফিল করার পরামর্শ দেন। বিষয় নিয়ে ইমরান হোসাইনের সাথে আলোচনা করেছি। এ গবেষণা করতে গিয়ে সমাজকল্যাণ বিভাগের শিক্ষক হাফিজুর রহমান আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন। রাষ্ট্রদূত সৈয়দ রাশেদ আহমেদ চৌধুরী সব সময় আমার গবেষণার অগ্রগতির খোঁজ খবর নিয়েছেন, সেজন্য তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। আমার তত্ত্বাবধায়ক জানিপপ চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহকে এ বিষয়ের কথা বলতেই স্যার একবাক্যে রাজি হলেন ও সার্বক্ষণিক তদারক করেছেন, এত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি যেভাবে সময় দিয়েছেন তা একবাক্যে অভাবণীয়। রাষ্ট্রদূত এম শফিউল্লাহ আমাকে সময় এবং বই দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহীম বীরপ্রতিক ও স্পেশাল ব্রাঞ্চের অতিরিক্ত ডিআইজি মাহবুব হোসেন খুব আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করেছেন। হাবিবুর রহমান ও আতিকুর রহমান এ কাজে আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। এ কাজটি করতে গিয়ে অনুপ্রেরণা দাতা আমার বাবা-মা, স্ত্রী ও দু'সন্তানকে অনেকটা সময় দিতে পারিনি। সর্বোপরি, যাকে দেখে গবেষণায় আগ্রহী হই, তিনি হলেন ড. আব্দুল হাই সিদ্দিকী। এছাড়াও যারা বিভিন্ন সময় যারা খোঁজ খবর নিয়ে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবাইকে আবারো অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করছি।

এ, বি, এম জিয়াউল কবির
এমফিল গবেষক
এপ্রিল, ২০১৪

ABSTRACT

শিরোনাম	**: জঙ্গীবাদ নির্মূলে গণমাধ্যমের ভূমিকাঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত**
গবেষকের নাম	: এ, বি, এম জিয়াউল কবির
তত্ত্বাবধায়কের নাম	: প্রফেসর ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ
বিভাগ/ইনস্টিটিউটের নাম	: লোকপ্রশাসন বিভাগ

বাংলাদেশ সহ বর্তমান বিশ্বে জঙ্গীবাদ একটি আলোচিত বিষয়। বিভিন্ন দেশে জঙ্গীবাদের উত্থান সে দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সহ অনেক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাইন ইলেভেন পরবর্তী সারাবিশ্বে সন্ত্রাসবাদ পরবর্তীতে জঙ্গীবাদ, বহুল পরিচিত পায়। বিশেষ করে জঙ্গীবাদের সাথে ধর্মকে জড়িয়ে বক্তব্য বিবৃতিও দেয়া হয় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দেশে। যদিও সন্ত্রাসবাদ তথা জঙ্গীবাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিয়ে মতভেদ রয়েছে নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মধ্যে। বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের অস্তিত্ব যে রয়েছে, সেটা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে সেটা কোন পর্যায়ে, কি অবস্থায় রয়েছে, জঙ্গীবাদীদের আদর্শ, লক্ষ্যও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা দেয়া,বাংলাদেশে জঙ্গী সংগঠনগুলোর অবস্থার পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়ার জঙ্গী সংগঠনগুলোর বিষয়ে ধারণা দেয়া হয়েছে এ গবেষণাপত্রে। গবেষণাপত্র তৈরি করতে গিয়ে ইন্টারনেট থেকে অনেক উপাত্ত নিতে হয়েছে। জঙ্গীবাদ বাংলাদেশের শান্তিপূর্ণ সমাজের জন্য হুমকি। তাই জঙ্গীবাদ নির্মূলে সমাজ, রাষ্ট্র ও গণমাধ্যমের দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে গবেষণাপত্রে।

গবেষণাপত্রের প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার যৌক্তিকতা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, গবেষণার অনুমিত সিদ্ধান্ত ও সাহিত্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। সাহিত্য পর্যালোচনায় দেশী-বিদেশী বেশ কিছু বই ও প্রবন্ধে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ সম্পর্কিত তথ্য উপাত্ত তুলে ধরা হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়া ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের রুপ প্রাসঙ্গিকভাবে স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে গবেষণার বিষয় বিশ্লেষণে জঙ্গীবাদ শব্দের আকাদমিক দৃষ্টিভঙ্গী,বাংলা ও ইংরেজি শব্দের উৎপত্তি, সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের মধ্যে পার্থক্য, সন্ত্রাসবাদের আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা, জঙ্গীবাদের প্রকৃতি নিরুপণ, ইসলামের প্রকারভেদ, ইসলামের ইতিহাসে সন্ত্রাসবাদের বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। খারিজী ও বাতিনী সম্প্রদায়ের সন্ত্রাসবাদের কারণ কুরআন ও হাদীসের আলোকে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আইন ও এর পর্যালোচনা, দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ পরিস্থিতি, মাদ্রাসা শিক্ষা এবং বাংলাদেশে বোমা হামলার উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে গণমাধ্যম কি, বাংলাদেশের গণমাধ্যমের বর্তমান অবস্থা, জঙ্গীবাদ নির্মূলে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর কিছু সংবাদ মূল্যায়ন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশের প্রখ্যাত কয়েকজন কূটনীতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকের সাক্ষাতকার তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে পর্যবেক্ষণ, সুপারিশমালা ও উপসংহারের মধ্য দিয়ে গবেষণা কার্য শেষ করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, জঙ্গীবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই জঙ্গীগোষ্ঠী রাজনৈতিক দলগুলোর কাছাকাছি গিয়ে সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করেছে। রাজনৈতিক দলগুলো অনেকক্ষেত্রে এদের গতিবিধি স্বাভাবিক মনে করলেও এ সুযোগে জঙ্গীরা নিজেদের সংগঠিত করার পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে তাদের শক্তি ও সামর্থ্য সম্পর্কে জানান দিয়েছে। ১৯৯৯ সালের উদীচি হামলা থেকে শুরু করে ২০১৪ সালে জঙ্গী ছিনতাই পর্যন্ত ঘটনাগুলোকে বিচ্ছিন্ন হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। জঙ্গীবাদের সাথে অনেক মাদ্রাসা শিক্ষার্থী, নিম্ন বিত্ত থেকে শুরু করে উচ্চ বিত্তের সন্তানদের সম্পৃক্ত খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কওমি মাদ্রাসার সাথে জঙ্গীবাদ তৈরির সম্পর্ক, ইসলাম ধর্মের সাথে জঙ্গীবাদের সম্পর্ক আদৌ রয়েছে কিনা, সন্ত্রাস-জঙ্গীবাদ বিষয়ক বিদ্যমান আইন, জঙ্গীবাদ দমনে সরকারের ভূমিকা, গণমাধ্যমের সাথে জঙ্গীবাদের আন্ত:সম্পর্ক, জঙ্গীবাদ বিষয়ে গণমাধ্যমের রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে কি ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, সেসব বিষয়ে গবেষণায় উল্লেখ রয়েছে। গণমাধ্যম জঙ্গীবাদ বিষয়টিকে কিভাবে ব্যবহার করছে, সেটা কি জঙ্গীবাদকে সাহায্য করছে বা উসকে দিচ্ছে না কি তা প্রতিরোধে ভূমিকা রাখছে, এসব বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ নিবন্ধ স্থান পেয়েছে গবেষণায়। বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ বিস্তারে বিভিন্ন দেশের ইন্ধন সেটা সশস্ত্র অবস্থায় হোক আর জঙ্গী অর্থায়ন হোক সেসব বিষয় গবেষণায় স্থান পেয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে জঙ্গীবাদ নিয়ে বেশ লেখালেখি হয়েছে। যদিও গবেষণার জায়গাটি এখনো প্রসারিত হয়ে উঠেনি। গত দেড় দশকে বাংলাদেশের শান্তিপূর্ণ তকমার পেছনে একটি নিরাপত্তা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে এ জঙ্গীবাদ। তবে তাৎপর্যপূর্ণ সেটা হচ্ছে, রাষ্ট্রপরিচালনাকারী সরকার এদের সরাসরি সমর্থন না দিলেও স্থানীয় বা আঞ্চলিক পর্যায়ে জঙ্গীরা সরকারী দলের কিছু নেতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন পেয়ে থাকতে পারেন। তবে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জঙ্গীবাদ নির্মূলে বেশিরভাগ সময় সক্রিয় থাকার চেষ্টা করেছে, তবে কিছু ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকাও রহস্যজনক। আর গণমাধ্যম জঙ্গীবাদ নির্মূলে কিভাবে কাজ করতে পারে বা ভূমিকা রাখতে পারে সেবিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। জঙ্গীবাদী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ যেন কখনো কোন হুমকিতে না পড়ে সেজন্য কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে গবেষণায়। ভবিষ্যত গবেষকদের জন্য এ গবেষণাটি কিছুটা হলেও উপকারে আসবে। মতামত তুলে ধরা হয়েছে কূটনীতিক, নিরাপত্তা বিশ্লেষক; এমন কয়েকজন ব্যক্তিত্বের। জঙ্গীবাদ নির্মূলে রাষ্ট্রকে সক্রিয়, সমাজকে সচেতন আর গণমাধ্যম বস্তুনিষ্ঠতার সাথে দায়িত্ব পালন করলে নিরাপত্তা হুমকির ক্ষেত্রে যে ক্ষত, সেটা অনেকটাই দূরীভূত করা সম্ভব, কারণ বাংলাদেশ একটি উদার ও আধুনিক মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। ধর্মের দোহাই বা অন্য কোন মতবাদের সাথে আধুনিক মনস্ক জনগণ নিজেদের সহজে সম্পৃক্ত করবে না।

এ, বি, এম জিয়াউল কবির
এমফিল গবেষক
এপ্রিল, ২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	ভূমিকা ও সাহিত্য পর্যালোচনা	০৮-৩১
দ্বিতীয় অধ্যায়	গবেষণার বিষয় বিশ্লেষণ ও ধারণাগত কাঠামো	৩২-১০০
তৃতীয় অধ্যায়	জঙ্গীবাদ নির্মূলে বাংলাদেশে গণমাধ্যমের ভূমিকার মূল্যায়ন	১০১-১৫০
চতুর্থ অধ্যায়	গবেষণায় মাঠপর্যায়ে প্রাপ্ত সাক্ষাতকার বিশ্লেষণ	১৫১-১৫৬
পঞ্চম অধ্যায়	পর্যবেক্ষণ, সুপারিশমালা ও উপসংহার	১৫৭-১৬৫
গ্রন্থপঞ্জি		১৬৬-১৬৯
পরিশিষ্ট		১৭০-১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকাঃ

"The success of a terrorist operation depends almost entirely on the amount of publicity it receives" *(Walter Laquer, Terrorism; 1997*) এর অর্থ হচ্ছে, 'সন্ত্রাসী অভিযানের সফলতা নির্ভর করে সে কতোটা প্রচারণা পেলো তার উপর'। সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়, যা গণমাধ্যমের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়। জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব বিভাগের পরিচালক জেরাল্ড পোস্ট তার 'The mind of a terrorist' গ্রন্থে লিখেছেন, সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে মূলত: গণমাধ্যমের বিষয়। গণমাধ্যমের মধ্য দিয়ে আপনি এর চেহারা দেখতে পান। যার অর্থ দাঁড়ায়, সন্ত্রাসীরা গণমাধ্যমকে যেমন ব্যবহার করে, তেমনি গণমাধ্যমও সন্ত্রাসীদের প্রভাবিত করে" *(এ্যানার্থ, ২০১৩; http://www.buzzfeed.com*)। গণমাধ্যমের সর্বোচ্চ মনোযোগ কিভাবে পাওয়া যায়, সন্ত্রাসীদের ব্যবহৃত এমন একটি বইতে দেখা যায়, উত্তর আয়ারল্যান্ডে বোমা হামলা বিকেল ৫টা থেকে ৬টার মধ্যে সংঘটিত হয়। বৃহস্পতিবার ৬টা হচ্ছে সংবাদপত্রের পরবর্তী দিনের জন্য শেষ সময়। শুক্রবার একটি ভালো শিরোনামের জন্য ঐ সময়টিকে বেছে নেয়া হতো। গণমাধ্যমে সন্ত্রাসবাদের প্রচার বর্তমান বিশ্বে সাম্প্রতিক সময়ে একটি আলোচনা ও বিতর্কের বিষয়। প্রতিটি সন্ত্রাসী ঘটনার পর গণমাধ্যম একটি নতুন আলোচনার জন্ম দেয়। এ বিষয়টি সবসময় লিখিত, আলোচনা ও বিতর্কের বিষয়, কিন্তু সমাধান হয়না। প্রযুক্তি ব্যবহার করে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের মতো ঘটনাগুলো আরো বেশি প্রচারযোগ্য করে বিতর্কের সূচনা করেছে।

জনগণের জানার অধিকার, গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমের সুরক্ষা ও তথ্য সেবার বিষয়টি আমরা প্রতিনিয়ত গণমাধ্যমের কাছে চাই। তথ্য বিক্রি ও বিনোদন দেয়া প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্য এখন প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা। এ ব্যবসার উপর নির্ভর করে পত্রিকার অঙ্গসজ্জাতে পরিবর্তন আনা হয়। বিনিময়ে সংবাদপত্র বা গণমাধ্যম বিজ্ঞাপনের নামে ডলার উপার্জন করছে। গণমাধ্যমের কিছু নীতি আদর্শ, নাগরিক উদ্দেশ্য থাকে, কিন্তু সেগুলো অর্থের কারণে এখন গৌণ হয়ে দেখা দিয়েছে (ড্রাগলি, লে:কর্ণেল; ১৯৯১)। ড.এডেসিনা লুকম্যান আজিজ তার ২০০৯ সালে প্রকাশিত Journal of Communication and Media Research, প্রবন্ধে সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞায় দু'জন অভিজ্ঞ ব্যক্তির উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন, 'By and large, terrorism, according to Abraham Miller (1982:1), "is the media's stepchild, a stepchild, which the media, unfortunately, can neither completely ignore nor deny". Terrorists know the conventions and news gathering routines of the media, and so to achieve their objective of drawing attention to themselves and gain notoriety, they deliberately organise their actions to fit the key news values of drama, violence and unexpectedness (*Crelinsten, 1989:332*)।

সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও গণমাধ্যম নিয়ে বিশ্ব মিডিয়ায় অনেক লেখালেখি, অনেক বিতর্ক, অনেক আলোচনা ও সমালোচনা হয়েছে, এবং ভবিষ্যতেও হবে। সন্ত্রাসীরা গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে, না গণমাধ্যম সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করে এ প্রশ্নটি এখন ঘুরে ফিরে আসছে। গণমাধ্যমের দায়িত্ব, পরিমিতিবোধ, দায়িত্ববোধ, দেশপ্রেম এ শব্দগুলো আগের চেয়ে অনেক জোরালো হয়ে আসছে। তথ্য দিয়ে গণমাধ্যম সন্ত্রাসীদের সহায়তা করছে, না কি সন্ত্রাসী, জঙ্গীরা গণমাধ্যমের প্রচারণার মাধ্যমে জনগণ তথা রাষ্ট্রকে হুমকি দিচ্ছে, জনগণের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করছে, জঙ্গীবাদ কথাটির সাথেই ইসলামের একটা সম্পর্ক কি গণমাধ্যম তৈরি করে দিয়েছে, না ইসলামভীতির কারণে বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যম তাদের ধারণাবদ্ধ ফ্রেমের বাইরে যেতে চায়না? প্রয়োজনভেদে বিভিন্ন সংবাদে ভাষার ব্যবহার,

উদ্দেশ্য, তথ্য বিকৃতিসহ নানা বিষয় আলোচনায় এসেছে। সন্ত্রাসবাদের মতো জঙ্গীবাদও একটি বহুল আলোচিত বিষয়। বিভিন্ন দেশে জঙ্গীবাদের উত্থান সে দেশের আর্থ সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বসহ অনেক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহির্বিশ্বে দেশের সুনাম নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি বিদেশী বিনিয়োগ কমে যাওয়ার একটি অন্যতম কারণ এ জঙ্গীবাদ।

জঙ্গীবাদের সংজ্ঞা নিয়ে বিশ্বব্যাপী মতবিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু যে কোন আকারে সমাজে বা রাষ্ট্রে এর অস্তিত্ব কোন সরকারের জন্য স্বস্তিকর নয়। কয়েক দশক পূর্বে মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদের অস্তিত্ব দেখেছে মানুষ, আর নাইন ইলেভেনের পর সন্ত্রাসবাদ নিয়ে বিশজুড়ে রীতিমতো হইচই পড়ে যায়। আর এখন সমাজে যে কোন আকারে জঙ্গীবাদের অস্তিত্ব, সাম্প্রতিক বছর গুলোতে ঘটে যাওয়া বেশ কিছু ঘটনা সরকারকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। সরকার কিভাবে জঙ্গীবাদের সংজ্ঞা নিরুপণ করবে, জঙ্গীগোষ্ঠীকে কিভাবে মোকাবেলা করবে, এসব নিয়ে চিন্তিত সরকারের পাশাপাশি রাষ্ট্রক্ষমতার লড়াইয়ে অবতীর্ণ রাজনৈতিক দলগুলো। আবার জঙ্গীবাদের সাথে বেশ কিছু ধর্মীয় সংগঠনের নামও এসে যাচ্ছে প্রাসঙ্গিকভাবে। তাদের উদ্দেশ্য, লক্ষ্যও অস্পষ্ট। তারা কি চায়, কোন প্রক্রিয়ায় এবং কেন চায় এ প্রশ্নগুলো মূখ্য। সরকার এসব প্রশ্নের উত্তর যেমন বের করবে, তেমনি জঙ্গীবাদকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার না করে সমাজের তথা রাষ্ট্রের কল্যাণে এ থেকে জনগণকে কিছুটা হলেও স্বস্তি দেবে। জঙ্গীবাদ নির্মূলে দেশী-বিদেশী অনেক সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে। সে সব সংগঠনের কার্যপ্রণালী ও প্রয়োগের ভিন্নতা থাকতে পারে, উদ্দেশ্য নিয়েও সন্দেহ সংশয় থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। তবে, প্রকৃত তথ্য জনগণকে জানাতে পারে একমাত্র গণমাধ্যম। বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও এক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

জঙ্গীবাদ প্রশ্নে বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলোর ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু, সে ভূমিকা যথাযথ কি না তা নিয়ে ভবিষ্যতে আরো আলোচনা এবং অধিকতর নিবিড় গবেষণা হতে পারে। জঙ্গীবাদ প্রশ্নে বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো প্রায়শই নানা সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। তবে সে সব সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে সংশয় থেকে যায়। সে সব সংবাদের উৎস নিয়ে অনেক সময় প্রশ্ন তৈরি হয়। মনে হয়, রাজনৈতিক দলগুলোর বা গোষ্ঠী বিশেষের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সে সব সংবাদ পরিবেশন করা হয়। এ অবস্থা থেকে গণমাধ্যমকে মুক্ত হতে হবে। সংবাদপত্র বা গণমাধ্যমের জন্য জনমুখী নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। যা শুধু দেশ ও জনগণের কথা বলবে।

গবেষণার যৌক্তিকতাঃ

জঙ্গীবাদ বিষয়টি বাংলাদেশে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। মুসলিম প্রধান দেশ হিসেবে বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের উত্থান হবার পর বিষয়টি দেশী-বিদেশী গণমাধ্যমের এজেন্ডায় শক্তিশালী স্থান দখল করে নেয়। জঙ্গীবাদ নিয়ে বিদেশে ব্যাপক ভিত্তিক গবেষণা হয়েছে। শুধুমাত্র জঙ্গীবাদ ও গণমাধ্যমকে সম্পৃক্ত করে বিদেশে যৎসামান্য গবেষণা হলেও বাংলাদেশে এ সংখ্যা নেই বললেই চলে। এ নিয়ে দেশে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। যেগুলো অ্যাকাডেমিক চাহিদার তুলনায় খুবই অপ্রতুল। যেহেতু বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ নিয়ে একাডেমিকভাবে নিবিড় কোন গবেষণা হয়নি, তাই এ বিষয়ে একটি গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সে হিসেবে গবেষণাটি শুধুমাত্র অ্যাকাডেমিক এবং গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের উপর নির্ভর করে সম্পাদন করতে হচ্ছে। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরো উন্নততর গবেষণার ক্ষেত্রে এ গবেষণাটি সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। গবেষণাটি বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে হলেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ নিয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও গবেষণা গ্রন্থের আলোকে বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশে নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক, গবেষক এবং কূটনীতিক অভিজ্ঞ মহলের অভিজ্ঞতা ও চিন্তা এখানে সন্নিবেশ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য।

গবেষণার উদ্দেশ্যঃ

Dhaka University Institutional Repository

মূলত পাঁচটি উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে গবেষণাটি করা হয়েছে।

১. জঙ্গীবাদ কি ? বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের ধরণ ও প্রকৃতি নিরুপণ ;
২. জঙ্গীবাদ নির্মূলে গণমাধ্যম কোন ভূমিকা রাখছে কি না? ;
৩. জঙ্গীবাদ নির্মূলে গণমাধ্যম কি কি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে? ;
৪. জঙ্গীবাদ নির্মূলে গণমাধ্যম আরো কিভাবে ভূমিকা পালন করতে পারে?; এবং
৫. গণমাধ্যমের সাথে জঙ্গীবাদ নির্মূলের বিষয়টি কতটুকু সম্পর্কযুক্ত? ;

বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ শব্দটি সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপক আলোচিত। বিশেষ করে, জাতীয় নির্বাচনের আগে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো একে অপরকে জঙ্গীবাদ লালনকারী হিসেবে আখ্যা দেয়। জনগণের সমর্থন আদায়ের জন্য দোষারোপের এ রাজনীতি এক যুগের। কিন্তু জঙ্গীবাদের উত্থান, এর নেপথ্য কারণ এবং তা দমনে গণমাধ্যমের করণীয় নিয়ে কার্যকর কোন আলোচনা নেই, তাই এ বিষয়ের উপর একটি গবেষণা সময়ের দাবি। এ জন্য যথাযথ একটি গবেষণার মধ্য দিয়ে এ বিষয়ে আলোকপাত এবং জঙ্গীবাদ দমনে গণমাধ্যমের কার্যকর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা এ গবেষণার মূল লক্ষ্য।

গবেষণার অনুমিত সিদ্ধান্তঃ

বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের অস্তিত্ব রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে এ শক্তি সমাজে কখনো সক্রিয়, কখনো বা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে। জঙ্গীবাদ নির্মূলে গণমাধ্যমের ভূমিকা যথোপযুক্ত নয়, ব্যাপকভাবে জনসচেতনতা তৈরি এবং এর প্রকৃত তথ্য উদঘাটন এবং তা প্রকাশ করে জনগণকে সহায়তা করতে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিহার্য। গণমাধ্যম জঙ্গীবাদ প্রচার প্রসারের নেপথ্য কারণগুলো সম্পর্কে জনগণ-তথা সরকারকে সচেতন করে তুলতে পারে। তবে, সরকার এ বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে নিয়ে রাজনীতি করার মানসিকতার পরিবর্তে এর গোড়ায় হাত দিয়ে কারণগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো নির্মূলের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেবে এটি প্রত্যাশিত। বাংলাদেশে যখন কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে জঙ্গীবাদ নিয়ে ব্যাপক বক্তৃতা, অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ বিস্তৃতি লাভ করে, তখন জঙ্গীবাদ নিয়ে গণমাধ্যমে লেখালেখির পরিমাণও বাড়তে থাকে। রাজনৈতিক দলের সাথে তাল মিলিয়ে সংবাদপত্রের নীতি অনুযায়ী এ ধরনের সংবাদ প্রকাশের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত তথ্য খুঁজে বের করার প্রয়োজন বোধ করেনা গণমাধ্যম। সরকার বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে যা বলা হয়, তার উপর ভিত্তি করেই সে প্রতিবেদন তৈরি হয়। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে অধিকতর দায়িত্বশীল ও অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে তথ্য উদঘাটন ও পরিবেশনের কাজটি সম্পাদন করতে হবে।

প্রাসঙ্গিক প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও দলিল দস্তাবেজ পর্যালোচনা:

ফারুক সোবহান সম্পাদিত 'ট্রেন্ডস অব মিলিট্যান্সি ইন বাংলাদেশ' বইটি বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট ২০১০ সালে প্রকাশ করে। বইয়ে ৬টি অধ্যায়ে জঙ্গীবাদের প্রবণতা, ধরণ, সরকারের উদ্যোগ, ভবিষ্যতে কেমন হতে পারে, এগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে রাজশাহী বিভাগে সর্বহারাদের তৎপরতা, জেএমবি ও জেএমজেবির তৎপরতা, পুলিশের দায়িত্ব, রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব, ইসলামী সংগঠনগুলোর দায়িত্ব ও ভূমিকা, গণমাধ্যমের ভূমিকা, আর্থসামাজিক অবকাঠামোগত অবস্থা এবং প্রতিরোধসহ বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সিলেট বিভাগ নিয়েও একই ভাবে লেখা হয়েছে এ বইতে।

অর্থপাচার প্রতিরোধ অধ্যাদেশ ২০০৮ এর সামর্থ্য ও দুর্বলতা, মাঠ পর্যায়ে সরকারের প্রশাসনে সন্ত্রাস প্রতিরোধে সামর্থ্য উন্নয়ন ও সমন্বয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বাংলাদেশে মৌলবাদ প্রতিরোধে শিক্ষার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তির সাথে সাথে নিরাপত্তার ইস্যুটি তার গুরুত্ব হারিয়েছে। যদিও নাইন ইলেভেনের ঘটনার সাথে সাথে

Dhaka University Institutional Repository

সন্ত্রাসবাদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গুরুত্ব পেতে শুরু করে। মূলত: তখন থেকেই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় সন্ত্রাসবাদকে প্রাথমিক হুমকি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সত্যিকারের নিরাপত্তার দাবি বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, বিশেষ করে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলো আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিচারে সামনের দিকে চলে এসেছে। মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হিসেবে কৌশলগত দিক দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান বিবেচনায় ইসলামপন্থী, চরমপন্থী এবং রাজনীতি ও সন্ত্রাসী সহিংসতার ক্ষেত্রে এর রূপান্তর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে *(কাঞ্চন লক্ষণ, ইসলামিক এক্সট্রিমিস্ট মবিলাইজেশন ইন বাংলাদেশ, http://Jamestown.org /terrorism/news/articleid=2369724)*।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ, এখানে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এ অঞ্চলে সুফী-সাধকদের দ্বারা ইসলাম প্রচার ও বিকশিত হয়েছে *(আহমদ ইমতিয়াজ, ২০০৫; ৮)*।

মুসলিম প্রধান দেশ হিসেবে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের কিছু প্রধান রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় যাবার জন্য ইসলামকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন সময়ে ব্যবহার করেছে। ফলে ইসলামকে রাজনীতিকরণের জন্য রাষ্ট্রে কিছু ইসলামিক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। এর মধ্যে কিছু গোষ্ঠী ১৯৯০ পরবর্তী সময়ে প্রধান রাজনৈতিক দলের মর্যাদা পায়। ১৯৯০ এর দশকে সোভিয়েত আফগান যুদ্ধের পর অনেক বাংলাদেশী মুজাহিদিন দেশে ফিরে জিহাদের নামে নতুন আদর্শের জন্ম দেয়। জিহাদের মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। নাইন ইলেভেনের ঘটনা তাদের অনুপ্রেরণা যোগায়। যার ফলে উগ্রপন্থীদের তৎপরতা বেশ দৃশ্যমান ও চোখে পড়ে। ২০০১-২০০৫ সালের মধ্যে তাদের উত্থান এবং উন্মুক্ত জনসমাগম স্থানে বোমা কিংবা গ্রেনেড হামলার ধ্বংসাত্মক তৎপরতা ভীতি ছড়ানোর পাশাপাশি অনেক প্রাণহানি ঘটায়।

যদিও ধর্মীয় উগ্রপন্থা বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত নতুন ঘটনা। তবে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বামপন্থী চরমপন্থীদের সহিংসতার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তারা হত্যা, ধর্ষণ, ডাকাতি, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, অগ্নিসংযোগ এবং অবৈধ কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত ছিল।

দুই ধরনের চরমপন্থা মোকাবেলায় স্বল্প মেয়াদী সামরিক পন্থা বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে দেখতে হয়েছে। এটা রোধে দীর্ঘ মেয়াদী কৌশল কিংবা তত্ত্বগত ও আদর্শগত কোন পর্যাপ্ত উপায় নেই। যার ফলে জঙ্গী গোষ্ঠীর তৎপরতা দিনে দিনে বাড়ছে। আর অপশাসনের ফলে স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, রাজনৈতিক শীর্ষ নেতাদের গ্রাস করছে। বর্তমান অবস্থায় জঙ্গীবাদের বিস্তার রোধে সব পন্থার সমন্বিতভাবে প্রয়োগ সময়ের দাবি। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট সুশীল ব্যক্তিদের সমন্বয়ে আগস্ট ২০০৭ থেকে মে ২০০৮ এ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপনা করে।

হুমকিদাতা গোষ্ঠীঃ বাংলাদেশের জঙ্গীবাদী সংগঠনঃ

'Militant or extremists are those either banned by the government for their radical activities or those who plan to operate or are operating clandestinely beyond the mainstream political process using force or violence which is not sanctioned by the law of the land targeting civilian life property and the state institutions for attaining their ideological and or political objectives' *(সোবহান, ২০০৮; ১৫)*।

বামপন্থী সংগঠনঃ মানবেন্দ্র নাথ রায়ের নেতৃত্বে ১৯২৫ সালে মৌলবাদী বামপন্থী সংগঠন কম্যুনিষ্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া গঠিত হয় *(http://banglapedia.search.com.bd/ht/r_0007.htm;2008)*।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তানের বিভক্তির পর কম্যুনিষ্ট পার্টি অফ পাকিস্তান গঠিত হয়। যা পরে দুই দিকে চলে যায়। একটি চীন পন্থী অন্যটি সোভিয়েত পন্থী *(করিম, লে.কর্ণেল ,দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে চরমপন্থী তৎপরতা, র‍্যাবের কার্যক্রম র‍্যাব প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সাময়িকী ২০০৮;৩৬)*। সিরাজ সিকদারের দলকে সমর্থন করা ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল চীনপন্থীরা। স্বাধীনতার পর বিশেষ করে ১৯৭২ এবং ১৯৭৫ সালে অনেক বামপন্থী রাজনৈতিক দল জন্ম নেয় *(নাইম মোহাইমেন,২০০৬;২৯৭)*। বামরা চীনপন্থী আদর্শ গ্রাম থেকে শহরে ছড়িয়ে দেয়। বোমা হামলা, টার্গেট হত্যা, সরকারী সম্পত্তি ধ্বংসসহ সশস্ত্র বিপ্লবের লক্ষ্যে সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে সর্বহারা পার্টি গঠিত হয়। জনগনের সমর্থনহীনতা ও পুলিশী তৎপরতায় মাওবাদী দলগুলো মিলেমিশে যায়। ১৯৭৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি রূপ নেয় বিপ্লবী কমিউনিষ্ট পার্টিতে। ১৯৮০ সালে পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির এমএল মোকহার চৌধুরী আদর্শগত বিরোধে জড়িয়ে পূর্ববাংলা কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন করে। নাম হয় পিবিসিপি এম এল মোকহার চৌধুরী। পিবিসিপি (এমএল জনযুদ্ধ)র নেতৃত্বে আব্দুর রশিদ মাথেলা, পিবিসিপি (এমএল-রশিদ) মোকহার থেকে বেরিয়ে ২০০৩ সালে ডাক্তার টুটুল পিবিসিপি (এমএল -লালপতাকা) গঠন করে। এছাড়া গণমুক্তি ফৌজ, বিপ্লবী কমিউনিষ্ট পার্টি, গণবাহিনী এ সময় গঠিত হয় *(Karim,op.cit;37)*।

ডানপন্থী সংগঠনঃ ১৯৮০সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিছু আফগান যোদ্ধা বাংলাদেশে ফেরে। তারা অস্ত্র চালনা ও বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ এবং জিহাদের নামে মানুষকে একত্রিত করার চেষ্টা করে। তারা যে কোন ধরনের ধর্মনিরপেক্ষতার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল *(খান, হাফিজউদ্দিন; র‍্যাব প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী জার্নাল,২০০৮;৭৪)*। তাদের শ্লোগান ছিল 'আমরা সবাই তালিবান বাংলা হবে আফগান' (*মান্নান আব্দুল, ২০০৬;৩৭)*। তাদের শক্তি ও ক্ষমতা প্রদশর্নের জন্য সরকারের শৈথিল্য আশির্বাদ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৯৯ সালে যশোরে উদীচি বোমা হামলা থেকে শুরু করে ২০০৫ সাল পর্যন্ত তারা ১৯টি উল্লেখযোগ্য স্থানে হামলা চালিয়ে মানুষ হত্যা করে। এ ঘটনাগুলো সরকার আমলে নেয়নি। ১৭ আগষ্ট ২০০৫ সালে ৫০০ স্থানে একযোগে বোমা হামলা হলে এ ঘটনাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয় তৎকালীন বিএনপি জামায়াত জোট সরকার। অভিযুক্ত জেএমবি ও শীর্ষ নেতাদের প্রচলিত আইনে ফাঁসি দেয়া হয়। যদিও এ সংগঠনগুলো ও এর অনেক নেতা এখন বিভিন্ন নামে সারাদেশে সক্রিয় রয়েছে। এদের কার্যক্রম স্তিমিত মনে হলেও মাঝে মধ্যে এরা সক্রিয় হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেয়। উদাহরণস্বরুপ উল্লেখ করা যায় :

হরকতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ, জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ, জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ, হিযবুত তাওহিদ, আল্লার দল এবং হিযবুত তাহরিরের নাম ।

কাউন্টারিং টেরোরিজম ইন বাংলাদেশঃ ফারুক সোবহান সম্পাদিত আরেকটি বই "কাউন্টারিং টেরোরিজম ইন বাংলাদেশ" বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট ২০০৮ সালে প্রকাশ করে। এতে সন্ত্রাসবাদ ও এর বৈশিষ্ট্য ,প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদ বিষয়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

সন্ত্রাস প্রতিরোধে দুটো পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে বইটিতে। একটি এন্টিটেরোরিজম বা প্রতিরোধমূলক আর অন্যটি হচ্ছে কাউন্টার টেরোরিজম বা আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ। এন্টিটেরোরিজমের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, "defensive measures used to reduce the vulnerability of individuals and property to terrorist acts,to include limited response and containment by local military forces" অন্যদিকে "counter terrorism involves those offensive measures taken to present ,deter and respond to terrorism" *(ibid)*।

সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের সাধারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে, সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে প্রতিরোধ ও নিরস্ত্র করে তোলা। সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ নির্মূলে কিছু উপায় বর্ণনা করা হয়েছে। সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে দূর্যোগ মুহুর্তে আক্রমণাত্মক কৌশল হিসেবে 3M

পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে manage, minimize এবং muster theory *(সোবহান,২০০৮;২৯)*। কৌশলের বিভিন্ন পর্যায়ে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি সচেতন হওয়ার কথা বলা হয়:

শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি:

মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার ;

মাদ্রাসা শিক্ষার্থী, সংখ্যালঘু ও প্রবাসী যুবক গোষ্ঠীর সাথে ব্যাপকভিত্তিক যোগাযোগ ও সেমিনার;

সন্ত্রাসবাদ নির্মূল প্রচেষ্টায় গণমাধ্যমের অংশগ্রহণ;

সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ নীতির ব্যাপারে ব্যাপক জনসচেতনতা;

সংখ্যালঘু ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের অধিকার ও সচেতনতা তৈরি;

শুক্রবারের প্রার্থনায় প্রগতিশীল ইসলামী ধর্মোপদেশ অনুশীলন;

বিদেশ ভ্রমণের সময় সচেতনতা ও তথ্য সরবরাহ;

সংস্কৃতির বিনিময়ের মাধ্যমে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা;

আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর সাথে ব্যাপকমাত্রায় অংশগ্রহণ;

ঝুঁকি ও এর মাত্রা অনুধাবন;

জাতীয় অবকাঠামোগুলোর ঝুঁকি সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক গভীর জ্ঞান অন্বেষণ;

সমঝোতা ও সমন্বয় বিষয়ক কমিটি তৈরিসহ ইত্যাদি।

সামর্থ্য বৃদ্ধি: আইন শৃঙ্খলাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ভেতর সন্ত্রাস প্রতিরোধ সেল তৈরি ,অপরাধের নিবিড় পর্যবেক্ষণ, অপরাধীকে জিজ্ঞাসাবাদ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে উপলব্ধি তৈরি করা, জনগণের জান-মাল রক্ষা করা, অপরাধীদের সাক্ষাতকার গ্রহণ, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের ব্যবস্থা, কম্পিউটারের মাধ্যমে সৃষ্ট অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ, বিস্ফোরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে জ্ঞানের সামর্থ্য, আইনগতভাবে অপরাধীদের মোকাবেলা করা, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে গোপন অভিযানে পারদর্শীতা অর্জন, নিজস্ব তথ্য প্রাপ্তির জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ, অপরাধের বিরুদ্ধে তাৎপর্যপূর্ণ অভিযান পরিচালনা, দেশ ও দেশের বাইরে সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, গোয়েন্দা কাজে ব্যবহারের জন্য তৃতীয় ও চতুর্থ প্রযুক্তির অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার, মানসিকভাবে যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুতিসহ গবেষণা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কারিগরী সামর্থ্য বৃদ্ধির কথা বলা হয়।

আইন শৃঙ্খলাবাহিনী:

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যে আন্ত:সংস্থা সহযোগিতা তৈরি করা, সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার, দ্রুত মামলা নিস্পত্তির দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ তৈরি, স্থল, জল ও আকাশপথে প্রবেশের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার, অভিবাসন ও সীমান্ত ব্যবস্থাপনা জোরদার, ডাটাবেজ তৈরি, হুমকি চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা, তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনা কৌশলের মাধ্যমে সামর্থ্য বৃদ্ধির কথা বলা হয়।

আদর্শিক যুদ্ধ:

সন্ত্রাসবাদে অবৈধতার বিষয় তুলে ধরা, মৌলবাদ বিরোধী কর্মসূচি প্রণয়ন করা, আদর্শ মাদ্রাসা শিক্ষা, শিক্ষা এবং প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে গণমাধ্যম ব্যবস্থাপনার (সমন্বিত, ধারাবাহিক, টেকসই, এবং দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার) মাধ্যমে সামর্থ্য বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে (*কাউন্টারিং টেরোরিজম ইন বাংলাদেশ, ২০০৮;৩১-৩৩)* ।

সন্ত্রাস-জঙ্গীবাদের সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা:

Dhaka University Institutional Repository

তিনটি প্রধান নীতির কথা গণমাধ্যমের জন্য বলা হয়েছে।

প্রথমত, Policy of Leisezz Faire অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদের খবর সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া প্রচার বা প্রকাশ করা যাবেনা। সেটা যতো বড়ো সহিংস ঘটনাই হোক না কেন। এতে করে বাংলাদেশ বিপদজনক অবস্থায় পড়ে যেতে পারে। সন্ত্রাসীদের হামলার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য পরিস্কার না হওয়া পর্যন্ত এ নিয়ে আবছা বা অস্পষ্ট রিপোর্ট প্রচার বা প্রকাশিত হলে সেক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা সন্ত্রাসীদের পক্ষে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

দ্বিতীয়ত, সন্ত্রাসবাদের সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে পরের নীতি হচ্ছে গণমাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ আরোপ বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিধি নিষেধ প্রদান। কিছু গণতান্ত্রিক দেশে সম্প্রচার মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের ঘটনা সরাসরি না দেখানোর সিদ্ধান্ত হয়। এর নেতিবাচক দিকটি হচ্ছে, সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকায় সংবাদ ও মতামত দেয়ার ক্ষেত্রে একটি বিধিনিষেধ থাকা বা আরোপ করা।

তৃতীয় নীতি হচ্ছে, সন্ত্রাসবাদের কাভারেজের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের নিজস্ব নীতি, যেটা বেশিরভাগ গণমাধ্যমের খুব পছন্দ, তা হলো সন্ত্রাসীদের হামলা ও ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে গণমাধ্যমের স্বেচ্ছা নিয়ন্ত্রণ আরোপ। যা সন্ত্রাসীদের রোষানল থেকে রক্ষা করার পাশাপাশি তথ্য বিকৃতির হাত থেকেও গণমাধ্যমকে রক্ষা করে।

সন্ত্রাসীরা চার ধরনের কাজে গণমাধ্যমকে ব্যবহার করতে চায়।একটি হচ্ছে, প্রচারণার জন্য। দ্বিতীয়টি, বিস্ফোরণের পর মানুষের প্রতিক্রিয়া জানতে। তৃতীয়ত, সেটা সন্ত্রাসীদের পক্ষে এলে এর মাধ্যমে তারা তৃতীয়বারের মতো লাভবান হয়, আইনগত বৈধতা চায় এবং চতুর্থত, গণমাধ্যম ব্যবহার করে শত্রু বা প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করা *(Wilkinson,op.cit)*।

২০০৬ সালে এম এম শওকত আলী প্রকাশিত "Faces of Terrorism in Bangladesh" গ্রন্থে ২০০৪ থেকে ২০০৬ সাল সময়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। ধর্মভিত্তিক জঙ্গীবাদ নিয়ে বিতর্ক এবং প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর এ নিয়ে ভাবনা এবং সংঘাতের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এ প্রবন্ধগুলো তিনি লিখেছেন। এতে সন্ত্রাসবাদের বিভিন্ন রুপ, সন্ত্রাসবাদের বীভৎস চেহারা, ঘটে যাওয়া বিভিন্ন হামলার তদন্ত কমিটির রিপোর্ট, রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ, বিভিন্ন সময়ে সংগঠিত বোমা হামলা, অস্ত্রের উৎস, নৈতিকতা, মূল্যবোধ এবং প্রত্যাশা, সরকারের প্রতি জঙ্গীদের বার্তা, প্রতিবেশী দেশের প্রতি দোষারোপ ও প্রত্যাশা, শায়খ ও বাংলা ভাই গ্রেফতারসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। "আগলি ফেসেস অব টেরোরিজম ইন বাংলাদেশ" প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, বাংলাদেশে ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে সন্ত্রাসবাদ নতুন মাত্রা লাভ করে। সংবাদপত্রগুলো বাংলাদেশে সশস্ত্র তালিবানদের উপস্থিতি রয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশ করে। একজন প্রাবন্ধিক তার নিবন্ধে বাংলাদেশে থাকা জঙ্গীরা অস্ত্র, অর্থ ও পরিকল্পনামাফিক একটি গোষ্ঠী সন্ত্রাসবাদের সাথে যুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন *(আফসান চৌধুরী, মার্চ, ১৯৯৯)*। দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় এ বিষয়ে তখন বিস্তারিত সংবাদ ছাপা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। ২০০৩ সালের পর থেকে ইন্টারনেটে এ নিয়ে ব্যাপক লেখালেখি হয়েছে *(আলী, ২০০৬; ১৪)*।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির প্রেক্ষিতে ২০০২ সালে সরকার অপারেশন ক্লিন হার্ট জানুয়ারির ১১ তারিখে শুরু করে। ২৪হাজার ২৩ জন সেনাসদস্য, ৩৩৯ জন নৌ সেনা সদস্য, বিশাল সংখ্যক পুলিশ ও বিডিআর সদস্য নিয়োগ করা হয়। এ অভিযানে ১১ হাজার ২৮০ জন গ্রেফতার হয়। এর মধ্যে ২ হাজার ৪৮২জন তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী, ২হাজার ২৮টি অস্ত্র এবং ২৯ হাজার ৭৫৪টি গুলি উদ্ধার করা হয়। তালিকাভুক্ত মোট সন্ত্রাসীর ২২ ভাগ গ্রেফতার হয়েছে, কিন্তু বাকী ৭৮ ভাগের কি অবস্থা ? সে প্রশ্ন তিনি রেখেছেন *(আলী, ২০০৬; ১৫)*।

১৯ জুলাই, ২০০৩ সালে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সন্ত্রাসীদের ধরতে 'স্পাইডার ওয়েব' নামে আরেকটি অভিযান পরিচালনা করে, যাতে ১৪ হাজার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য অংশ নেয়। সে অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পেছনে

সংবাদপত্রগুলো তিনটি কারণ চিহ্নিত করে। ১. ত্রুটিপূর্ণ কৌশল, ২. যথেষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের অভাব এবং ৩. পুলিশ ও সন্ত্রাসীদের মধ্যে আঁতাত।

কমিশন অব ইনকোয়ারি: হোয়াট নেক্সট? প্রবন্ধে বলা হয় ২১ আগষ্ট গ্রেনেড হামলার তদন্তে একসদস্য বিশিষ্ট কমিশন রিপোর্ট দেয় *(আলী, ২০০৬; ১৮)*। সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টে যে বিষয়গুলো প্রাধান্য পায়, সেগুলো হচ্ছে বিদেশী শত্রুর উপস্থিতি, দলের কর্মী হিসেবে সমাবেশে হামলাকারীরা উপস্থিত ছিল, দেশকে অস্থিতিশীল করা এর উদ্দেশ্য ছিল, গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সমন্বয়ের অভাব, পুলিশী ব্যর্থতা এবং টিভি চ্যানেলগুলোর অদক্ষতা। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়, আওয়ামীলীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার গাড়ীতে বুলেট ছোঁড়া হয়নি, গ্রেনেডের স্প্লিন্টার লেগেছে। এছাড়া এ হামলায় আওয়ামীলীগ,বিএনপি অথবা জামায়াত কেউ জড়িত নয়, বিদেশী শত্রু এ ঘটনায় সরাসরি জড়িত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুপারিশমালায় ব্যর্থ পুলিশ ও গোয়েন্দাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া, সীমানা টহল জোরদার, নির্দিষ্ট স্থানে সভা-সমাবেশ করা, সমাবেশে পুলিশের পক্ষ থেকে বাধতামূলক সমাবেশের চিত্রগ্রহণ, পুলিশ ও গোয়েন্দাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর আন্ত:সম্পর্ক বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে *(আলী, ২০০৬;২০)*।

"পলিটিক্যাল টেরোরিজম ইন বাংলাদেশ" নিবন্ধে বাংলাদেশে রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ দেশে-বিদেশে উদ্বেগজনক ব্যাপার বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। বিশেষ করে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা ও ১৯৮১ সালে সেনা কর্মকর্তারা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে এরশাদের সামরিক শাসন জারি, এবং নয় বছর পর জনগণের ক্ষমতার কাছে পরাজিত হয়ে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পথে দেশ গেলেও রাজনৈতিক বিতর্ক কিন্তু থেমে যায়নি *(আলী ২০০৬;২৬)*। নব্বই দশকের মধ্যভাগে এসে বাংলাদেশে রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ নতুন মাত্রা পেয়েছে। ইসলামের নামে নতুন জঙ্গীগোষ্ঠীর উত্থান এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী হত্যা ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছে। বিভিন্ন দেশী-বিদেশী প্রবন্ধে ইসলামী জিহাদের নামে এ জঙ্গীগোষ্ঠী এগোচ্ছে। যদিও তৎকালীন সরকার তা অস্বীকার করেছে। ভৌগলিক অবস্থানের কারণে অস্ত্রবাজরা বাংলাদেশের মাটিকে নিরাপদ মনে করে নানা সময়ে তা ব্যবহার করেছে *(আলী ২০০৬:২৭)*।

দ্য ডেইলি নিউ এজ পত্রিকায়, ৬ মার্চ ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৫ সালের ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বোমা ও গ্রেনেড হামলার বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, যাতে বলা হয়, ১৮ টি রক্তপাতের ঘটনা এ সময়ে দেশে সংঘটিত হয়েছে। এসব ঘটনায় ১৪৮ জন নিহত হয়েছে এবং ঘটনাগুলো জনসমাগম স্থানে ঘটেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৮টি ঘটনার মধ্যে ৬টি ঘটনার শিকার প্রধান বিরোধী দল। একটি কমিউনিষ্ট পার্টির উপর, ৩টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, ৩ টি সিনেমা হলে, ৩টি মসজিদ এবং এবং একটি চার্চে *(আলী ২০০৬:২৮)*।

"ফাইট এগেইনস্ট অল ফর্মস অব টেরোরিজম" নামক প্রবন্ধে বলা হয়েছে, পাঁচ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের গণমাধ্যম বা বিদেশী গণমাধ্যমে জঙ্গীবাদের বিস্তৃতি ও তা রোধের জন্য অনেক লেখালেখি করেছে। সরকারও বলেছে জঙ্গীরা তাদের সর্বোচ্চ শক্তি প্রদর্শন করেছে। সন্ত্রাসবাদের ধরণকে চারভাগে তিনি দেখিয়েছেন: ১. প্রথাগত সন্ত্রাসবাদ ২. শ্রেণী বা আদর্শভিত্তিক সন্ত্রাসবাদ ৩. রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ এবং ৪.সীমান্তবর্তী সন্ত্রাসবাদ *(আলী, ২০০৬; ৪২)*।

প্রফেসর আমেনা মোহসীন ও প্রফেসর ইমতিয়াজ আহমেদ সম্পাদিত **"উইমেন এন্ড মিলিট্যান্সি:** সাউথ এশিয়ান কমপ্লেক্সিটিজ" গ্রন্থে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত যুদ্ধ, বিগ্রহ, দ্বন্ধ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে নারী নেতৃত্ব বেশ উল্লেখযোগ্য অবস্থানে রয়েছে,তা

Dhaka University Institutional Repository

সত্ত্বেও নারীর প্রতি সহিংসতাও নানা ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়। নারী জঙ্গীর সংখ্যা আগের চেয়ে রেকর্ড সংখ্যক বেশি দেখা গেলেও, একই সাথে শান্তির দাবিতে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে সামনের সারিতে নারীদেরই দেখা যায়। এই বৈপরিত্য কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? যুদ্ধ, বিগ্রহ, দাঙ্গা ও সহিংসতায় নারীর প্রতি হিংস্রতা ফুটে ওঠে। বিহারী, পাহাড়ী, খাসি এবং আহমদিয়া মহিলারা নানা সমস্যায় জর্জরিত। বলা হয়েছে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পরিবার প্রধানের মানমর্যাদা রক্ষা করতে এবং স্বামী বা পিতার প্রভাব সন্তানদের ক্ষেত্রেও পড়া স্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে নারীরা জঙ্গীবাদে জড়িয়ে পড়ে *(মোহসীন ও আহমদ, ২০১১ ; ৭)*।

২০০৯ সালে শেখ মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম সম্পাদিত "ন্যাশনাল সিকিউরিটি বাংলাদেশ ২০০৮" প্রকাশিত বইয়ে 'ট্র্যাডিশনাল সিকিউরিটি অফ বাংলাদেশ' প্রবন্ধে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার হুমকি হিসেবে ধর্মীয় উগ্রপন্থা এবং বামপন্থী সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর তৎপরতার কথা বলা হয়েছে। ধর্মীয় উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলো দেশব্যাপী তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে, আর চরমপন্থী বাম সংগঠনগুলো প্রধানত: উত্তর এবং দক্ষিণ পশ্চিমের জেলাগুলোতে তাদের কার্যক্রম সীমিত রেখেছে। ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা, ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার এবং আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎমুখিতা ধর্মীয় উগ্রপন্থার কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে বইটিতে। এদের কার্যক্রমগুলো জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে উল্লেখ করা হয়েছে *(ইসলাম, ২০০৯; ৪৫)*।

বাংলাদেশে স্থলপথ ও সমুদ্রপথে অস্ত্র দিয়ে দ্বন্ধ-সংঘাতপূর্ণ এলাকায় অস্ত্র পরিবহন করা হয়। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সন্ত্রাসী গোষ্ঠী এপথ ব্যবহার করে থাকে। তাদের কারণে নিরাপত্তা হুমকি তৈরী হয়, সীমান্তে উত্তেজনা উদ্বেগ দেখা দেয়, দক্ষ সীমান্ত জোরদার ব্যবস্থাপনার অভাবে সীমান্তবর্তী যাবতীয় অপকর্ম সংগঠিত হচ্ছে। (ইসলাম ২০০৯;৪৬)। সাম্প্রতিক সময়গুলোতে অবৈধভাবে ছোট অস্ত্রের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বেড়েছে। ছোট ও হালকা অস্ত্রের সহজপ্রাপ্যতা সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করেছেন তিনি *(ইসলাম, ২০১১;৪৭)*। এর ফলে সন্ত্রাস, অপহরণ, মানবপাচার ও অবৈধ বাণিজ্য বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকি এবং উদ্বেগের বিষয়।

২০১৩ সালের এপ্রিলে 'সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক এন্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের' ৫০ বছর পূর্তিতে "ট্রেন্ডস ইন মিলিট্যান্সি এক্রস সাউথ এশিয়া" নামক একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। থমাস এম.স্যান্ডারসন এর প্রকল্প পরিচালক যেখানে প্রধান রচয়িতা হিসেবে জাচরি আই.ফেলম্যান, রিক অজি নেলসন, স্টিফেনি সানক, এবং রব ওয়াইজ রয়েছেন। আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি থেকে কানাডা, যুক্তরাজ্য, সহ বেশ কিছু দেশে একযোগে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে। বইয়ের সপ্তম পৃষ্ঠায় মুখবন্ধে বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ায় ক্ষমতার পালাবদলের সাথে সাথে কিছু সম্ভাব্য হুমকি রয়েছে। পাকিস্তানে নতুন নেতৃত্ব এসেছে ২০১৩ সালে। বাংলাদেশে ২০১৪ সালে নতুন সরকার এসেছে। আফগানিস্তানে পাঁচ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ভারতে ২০১৪ সালের ৭ এপ্রিলে লোকসভার নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দৃশ্যপট বদলানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে নেপালে নতুন সরকার দায়িত্ব নিয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আশফাক পারভেজ কায়ানি নভেম্বর ২০১৩ সালে সেনাপ্রধানের পদ থেকে অবসরে গেছেন। বলা হচ্ছে, নেতৃত্ব পরিবর্তনের কারণে উগ্রপন্থীরা লাভবান হচ্ছে, ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে আফগানিস্তান থেকে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সহায়ক শক্তিকে প্রত্যাহার করা হচ্ছে (ট্রেন্ডস অব মিলিট্যান্সি এক্রস সাউথ এশিয়া, ২০১৩;৭)। বলা হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী আল কায়েদা ও আফগানিস্তানে তালিবানদের নিয়ে সারা বিশ্বে হইচই হলেও ছোট ছোট উগ্রপন্থী সংগঠন গুলো এ সুযোগে নিজেদের সক্রিয় করছে। উগ্রপন্থীদের আচরণ, গোষ্ঠী, অবস্থান, ধরণ গতিপ্রকৃতি সবকিছু এ রিপোর্টে তুলে ধরা হয়েছে। উগ্রপন্থীদের আচরণ এবং বৈশিষ্ট্যকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে।

আদর্শ : অবস্থান এবং কাজের পেছনে কি যুক্তি কাজ করছে?;

Dhaka University Institutional Repository

কাঠামো : গোষ্ঠীগুলোর আকৃতি কি?;

স্থায়িত্ব : গোষ্ঠীগুলো অর্থপ্রাপ্তি কিভাবে নিশ্চিত করে?;

কর্মপদ্ধতি : গোষ্ঠীগুলো কিভাবে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে?;

আফগানিস্তান, ভারত, পাকিস্তান ও নেপালের কিছু উগ্র জঙ্গী গোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হলো:

আফগানিস্তানের তালিবান:

সোভিয়েত রাশিয়া ১৯৮৯ সালে আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করলে ১৯৯৪ সালে ক্ষমতার রাজনীতি এবং গৃহযুদ্ধের পর তালিবানরা তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠিত হতে শুরু করে। শরিয়া আইন অনুযায়ী একটি কঠোর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৯৭ সালে দক্ষিণ আফগানিস্তান এবং কাবুলের বড় একটি অংশে এরা নিজেদের ভিত মজবুত করে। ২০০১ সালে তালিবান সরকার পতনের পর সমমনাদের সাথে নিয়ে পাকিস্তানের কোয়েটায় তাদের শুরা সদস্যদের দিয়ে ছায়া সরকার তৈরি করে। গণতান্ত্রিক আফগানিস্তান গঠনে তালিবানরা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বাধা।

হাক্কানী নেটওয়ার্ক:

আফগানিস্তানের হাক্কানী নেটওয়ার্ক পারিবারিক পরিবেশে গড়ে ওঠা একটি বড় গোষ্ঠী। সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জালালউদ্দিন হাক্কানী এ নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮০'র দশকে তিনি মুসলিম বিশ্ব ও মধ্যপ্রাচ্যে যোগাযোগ করে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করেন। তালিবান পতনের পর এটি আফগানিস্থানের একটি বড় বিদ্রোহী গ্রুপ,যার নেতৃত্বে রয়েছেন সিরাজউদ্দিন এবং মিরাম শাহ। পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানেও এদের অবস্থান শক্ত। নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে অভিযান পরিচালনা করে হাক্কানী নেটওয়ার্ক। এ গোষ্ঠী উজবেক ইসলামিক জিহাদ ইউনিয়ন, ইসলামিক মুভমেন্ট অফ উজবেকিস্তান,তেহরিক ই তালিবান পাকিস্তান, লস্কর-ই-তৈয়বা, এবং আল কায়েদার সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। হাক্কানী নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে কাবুলের ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল এবং আমেরিকান দূতাবাসে ২০১১ সালের জুন ও সেপ্টেম্বরে দুটি সন্ত্রাসী ঘটনার অভিযোগ রয়েছে।

পাকিস্তানের জঙ্গী সংগঠন:

তেহরিক ই তালিবান পাকিস্তান। ২০০৭ সালের জুলাই মাসে ইসলামাবাদের লাল মসজিদে অভিযানের পর থেকে এর প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন জঙ্গী সংগঠন ও জিহাদী নেতাদের নিয়ে এ সংগঠনটি গঠিত হয়েছে। এর প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে, পাকিস্তানের পশ্চিমে উপজাতীয় এলাকায় শরিয়াভিত্তিক একটি স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করা। ২০০৯ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বায়তুল্লাহ মেহসুদ এর নেতৃত্বে ছিলেন। পরে তার ভাইপো হাকিমউল্লাহ মেহসুদ এর দায়িত্ব নেয় *(ট্রেন্ডস ইন মিলিট্যান্সি এক্রস সাউথ এশিয়া;২০১৩)*। ২০১৩ সালের ২৯ অক্টোবর উত্তর ওয়াজিরিস্তানে ইসরাইলের ড্রোন হামলায় মারা যান এ তালেবান নেতা। তাকে হত্যার জন্য ৫ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিলো। তার মৃত্যুর পর সংগঠনের দায়িত্ব নেন খান সাইদ ওরফে সাজনা। পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান দৈনিক ডন জানিয়েছে, খান সাইদকে দায়িত্ব দেয়ার আগে ভোটাভুটি হয়। এতে শুরা কাউন্সিলের ৬০ জন সদস্য অংশ নেয়। খান সাইদের পক্ষে ভোট পড়ে ৪৩ শতাংশ। আর বিপক্ষে পড়ে মাত্র ১৭ ভোট। ৩৬ বছর বয়সী খান সাইদ করাচির নৌঘাঁটি হামলার সাথে জড়িত বলে মনে করা হয়। এছাড়া গত বছর পাকিস্তানের বান্নু শহরে জেল ভেঙ্গে যে ৪০০ বন্দীকে মুক্ত করা হয়, তার অন্যতম প্রধান পরিকল্পনাকারী মনে করা হয় খান সাইদকে। খান সাইদের প্রাতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষা নেই, তবে তিনি ভালো যুদ্ধ করতে পারেন এবং আফগানিস্তানে তার যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা আছে *(রেডিও তেহরান, ২ নভেম্বর:২০১৩)*।

লস্কর ই তৈয়বা এবং জামায়াত-উদ-দাওয়া:

১৯৯০ সালে মারকাজ আল দাওয়া ওয়াল ইরশাদের সাথে তিনটি লক্ষ্যে একীভূত হয় সংগঠনগুলো। মূলত: কাশ্মীরকে ভারতের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করাই এদের সামরিক শাখার প্রধান লক্ষ্য। বিংশ শতকের মধ্যভাগে আফগানিস্তানে

এর শাখার বিস্তৃতি ঘটে। হাক্কানী নেটওয়ার্কের সাথে এদের যোগাযোগ রয়েছে। পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এর সাথে এর যোগাযোগ রয়েছে। ২০০৮ সালে ভারতের মুম্বাইয়ে এ গোষ্ঠীর আক্রমণে ১৬০ জন লোক মারা যায়।

লস্কর-ই-জানভী:

১৯৯৬ সালে পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল সিপাহ-ই-সাহাবা পাকিস্তান থেকে উদ্ভূত জঙ্গী সংগঠন। ১৯৮০ দশকের মাঝামাঝি ইরানে বিপ্লবের পর পাকিস্তানে শিয়াবিরোধী জঙ্গী সংগঠন হিসেবে এটি আবির্ভূত হয়। ৯০ এর শুরুতে শিয়াদের বিরুদ্ধে এ সংগঠন অনেক আক্রমণ করেছিল।

ভারতের জঙ্গী সংগঠন:

স্টুডেন্ট ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া (সিমি): ভারতের মুসলিম ছাত্রদের প্রতি বৈষম্য এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে ১৯৭৭ সালে ভারতের আলিগড়ে এ সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। জামায়াতে-ইসলামী হিন্দ এর সাথে এ সংগঠনের যোগসূত্রিতা দেখা যায়। মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুড ও পরে আল কায়েদার সাথে এদের সম্পৃক্ততা দেখা যায়। ২০০০ সালের শুরুর দিকে মার্কিন বিরোধী ভূমিকার জন্য এ সংগঠনটি ভারতে নিষিদ্ধ হয়।

ভারতীয় মুজাহিদিন:

২০০০ সালের মাঝামাঝি এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯২ সালে ভারতের বাবরী মসজিদ ভাঙ্গা ও ২০০২ সালে গুজরাটে দাঙ্গা এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যের প্রতিবাদে এ সংগঠন গড়ে ওঠে। এর সাথে লস্কর-ই-তৈয়বা ও আইএসআইয়ের যোগাযোগের সম্পৃক্ততার অভিযোগ থাকলেও এটি তাদের নিজস্ব স্বার্থ নিয়ে লড়াই করে থাকে। জয়পুর, ব্যাঙ্গালোর, আহমেদাবাদ ও দিল্লীতে উচ্চ পর্যায়ের কয়েকটি স্থানে এরা আক্রমণ করেছে। ২০১০ সালে ভারত সরকার এ সংগঠনকে নিষিদ্ধ করে ।

কমিউনিষ্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মাওবাদী):

১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের নক্সালবাড়ী ও কৃষক আন্দোলন থেকে এর বিস্তৃতি ঘটে। ১৯৮০ ও ১৯৯০ এর দশকে সমাজের নিম্নবর্ণ ও মাওবাদী আচরণের লোকদের নিয়ে নক্সালবাড়ী বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে। সিপিআই মাওবাদী বামপন্থী গেরিলা সংগঠনগুলোর মধ্যে অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গের উড়িষ্যা, ছত্রিশগড়, ঝাড়খন্ড এবং অন্ধ্র প্রদেশে এদের কর্মকান্ড বেশি ছিল। ২০০৪ সালে মাওবাদী কমিউনিষ্ট সেন্টার অফ ইন্ডিয়া এবং পিপলস ওয়ার গ্রুপ একীভূত হয়ে যায়। ২০১০ সালে ভারত সরকারের সাথে সিপিআইএমের সংঘর্ষে অন্তত এক হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে।

হিন্দু উগ্রবাদী সংস্থা (আরএসএস):

হিন্দু জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী সংগঠন। দ্য রাষ্ট্রীয় স্বেচ্ছাসেবক সংঘ ১৯২৫ সালে গঠিত। হিন্দু রাজনীতি, আদর্শ, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক বিকাশের লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে। বিজেপি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও শিবসেনা সংগঠনের সাথেও এর যোগসূত্র রয়েছে। ১৯৯২ সালে বাবরী মসজিদ ও ২০০২ সালে গুজরাটে দাঙ্গায় এরা জড়িত *(ট্রেন্ডস ইন মিলিট্যান্সি এক্রস সাউথ এশিয়া; এপ্রিল ২০১৩)*।

উলফা:

Dhaka University Institutional Repository

৫১৯ বর্গকিলোমিটার আয়তনের আসামকে স্বাধীন করার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯০ সালে ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব আসম (উলফা) তাদের ইশতেহার প্রকাশ করে। যদিও ১৯৭৯ সালের ৭ এপ্রিল একটি সংগঠন গঠনের লক্ষ্যে ২২ সদস্যের একটি দল কামরুপ জেলার শিবসাগরের রংঘরে প্রথম বৈঠক করে। ১৯৮৩ সালের মার্চে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করে উলফা। অরবিন্দ রাজখোয়া চেয়ারম্যান আর অনুপ চেটিয়া সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। অনুপ চেটিয়া বর্তমানে বাংলাদেশের কারাগারে বন্দি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর মতে, উলফা সদস্য সংখ্যা তিনহাজার, আবার অন্যান্য উৎস থেকে তাদের ৪০ থেকে ৬০ হাজার স্বেচ্ছাসেবী কর্মীর ধারণা পাওয়া যায়। চারটি এলাকায় তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম চলে। পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল, কেন্দ্র এবং দক্ষিণ জেলা। উলফার সামরিক শাখার নাম হচ্ছে সংযুক্ত মুক্তি ফৌজ, যা ১৯৯৬ সালের ১৬ মার্চ গঠিত হয়। পূর্ণকালীন নারী কমান্ডার না থাকলেও এদের প্রায় ২০০ নারী সদস্য রয়েছে। তিনটি পূর্ণ ব্যাটালিয়ন রয়েছে। এগুলো হচ্ছে: ৭ম, ৮ম এবং ৭০৯। উলফাকে সন্ত্রাসী সংগঠনের আখ্যা দিয়ে এবং বেআইনী কার্যকলাপের অভিযোগে ভারত সরকার ১৯৯০ সালে নিষিদ্ধ করে। ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে বেশ ক'বার অভিযান চালায়। ১৯৯০ এর নভেম্বরে অপারেশন বজরং, ১৯৯১ এর সেপ্টেম্বরে অপারেশন রাইনো এবং ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে অপারেশন অল ক্লিয়ার অভিযান পরিচালিত হয়। ভারত সরকার মনে করে, পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের তত্ত্বাবধানে উলফা তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করে। মূলত: ভুটানের দক্ষিণাঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করছিল উলফা। ২০০৩ সালে রয়্যাল ভুটানিজ আর্মি তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয় *(উল্লাহ, মাহফুজ ২০১২;৭৭,৭৯,৮১, ৮২-৮৩,৯৯)*।

২০০৫ সালের ৩রা জুন, উলফা প্রতিষ্ঠিত কিছু হোটেল ও সম্পদের সন্ধান খুঁজে পান বিএসএফের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের কর্মকর্তা এসসি শ্রীবাস্তব। বাংলাদেশে কিছু হোটেল এবং নার্সিং হোমের সাথে উলফার সংশ্লিষ্টতার তথ্যও দেন তিনি। ঢাকার সুরমা ইন্টারন্যাশনাল, হোটেল মোহাম্মদীয়া ও পদ্মা ইন্টারন্যাশনাল, সিলেটে কেয়া ও যমুনা ইন্টারন্যাশনাল এবং হোটেল বসুন্ধরা ও রাজকিং চট্টগ্রামে উলফার বিনিয়োগ রয়েছে। হোটেলগুলোর ম্যানেজার পদে উলফা জঙ্গী সদস্য আহমেদ, কামাল হোসেন, সাইদুল, সোহেল, হুমায়ূন এবং রুবেল দায়িত্ব পালন করছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশে উলফার তিনটি সক্রিয় ব্যাংক একাউন্টের সন্ধান ও পেয়েছে তারা। সেগুলো হচ্ছে, সিলেটের জিন্দাবাজারের আরব বাংলাদেশ ব্যাংকের একাউন্ট নং-০২৫৪০১/০৮, ফার্মগেট শাখার নং-৫২৬৬৭০৯/১৫ এবং আল বারাকাহ ব্যাংকের পাহাড়তলী শাখার নং-০৯/২২৯৪৭২। যদিও ঢাকার সে সময়ের পুলিশ মহাপরিদর্শক আব্দুল কাইয়ুম বলেছেন, এ ধরনের কোন তথ্য তাদের কাছে নেই। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে উলফার হোটেল ও ব্যাংক একাউন্ট থাকার বিষয়টিও অস্বীকার করেছে। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা পরেশ বড়ুয়ার বাংলাদেশে ব্যবসায় বিনিয়োগ সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পরেশ বড়ুয়া বাংলাদেশে বেনামে ২০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। এর মধ্যে ১৪ মিলিয়ন ডলার বসুন্ধরা রিয়েল এস্টেটে, ইস্টার্ণ হাউজিং প্রকল্প ও যমুনা গ্রুপের আবাসন প্রকল্পে লন্ডন প্রবাসী খায়রুজ্জামান নামে বিনিয়োগ করে। বসুন্ধরায় ৭ মিলিয়ন ডলার দিয়ে ১৭ ভাগ শেয়ার, ইস্টার্ণ হাউজিংয়ে ৪ মিলিয়ন ডলার দিয়ে ৯ ভাগ এবং যমুনায় ৩ মিলিয়ন ডলার দিয়ে ২ভাগ শেয়ারের মালিকানা নিয়েছে।

দুবাই প্রবাসী ব্যবসায়ী জুমেন নাম দিয়ে পরেশ বড়ুয়া ঢাকার নামকরা শমরিতা হাসপাতালে ২ লাখ ডলার দিয়ে ৩০ শতাংশের মালিক হয়েছেন। কাসেম টেক্সটাইলে ১.৭ মিলিয়ন ডলার দিয়ে ৩০ ভাগ শেয়ার এবং চৌধুরী শিপিংয়ে ২.৫ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগে ৩০ ভাগ এবং ঢাকার নামকরা চাইনিজ উইমফ্রেতে ১ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে ৪০ ভাগের মালিকানা নিয়েছেন *(টিম পার্লম্যান এন্ড গিল পিলিং, কাউন্টার টেরোরিজম ফাইনান্স এবং আনন্দ কুমার, টেরর ফাইনান্সিং ইন বাংলাদেশ, স্ট্র্যাটেজি এনালাইসিস ভলিউম, ৩৩, নভেম্বর, ২০০৯;৯০৩-৯১৭)*।

নেপালের জঙ্গীবাদী সংগঠন:

পৌত্তলিক পরিচয়ের ছোট একটি জঙ্গীবাদী গ্রুপ নেপালের মধ্যেই তাদের কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী দক্ষিণ তরাই অঞ্চলে "মাদেশীদের" অবস্থান। ২০০৭ ও ২০০৯ সালে অনেক নেপালী স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে এ সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়েছে। *(ট্রেন্ডস ইন মিলিট্যান্সি এক্রস সাউথ এশিয়া; এপ্রিল ২০১৩)*। ২০১৩ সালের ১৯ নভেম্বর নেপালের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের সুশীল কৈরালা বিজয়ী হয়ে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন।

জিল্লুর রহমান খান ও সৈয়দ সাদ আন্দালিব সম্পাদিত **"Democracy in Bangladesh"** বইটি ২০১১ সালে প্রকাশিত হয়। হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ বিষয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধগুলো বইটিতে তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে গণতন্ত্র ও নিরাপত্তা, গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতার জন্য আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব সহায়ক কি না? চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তি, একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশ: গণতন্ত্র, উন্নয়ন, সন্ত্রাসবাদ এবং এর পাল্টা শক্তি; উন্নয়ন, গণতন্ত্র এবং বেসরকারী সংস্থা : বাংলাদেশের আলোকে তত্ত্ব এবং প্রমাণ; দক্ষিণ এশিয়ার শরণার্থী সংক্রান্ত সহিংসতা সহ বেশ কিছু প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়েছে। বইয়ে জঙ্গীবাদের হুমকি শিরোনামে প্রকাশিত নিবন্ধে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের ক্ষেত্রে দু'ধরনের ঝুঁকি রয়েছে। একটি ধর্মীয় ও অন্যটি নানা কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট সে সময়ের বিরোধী দল আওয়ামীলীগের সভায় এক গ্রেনেড হামলা চালানো হয়। এক বছরের মাথায় দেশের ৬৩ জেলায় প্রায় ৫০০ স্থানে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। ধর্মকে ব্যবহার করে জঙ্গী তৎপরতার বড় ধরনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় ঐ সিরিজ বোমা হামলায়। জেএমবি ও বাংলাভাইদের মতো, জিহাদী গ্রুপের আবির্ভাব ঘটে বাংলাদেশে এবং সংগঠনের অনেকেই আবার রাজনৈতিক কারণে ব্যবহৃত হয়েছে *(খান ও আন্দালিব ২০১১;৯৩)*।

ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশের পশ্চিমে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সমস্যা জর্জরিত এলাকা। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ এশিয়ার ইসলামপন্থী গোষ্ঠীও নাশকতামূলক কাজে সক্রিয়। যদিও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এসবের বিপরীতে নিজেদের সবসময় সক্রিয় দাবি করে আসছে।

সহিংসতা বাংলাদেশে নতুন কোন ঘটনা নয়, আরাকানের গোষ্ঠীর নেতৃত্বে স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে উগ্রপন্থীদের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। নাইন ইলেভেনের পর বাংলাদেশে হুজি বা হরকাতুল জিহাদ ও আলকায়েদার বিস্তৃতি ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আফগানিস্তানের হয়ে বিভিন্ন যুদ্ধে অনেক বাংলাদেশী সরাসরি যুদ্ধ করেছে বলে তথ্য উঠে আসে। ইরাকে ২০০৩ সালে মার্কিন হামলার পর "ইসলামের উপর হামলা" ইস্যুটি অন্য দেশের মতো বাংলাদেশী অনেক মানুষকেও প্রভাবিত করেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সুষ্ঠু গণতন্ত্র চর্চার অভাব আওয়ামীলীগ ও বিএনপির রাজনৈতিক বিভাজনের সুযোগে ইসলামকে ব্যবহার করে কেউ কেউ জঙ্গীবাদকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। এমতাবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে, কিছু প্রশ্ন। স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের দায়িত্ব কার? নিজের দলের ভিতর গণতান্ত্রিক সংস্কার ছাড়া রাজনৈতিক দলগুলো কি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবে? পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, সব রাজনৈতিক দলই ছাত্রদের নোংরাভাবে ব্যবহার করছে রাজনীতিতে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ছাত্ররাজনীতির ইতিহাস থাকলেও সেই গৌরবের পথ থেকে ছাত্রনেতারা অনেকটাই সরে এসেছেন *(খান ও আন্দালিব,২০১১;৯৬)*।

বি, কে, জাহাঙ্গীর তার ২০০২ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত "ন্যাশনালিজম, ফান্ডামেন্টালিজম এন্ড ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ" গ্রন্থে বাংলাদেশের ছয়টি মৌলিক সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জিয়াউর রহমানের সময়কার জাতীয়তাবাদের সমস্যার কথা বলেছেন। জাতীয়তাবাদ উন্নয়নে রাজনৈতিক অর্থনীতি; এরশাদ আমল, বাংলাদেশের ইতিহাস ও রাজনীতি পুনর্গঠনে সোনার বাংলা নামের মিথ, গণতন্ত্রায়ন, জাতীয়তাবাদ এবং

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ, বাজার অর্থনীতি, গণতন্ত্র, এবং জাতীয়তাবাদে কিছু প্রতিবিম্বতা; মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা এবং জাতীয়তাবাদ নামক প্রবন্ধে বেশ কিছু মতামত লেখক তুলে ধরেছেন। 'মৌলবাদ,সাম্প্রদায়িকতা এবং জাতীয়তাবাদ' প্রবন্ধে বলেছেন, মৌলবাদ হচ্ছে আধুনিকতার একটি প্রতিক্রিয়া। মৌলবাদের নানাবিধ চলক সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে, ভবিষ্যতের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত (*জাহাঙ্গীর ২০০২;* ১২১)।

পাকিস্তানের করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মুনিস আহমার সম্পাদিত"Paradigms of Conflict Resolution in South Asia" গ্রন্থে দ্বন্দ্ব-সংঘাত এগুলোর কারণ, বিভিন্ন যুদ্ধের পর আন্তঃদেশীয় সম্পর্ক, সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ সংকলিত হয়। বইটির প্রধান উপাদান হচ্ছে, নাইন ইলেভেন পরবর্তী সন্ত্রাসবাদ ও যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জেগে ওঠা। শান্তি প্রক্রিয়া এবং আস্থা তৈরির জন্য পদক্ষেপ নেয়া, আভ্যন্তরীণ এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব ও সংঘাত নিরসনের কৌশল বের করা। উদাহরণস্বরুপ: ট্র্যাক-টু কূটনীতি, সন্ত্রাসবাদ, শরণার্থী এবং জেন্ডার ইস্যু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া আরো কিছু পর্যবেক্ষণ তিনি তুলে ধরেছেন। নাইন ইলেভেন পরবর্তী যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের পর থেকেই দ্বন্দ্ব এবং তা নিরসনের সংজ্ঞা অনেকখানি পরিবর্তন হয়ে যায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে (*আহমার, ২০০৩: ৪*)।

ইউনাইটেড স্টেটস ইনস্টিটিউট অফ পিস 'www.usip.org' এ ওয়েব পেইজে ২০০৬ সালে সুমিত গাঙ্গুলির "দ্য রাইজ অফ ইসলামিস্ট মিলিট্যান্সি ইন বাংলাদেশ" নামে একটি বিশেষ রিপোর্ট প্রকাশ করে। সে রিপোর্টে বাংলাদেশে ইসলামের ইতিহাস, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম ইসলামি গোষ্ঠীর বিকাশ ও এগুলো প্রতিরোধে বেশ কিছু সুপারিশমালা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে "দ্য গ্রোথ অফ ইসলামিস্ট গ্রুপস" অধ্যায়ে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে কয়েক বছর থেকে ইসলামী জঙ্গী গোষ্ঠীর বিকাশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর মধ্যে কিছু গোষ্ঠীর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা থাকলেও অনেকগুলোর কোন রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ বিকাশে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে বেকারত্ব, দারিদ্র, পরিবেশের বিপর্যয়, এবং রাজনৈতিক আদেশ। যার ফলে জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশেরই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি বিশ্বাসহীনতা রয়েছে। এমন একটি রাজনৈতিক পরিবেশে ধর্মীয় গোষ্ঠী ও সংগঠনের বিকাশ লাভ করে। বাংলাদেশে কয়েকটি জঙ্গী সংগঠন রয়েছে। এগুলো হচ্ছে, জমিয়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি), জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি), হরকাতুল জিহাদ ইসলামী (হুজি) এবং হিযবুত তাহরীর (*Ganguly: 2006;www.usip.org*) ।

রাজনীতিক ড. কর্ণেল অলি আহমদ (অব) বীরবিক্রম, দৈনিক নয়াদিগন্তে ২০১৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর 'জঙ্গীবাদের হোতা ও উত্থান' বিষয়ে একটি উপ-সম্পাদকীয় লিখেছেন। সেখানে তিনি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা পরবর্তী দেশে আইনশৃঙ্খলার অবনতি এবং দেশজুড়ে অরাজকতার কথা উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন সময়ে দেশে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড নিয়ে লিখেছেন। তিনি বলেছেন, ইদানীং সরকারের পক্ষ থেকে বারবার বলা হচ্ছে, বিএনপি অর্থাৎ জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী সরকার ক্ষমতায় এলে দেশে জঙ্গীবাদ আরো বাড়বে, বিগত দিনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশে মূলত: জঙ্গীবাদের মদদদাতা ও হোতা হিসেবে আওয়ামীলীগ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। অন্য দলগুলো কোনো কোনো জায়গায় জড়িত ছিলনা, তা হলফ করে বলা যাবে না। তবে আওয়ামীলীগের চেয়ে তা খুবই নগণ্য। আওয়ামীলীগ শাসনামলেই উদীচি, রমনা বটমূল, যশোর, পল্টন, নারায়ণগঞ্জ, কুস্টিয়া, গোপালগঞ্জে বোমা বিস্ফোরণে বহু লোক মারা যায়।"

উপ-সম্পাদকীয় শেষ দিকে তিনি লিখেছেন, 'অধিকারের জুন ২০১৩, পরিসংখ্যান অনুযায়ী (জানুয়ারি, ২০০৯ থেকে মে, ২০১৩) মোট খুনের সংখ্যা ১৮২৮৯, এর মধ্যে রাজনৈতিক হত্যা ১০৮২, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড ৬৫২, গণপিটুনীতে নিহত ৬৩৮ ও সাংবাদিক নিহত হয়েছে ১৭জন। সুতরাং দেশের জনগণ ঠিকই জানেন ,প্রধানত আওয়ামীলীগ এ দেশে জঙ্গীবাদের হোতা। অন্যদের দোষারোপ করে লাভ নেই " (আহমদ, অলি; ২০১৩)।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের **অধ্যাপক ডক্টর আবুল বারাকাত** ২৬ জুন, ২০১২ সালে জাহানারা ইমাম স্মারক বক্তৃতায় "বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতি, রাজনীতি ও জঙ্গীত্ব : যোগসূত্র কোথায়" নামে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, অর্থনীতির দুর্বৃত্তরা তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও নীতিনির্ধারণী প্রতিষ্ঠান এমনভাবে দখল করেন, যেখানে সংবিধানের বিধি মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা অনেকটাই অসম্ভব। তারা মূলধারার ক্ষমতার রাজনীতি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান-ব্যক্তিকে ফান্ড করেন; তারা ঘুষ দুর্নীতিতে পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তারা রাষ্ট্রীয় বাজেট বরাদ্ধ নির্ধারণ ও ভোগ করার বন্দোবস্ত পাকাপোক্ত করেন; তারা লুট করেন সবকিছু; জমি, পানি ,বাতাস এমনকি বিচারের রায় পর্যন্ত। তারা ধর্মের লেবাস যত্রতত্র ব্যবহার করেন, স্বধার্মিকতা প্রদর্শনে হেন কাজ নেই যা করেননা। স্থানভেদে ২ থেকে ২০ কোটি টাকা বিনিয়োগে জাতীয় সংসদের আসন কিনে ফেলেন। ১৯৫৪ এর জাতীয় সংসদে সদস্য সংখ্যার ৪ ভাগ ব্যবসায়ী থাকলেও বর্তমানে সে সংখ্যা ৮৪ ভাগ বলে তিনি জানান। অর্থনীতি ও রাজনীতির এসব দুর্বৃত্তদের প্রতি মানুষের আত্মার গভীরে অনাস্থা আছে। মানুষের সামনে এখন আর রাজনৈতিক আদর্শ বলে কিছু নেই, এসব প্রবণতা যে হতাশা-নিরাশা সৃষ্টি করেছে সেগুলোই হয়ে দাঁড়িয়েছে উগ্র সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীদের সংগঠন বিস্তৃতির সহায়ক উপাদান। প্রধানত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কারণে মানুষ তথাকথিত গণতন্ত্রী রাজনীতিবিদদের প্রতি আস্থা হারাচ্ছেন, আর প্রগতির সেই ধারাও এক সাথে তাল মিলিয়ে বিকশিত হয়নি। মানুষ যখন ক্রমাগত বিপন্ন হতে থাকেন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থা হারান এবং আস্থাহীনতা যখন নিয়মে পরিণত হয়, তখন ব্যাপক সাধারণ জনমানুষ উত্তরোত্তর অধিক হারে নিয়তি নির্ভর হতে বাধ্য হন। আর এ নিয়তি নির্ভরতা বাড়ছে কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে যেখানে ৬০ভাগ কৃষকই এখন ভূমিহীন। যে কৃষি ভিত্তির উপরই এদেশে বিকশিত হয়েছে ধর্ম। এ ভ্যাকুয়াম বা শূন্যতা ব্যবহার করছে মৌলবাদী রাজনীতি। এসব কাজে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী পারদর্শী বলে তিনি মন্তব্য করেছেন *(বারাকাত ড.আবুল ২৬, জুন; ২০১২ স্মারক বক্তৃতা)*।

প্রবাসী লেখক ফারুক যোশী ২০০৭ সালে "সন্ত্রাস মৌলবাদ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ" বইয়ে আওয়ামীলীগ এবং নির্বাচনে জেতার মৌলবাদী ফতোয়া প্রবন্ধে লিখেছেন,"আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় যাবার জন্য ফতোয়ার অধিকার সংরক্ষণ, শরীয়ত বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন না করা, কওমী মাদ্রাসার সনদের সরকারী স্বীকৃতি বাস্তবায়নসহ পাঁচটি শর্ত নিয়ে এই দলটির সাথে মতৈক্যে শুধু যে পৌঁছেছে তা নয়, রীতিমত কাগজে খত দিয়ে একটা শ্রেণীর ভোট বাগানোর কৌশল হাতে নিয়েছে। অথচ এ কৌশলকে কেউ মেনে নিচ্ছে না। বিগত সরকারের আমলে তর তর করে উত্থান হওয়া খেলাফত মজলিসের কর্মী নয়, খোদ এদের নেতারা সরাসরি জঙ্গী মৌলবাদী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এরা নিজেদের জঙ্গী হিসেবে পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনা। সে কারণে ভোটের আশায় এই দলগুলো নিয়ে গঠিত মহাঐক্যজোটকে যদি মানুষ বিএনপি-জামায়াতের বিপরীতে আওয়ামীলীগ-খেলাফত আরেক মৌলবাদী মহাঐক্যজোট হিসেবে আখ্যায়িত করে, তাহলে কি ভুল করা হবে" *(যোশী, ফারুক ২০০৭;১২৮)*।

ব্রেট ও'ডোনেল এবং ডেভিড এইচ গ্রে তাদের 'Media & State Sponsored Terrorism' প্রবন্ধে বলেছেন, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাস নাগরিকের স্বাধীনতা ও তথ্য প্রাপ্তিকে সংরক্ষিত করে রাখে। ইরান, উত্তর কোরিয়া, এবং লিবিয়া তাদের জনগণকে তথ্য থেকে দূরে রাখে। রাজনৈতিক দলের নেতাদের এজেন্ডা তারা জনগণকে অবহিত করেনা। যেসব সন্ত্রাসী সংগঠনকে তারা সমর্থন করে সেগুলোকে তারা হিরো বা বীর, বিদ্রোহী যোদ্ধা হিসেবে গণমাধ্যমে দেখায়। আর পশ্চিমা ও ইসরাইলীদের হীন, দু:শ্চরিত্র, অনৈতিক চরিত্রের অধিকারী এবং নিষ্ঠুর হিসেবে তুলে ধরে। সেখানে বলা হয়েছে, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকে ঘিরে সেখানে জঙ্গীবাদের বিকাশ ঘটেছে। নিস্পাপ মানুষ হত্যা ও সম্পত্তি ধ্বংস বাদ দিলে পিএলও দুটি কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। ১.তারা গণমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ ও বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। ২. আন্তর্জাতিক জঙ্গীবাদ বিশেষজ্ঞ ব্রুস হফম্যানের মতে, পিএলও হচ্ছে প্রথম

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠন (হফম্যান, ২০০৬)। বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনায় পিএলও প্রথম বিশ্বগণমাধ্যমের সামনে আসে। তারা রাজনৈতিক বৈধতা পেয়েছে, ৮৬ টি রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। আর প্রতিষ্ঠিত ইসরাইল ৭২টি রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক রেখেছে। ইসরাইলের বার্ষিক আয় ৬'শ মিলিয়ন ডলার, যার ৫'শ মিলিয়ন ডলারই আসে বহির্বিশ্বে করা বিনিয়োগ থেকে *(Hoffman,2006, Global Security Studies, Spring 2012, Volume 3, Issue 2)*।

ভারতীয় লেখক নজরুল হাফীজ নদভী রচিত "মাগরেবী মিডিয়া আওর উসকে আছারাত" বইয়ের বাংলা "পশ্চিমা মিডিয়ার স্বরুপ" অনুবাদ করেছেন শহীদুল ইসলাম ফারুকী। ৩০০ পৃষ্ঠার এ বইয়ে নাইন ইলেভেনের ঘটনা, বিশ্বের প্রভাবশালী গণমাধ্যমগুলোর চরিত্র,তাদের রিপোর্টিং, আরববিশ্বে পশ্চিমা মিডিয়ার আগ্রাসন, পশ্চিমা মিডিয়ার পথ ধরে ভারতীয় মিডিয়ার প্রভাব, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক ইস্যু তৈরি ও মুসলমানদের বিষয়ে বিভিন্ন নেতিবাচক রিপোর্টিং তৈরি সহ বিভিন্ন বিষয় আলোকপাত করেছেন।

মূলত: ১৮৯৭ সালে সুইজারল্যান্ডের প্রসিদ্ধ শহর ব্রাসেলসে হার্টিজেলের নেতৃত্বে তিন'শ ইহুদী বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ, ও দার্শনিকের একটি বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে গোটা বিশ্বের উপর ইহুদীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়। এই পরিকল্পনায় ১৯টি প্রটোকল রয়েছে। এই পরিকল্পনাকে ইহুদী বুদ্ধিজীবীদের দস্তাবেজও বলা হয়। প্ল্যান ও পরিকল্পনা তৈরিতে বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা ত্রিশটি ইহুদী সংগঠনের তিনশ'মেধাবী ও চৌকস সদস্য অংশ নেয়। তারা সিদ্ধান্ত নেয়, পুরো বিশ্বের ওপর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য স্বর্ণভান্ডার দখল করা যেমন জরুরি, তেমনিভাবে প্রচার মাধ্যমের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাও মৌলিক কর্তব্য। ঐ সম্মেলনে গৃহীত দ্বাদশ দস্তাবেজে বলা হয়েছে, গোটা বিশ্বের উপর কর্তৃত্ব পেতে প্রচার মাধ্যমকে উদ্দেশ্য অর্জনের দ্বিতীয় মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ভাবতে হবে।

শত্রুদের হাতে এমন কোন কার্যকর ও শক্তিশালী সংবাদপত্র থাকতে দেয়া হবে না, যার মাধ্যমে তারা তাদের মতামত সক্রিয়ভাবে জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে পারে। এমন আইন করা হবে, যাতে কোন প্রকাশক বা প্রেস মালিক অনুমতি ছাড়া কোন বিষয় ছাপতে পারবেনা। এভাবেই যে কোন ধরনের ষড়যন্ত্র ও শত্রুতামূলক প্রপাগান্ডা সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে। যখন যেখানে ইচ্ছা জাতি গোষ্ঠীগুলোর চেতনা উজ্জীবিত করা হবে, আবার সময়মতো তা ঠান্ডা করে দেয়া হবে। এ জন্য সত্য ও মিথ্যা দুটোরই আশ্রয় নেয়া হবে। প্রেস-প্রকাশনার মৌলিক কাজ হবে, বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও কলামের মাধ্যমে জনমত গঠন করা। এমন সম্পাদক, পরিচালক, সাংবাদিকদের উৎসাহ দেয়া হবে যাদের অতীতে অপকর্মের রেকর্ড আছে। ঠিক রাজনীতিবিদদের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। খুব কাভারেজ দিয়ে কাউকে হিরো বানিয়ে যখন দেখা যাবে হাত থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করবে তখন এমন শিক্ষা দেয়া হবে,যা অন্যদের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে। তাদের মালিকানায় রয়েছে রয়টার, এসোসিয়েটেড প্রেস,ইউনাইটেড প্রেস, এএফপি, নিউইয়র্ক পোস্ট, ভারতের স্টার গ্রুপ, স্কাই টিভি, লন্ডন টাইমস, সানডে টাইমস, ডেইলি মেইল ও ডেইলি হেরাল্ডসহ বড় বড় গণমাধ্যম। এছাড়া ইহুদীদের মালিকানায় রয়েছে আমেরিকার পাঁচটি বড় টিভি কোম্পানী। এগুলো হচ্ছে আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কোম্পানী (এবিসি), ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং কোম্পানী (এনবিসি), ক্যাবল নিউজ নেটওয়ার্ক (সিএনএন), কলম্বো ব্রডকাস্টিং কোম্পানী (সিবিসি)ও পাবলিক ব্রডকাস্টিং কোম্পানী (পিবিএস) (*নদভী, ২০০৯; ৯৭-৯৮, ১০৮*)।

পশ্চিমা মিডিয়ার পলিসি অধ্যায়ে বলা হয়েছে, বর্তমান বিশ্বের প্রভাবশালী ৯৫ ভাগ মিডিয়ার উপর ইহুদীদের কর্তৃত্ব রয়েছে। মিডিয়ার মাধ্যমে তারা গোটা দুনিয়ার মস্তিস্ক গঠন তথা জনমত তৈরি করছে *(নদভী, ২০০৯;১২৫)*।

এক জরিপ অনুযায়ী মার্কিন মিডিয়ায় সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ৯০ ভাগ অনুষ্ঠানে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা ও মিথ্যা প্রচারণা চালানো হয়। ধর্মপন্থীদের পশ্চাৎপদ, কট্টরপন্থী ও মৌলবাদী বলে গালি দেয়া হচ্ছে এবং তাদের অস্তিত্বকে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও উন্নয়ন-উৎকর্ষের জন্য বিপজ্জনক আখ্যা দেয়া হচ্ছে *(নদভী, ২০০৯ ;১২৯)*। লস এঞ্জেলস টাইমসের পক্ষ থেকে ১৯৯৩ সালে একটি জরিপ চালানো হয়েছে আমেরিকায়। সেখানে ৪৫ ভাগ মার্কিনীর মন্তব্য হচ্ছে, সংবাদপত্রের শিরোনামের সাথে সংবাদের কোন সামঞ্জস্য নেই। ৫৩ শতাংশ মার্কিন সংবাদ সি.বি.এস, এন.বি.সি.ও এ.বি.এস থেকে সংগ্রহ করা হয়। ১৮ শতাংশ সংবাদ সি.এন.এন থেকে সংগহ করা হয়, যা ১৯৯৯ সালে ৮৮ শতাংশে উন্নীত হয় *(নদভী, ২০০৯;১১৫)*।

সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও গণমাধমের আন্তঃসম্পর্কঃ

"ট্রান্সন্যাশনাল টেরোরিজম সিকিউরিটি এন্ড দ্য রুল অব ল" জুলাই ২৩, ২০০৮ সালে প্রকাশিত জার্নালের টেরোরিজম এন্ড মিডিয়া অধ্যায়ে গণমাধ্যমের সাথে সন্ত্রাসবাদের সম্পর্ক, সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে কে কার সাহায্য গ্রহণ করছে, কেন সন্ত্রাসের খবরগুলো দর্শকদের কাছে উপাদেয়, সন্ত্রাসীরা কিভাবে ও কেন গণমাধ্যম ব্যবহার করে, আবার গণমাধ্যম সন্ত্রাসীদের কিভাবে ও কেন ব্যবহার করে, এসবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। "where the press is free (…) all is safe" *(বার্গ এবং লিপসকম্ব, ১৯০৪)*। প্রায় ২০০ বছর আগে থমাস জেফারসন এ মন্তব্য করেছিলেন, ২ শতাব্দি পরেও গণতান্ত্রিক সমাজে মুক্ত গণমাধ্যমের চেতনা এখনো এককোণে পড়ে আছে। রাজনৈতিক লক্ষ্য, ভয়ভীতি সৃষ্টির জন্য সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর গণমাধ্যম প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্থানীয় পর্যায়ে সন্ত্রাসী হামলা হয়, যেখানে খুব অল্প সংখ্যক লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু এ বার্তাটুকুই সমাজে ছড়িয়ে দিতে ও হামলাকারীদের উদ্দেশ্য এবং কারা হামলা করেছে গণমাধ্যম তা ছড়িয়ে দেয়।

সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থেচার বলেছিলেন, গণমাধ্যমের 'প্রচারণাই সন্ত্রাসীদের প্রাণ' *(মুলার ও অন্যরা ২০০৩;৬৫, ভিয়েরা ১৯৯১;৭৩-৮৫)*। সন্ত্রাসবাদের সাথে গণমাধ্যমের সম্পর্ক একমুখী নয়। সন্ত্রাসবাদের প্রাণ এখনো মিডিয়া পুরোপুরি হয়তো হয়নি, তবে সন্ত্রাসবাদ যে গণমাধ্যমের একটি আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তা নি:সন্দেহে বলা যায়। সন্ত্রাসবাদের সাথে গণমাধ্যমের সম্পর্ক কি ধরনের হতে পারে, এর নেতিবাচক প্রভাব কিভাবে কমানো যায় এগুলো এখনো আলোচনার বিষয়। সংবাদপত্র এবং টেলিভিশনকে ক্লাসিক মিডিয়া আর ইন্টারনেটকে বলা হচ্ছে নিউ মিডিয়া।

"How do media profit for terrorism' অ্যালেক্স সিমিড এবং জেনি ডি গ্রাফ বলেছেন, বিংশ শতাব্দীতে যোগাযোগ বিপ্লবের কারণে সন্ত্রাসবাদের চেহারাতে ও পরিবর্তন দেখা যাবে *(সিমিড এবং গ্রাফ, ১৯৮২; ১৬)*।

'Terrorism is theatre' এবং গণমাধ্যমের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সন্ত্রাসী হামলা সতর্কভাবেই পরিচালিত হচ্ছে, ব্রায়ান জেনকিনস ১৯৭০ সালে এ একথা বলেছেন। অন্যদিকে, সন্ত্রাসী ঘটনাকে নিজেদের প্রয়োজনেই একটি ঘটনার সৌখিন প্রদর্শনী বলে উল্লেখ করেছেন *(ব্রুস হফম্যান, ২০০৬; ১৭৪)*।

ফাওয়াজ গার্জেস এর মতে, গণমাধ্যমের ব্যবহার আল কায়েদার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংগঠনের অনেকের মতে, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রচার, ক্যামেরার আলো, ফ্ল্যাশ, ভক্ত এবং সমর্থনের কারণে বিন লাদেন অবসন্ন *(গার্জেস ২০০৫;১৯৪-১৯৭)*। আল কায়েদা নেতা আল জাওয়াহিরিও বিশ্বাস করেন, অর্ধেকেরও বেশি যুদ্ধ হয় গণমাধ্যমেই। (আইবিআইডি)-একটি ধর্মীয় ম্যাগাজিনে লিখেছে, "Film everything,this is advice for all mujahideen, you should be aware that every frame you take is as good as a missile fired at the crusader enemy and his puppets" *(economist, 2007)*।

ব্রুস হফম্যান তার ইনসাইড টেরোরিজম গ্রন্থে যুক্তি দেখিয়েছেন, গণমাধ্যমের প্রচার ছাড়া সন্ত্রাসীদের আক্রমণ অনেকটা ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হয়। কার উপর হামলা হলো, কে হামলা করলো, এসব তথ্য গণমাধ্যম সন্ত্রাসীদের লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছে দেয় *(হফম্যান, ২০০৬; ১৭৪)*।

ব্রিজিত নাকোস বলেছেন, "খুব বেশি সংবাদ প্রচার ছাড়া সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হচ্ছে বন থেকে গাছ কাটার মতো, যদি কেউ ঘটনা না জানে তাহলে মনে হবে যেন কিছুই হয়নি" *(নাকোস, ২০০০; ১৭৫)*।

বোয়াজ গেনর আরো শক্ত কথা বলেছেন, তার মতে, সন্ত্রাসী হামলায় মৃত্যু, তিন না তিরিশ, এমনকি তিনহাজার হলেও তাতে সন্ত্রাসীদের কোন আগ্রহ নেই, যদি না তাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যবস্তু বা দর্শকরা সে সম্পর্কে না জানে" কার্যত, তাদের আক্রমণ, কাঙ্খিত ভীতি, ধারাবাহিক হুমকি বা ঘোষণা রেডিও টিভিতে সেগুলোর সংবাদ প্রচার হলে মনস্তাত্ত্বিক ভীতি তৈরি হয় *(গেনর, ২০০২)*। সন্ত্রাসীদের প্রচারের জন্য গণমাধ্যম একটি ভালো পন্থা। গণমাধ্যমে বিষয়বস্তু নির্ধারণ ও তার কাঠামো ধারণ গণমাধ্যমের দুটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব রয়েছে।

একটি বিষয়বস্তু দর্শকদের কথা ভেবে, খুব ভালোভাবে তা উপাদেয় করে তোলা হচ্ছে গণমাধ্যমের এজেন্ডা সেটিং। আর ফ্রেমিংটা হচ্ছে, দর্শক শ্রোতা বিষয়টিকে কিভাবে দেখছে, তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, দর্শক শ্রোতা কিভাবে নিচ্ছে, *(Schenfele & Tewksbury 2007-11-12)*। যদিও সন্ত্রাসীরা জনগণের মনে তাদের সম্বন্ধে একটি ইতিবাচক ধারণা প্রত্যাশা করে। তিনটি উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে। প্রথমত, তাদের প্রতি মনোযোগ, স্বীকৃতি আদায় এবং আইনগত বৈধতা *(আলেকজান্ডার ও অন্যরা, ১৯৭৯; ১৬৯)*।

রবিন গেরিটস অবশ্য সন্ত্রাসী ও গণমাধ্যমের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক আন্ত:সম্পর্কের কথা বলেছেন। তার মতে, শক্তি প্রদর্শন, সহানুভূতি আদায়, ভীতি প্রদর্শন, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং সরকারকে নৈতিকভাবে দুর্বল করার জন্যই তারা গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে *(প্যারাফ্রেজড ইন প্যালেজ এন্ড ভিনসন, ১৯৯২;২)*।

ব্রিজিত নাকোস সন্ত্রাসীদের গণমাধ্যম নির্ভর চারটি উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন, প্রথমত, সন্ত্রাসীগোষ্ঠী তাদের কর্মকান্ড দিয়ে মনোযোগ বা দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যাতে দর্শক তাদের সম্পর্কে জানতে চায়, তাদের দাবি দাওয়া (সাধারণত সরকারের কাছে) পৌঁছে দেয়া, এবং সেগুলো মেনে নেয়া অথবা ভীতি প্রদর্শন।

দ্বিতীয়ত, তাদের কাজের কারণ জানানো। তারা কেন আক্রমণটি করছে সেটা স্পষ্ট করা,জনগণ তাদের কাজ সম্পর্কে জেনে নিলে সন্ত্রাসীদেরই সুবিধা হয় বলে মনে করে তারা।

তৃতীয়ত, তারা সম্মান ও তাদের দাবির প্রতি দর্শক শ্রোতা সহানুভূতিশীল হোক, এটা প্রত্যাশা করে। চতুর্থত, তারা আইনগত বৈধতা বা স্বীকৃতি চায়, গণমাধ্যম অন্য রাজনৈতিক উপাদানের মতো করে তাদেরকেও মূল্যায়ন করুক, তারা সেটা চায় *(নাকোস, ২০০৭; ২০)*।

সন্ত্রাসবাদ ও গণমাধ্যমের প্রভাব:

দর্শকশ্রোতাদের প্রভাবিত করতে সন্ত্রাসবাদ ও গণমাধ্যম হচ্ছে পরিপূরক। তারা একটি অন্যের খোরাক জোগায়। Lukaszewski, James E ১৯৮৭ সালের ১৯ মার্চ আমেরিকার বিমান অপারেটর ও ট্রান্সপোর্ট এসোসিয়েশনের এক যৌথ সভায় গণমাধ্যমের সংবাদ ও সন্ত্রাসবাদের ঘটনাকে নিম্নোক্ত মন্তব্যে ফুটিয়ে তোলেন। ।

"Media coverage and terrorism are soul mates - virtually inseparable. They feed off each other. They together create a dance of death - the one for political or ideological motives, the other for commercial success. This behavior can create strong anti-news media emotions among business executives and the public"- (Lukaszewski; *১৯৯৮ সালে সংশোধিত)*।

গণমাধ্যম কেন সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করে, সহজ উত্তর চাহিদা তৈরি। এছাড়া আরো কারণ আছে, সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সামাজিক দায়িত্ববোধ। সব ধরনের সন্ত্রাসী ঘটনা অবশ্যই সাংবাদিকরা কাভার করেন, দর্শকরা সন্ত্রাসীদের সম্পর্কে জানতে চায়, সন্ত্রাসী হামলা কারা কিভাবে, কেন, করলো ইত্যাদি। সন্ত্রাসবাদের ভয়াবহতা তুলে ধরাও এর একটি কারণ। যেমন একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী যদি বড় ধরনের কোন হুমকি দেয়, তখন গণমাধ্যম তাদের প্রতি বেশি মনোযোগ দেয়, আবার হুমকি যদি ছোটখাটো হয়, তবে আকর্ষণও কম হয়। মুলার বলেছেন, সংবাদপত্রের একটা ব্যবসায়িক নীতি হচ্ছে, "if it bleeds, its lead, There is an obvious, if less pungent, corollary if it doesn't bleed ,it certainly should not lead,and in deed, may not be fit to print at all" *(Mueller, 2007; 33)*।

ফলে দেখা যাচ্ছে, রক্তপাতের কম বেশির উপরে নির্ভর করে গণমাধ্যম সংবাদের গুরুত্ব দেয়। তবে শুধু রক্তপাতই একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, যা গণমাধ্যমে আকর্ষণীয় সংবাদ তৈরি করে।

রক্ষণশীল বিশ্লেষক ও সাংবাদিক ফ্রেড বার্নেস ১৯৮৫ সালে বলেছিলেন, গণমাধ্যমের সাধারণ আগ্রহ বিশেষ করে টিভির আয় সরাসরি বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভরশীল। একটি বিশেষ চ্যানেল যদি কোন একটি দর্শক গোষ্ঠী বেশি দেখে, তাহলে সে চ্যানেলের আয়ও বেশি হবে।

ব্রিজিত নাকোস উল্লেখ করেছেন, দর্শকের সংখ্যা এবং প্রচারের উপর তাদের পুরস্কার নির্ভর করে এবং এটা অবশ্যই বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্য *(নাকোস, ২০০৬; ৮২ : www.trannationalterrorism.eu: July 23; 2008)*।

ভারতের বিচারপতি ও প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জি এন রায় 'Terrorism New Challenges & Media' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ৩রা জানুয়ারি ২০০৯ সালে একটি সেমিনারে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, মুম্বাই আক্রমণের মতো ঘটনায় গণমাধ্যমের উচিত স্পর্শকাতর ছবি, তথ্য ও নাটকীয় ঘটনাগুলো এড়িয়ে চলা। গণমাধ্যমকে মনে রাখতে হবে, মন্তব্য বা বাক স্বাধীনতা অবাধ, কিন্তু ঘটনা যেটা ঘটছে সেটাও পবিত্র আমানত। মুম্বাই ঘটনার মতো পরিস্থিতি যখন দেশে তৈরি হয়, তখন গণমাধ্যমের কাছে প্রত্যাশা অনেক বেশি তৈরি হয়। এ ধরনের সংকটে গণমাধ্যমের ভূমিকা ও দায়িত্ব অনেক তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। এ ধরনের সময় তথ্য, আগ্রহ ও গুজবের সংজ্ঞা নিরুপণ এবং এ সম্পর্কে জানা দরকার। সাংবাদিকদের অবশ্যই দেশের মানুষের মধ্যে ভীতি ও আতংক তৈরি হয়, এমন সংবাদ পরিবেশন থেকে বিরত থাকতে হবে। স্পট রিপোর্টিয়ের নামে এমন তথ্য পরিবেশন করবেন না, যাতে কৌশলে সন্ত্রাসীদের তা কাজে আসে এবং ঘটনার শিকার এমন ব্যক্তির জীবনকে হুমকির মুখে ফেলে দেয়। এ ধরনের ঘটনার কথা বিবেচনায় এনে গণমাধ্যমের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা উচিত। পাঞ্জাব, কাশ্মীর এবং উত্তর-পূর্ব রাজ্যের অস্থিতিশীল ঘটনার সময় প্রেস কাউন্সিল নীতিমালা তৈরি করেছিল, তখন থেকে সন্ত্রাসীরা তাদের অপারেশনে পরিবর্তন আনে। সন্ত্রাসী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে নিউজ ব্রডকাস্টারস এসোসিয়েশন সম্প্রতি একটি নীতিমালা তৈরি করেছে। ভারতের সুপ্রীমকোর্ট তার এক পর্যবেক্ষণে বলেছে, দেশের স্বাধীনতা, সংহতি ও নিরাপত্তার স্বার্থে সংবিধানের ১৯ (২) ধারা অনুযায়ী সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও কিছু বিষয় সংরক্ষিত থাকা প্রয়োজন। গণমাধ্যমে প্রচারণার ইতিবাচক দিক পাশ কাটানো যাবেনা। গণমাধ্যমের কারণেই নিরাপত্তার বিষয়টি এবং এ ধরনের ঘটনায় উদ্ধারকাজে সরকারের অপর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনার বিষয়টি মানুষের নজরে আসে, সরকারও সচেতন হয়। মুম্বাই আক্রমণের পর রাজ্যসভা কমিটি তার মূল্যায়নে লিখেছে, সরাসরি দেখানোয় এমনটা মনে হয়, স্যাটেলাইট মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের গাইড করা হচ্ছে গণমাধ্যমে। গণমাধ্যমগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ব্রডকাস্টিং রেগুলেটরী কমিটি গঠন করার সুপারিশ করে তারা। এ ঘটনার

পর গণমাধ্যমের দায়িত্ব বা সীমাবদ্ধতার বিষয়টি সাংবাদিকদের উপলব্ধি করতে হবে। যেসব নীতিমালা মেনে চলার সুপারিশ করেছে সেগুলো হলো:

জিম্মি ইস্যুর ক্ষেত্রে সরাসরি সম্প্রচার না করা;

সন্ত্রাসীদের উপকারে আসে এমন তথ্য সম্প্রচার না করা;

জিম্মি সংকটে বিস্তারিত তথ্য না দেয়া এবং উদ্ধারের সময় স্পর্শকাতর বিষয় অবহিত না করা;

২৬ নভেম্বরের ঘটনার মতো ক্ষেত্রে জিম্মি বা উদ্ধারকাজে কোন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যকে সরাসরি না দেখানো। অযথা ধারণকৃত অংশ পুন:সম্প্রচার করে দর্শকদের মধ্যে অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি না করা; *(জি এন রায়, ২০০৯)*।

Livingstone (1982:63) argues that a heavy emphasis on the violent acts committed by terrorists may stimulate other terrorists to repeat the same crimes. In his view, there is evidence to suggest that detailed coverage of a terrorist act is apt to lead to a rash of similar acts. In fact, the contagion effect may spread beyond reducing the inhibitions of the terrorists towards violence to the unlearning of inhibition against the use of violence by many other people in the society, acquisition of know-how relating to the rational uses and applications of violence and provide great motivation for youths to act violently *(weimann &winn 1994)*।

অস্ট্রেলীয় লেখক ড.শাহরাম আকবরজাদেহ এবং ড.বিয়ানকা স্মিথ ২০০৫ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত 'The Representation of Islam & Muslims in the Media' গ্রন্থে দ্য এইজ এবং দ্য হেরাল্ড সান পত্রিকা দুটির সেপ্টেম্বর ২০০১ থেকে ২০০৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত সংবাদের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করেছেন।

'মুসলমান ও ইসলামের নেতিবাচক প্রতিচ্ছবি তৈরির জন্য গণমাধ্যমকে অভিযুক্ত করা খুব সহজ *(গ্যালাসিনসকি, ২০০১;৭)*। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন, পুলিশের কাছে তথ্য না থাকলেও তারা এটা তৈরি করতে পারে।' গণমাধ্যম সমাজে একটি শক্তিশালী ও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যা মানুষকে প্রভাবিত করে। এটা খুবই স্পষ্ট যে, একজন ব্যক্তির শিক্ষা, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, সমাজ ও সাংস্কৃতিক আবহ তাকে প্রভাবিত করে। জ্ঞানের সাংস্কৃতিক উৎপাদন ও একটি সংবাদপত্র যা সে পড়ে এর সাথে মতের ভিন্নতা থাকতে পারে, আবার এটাও হতে পারে মুসলিম ও ইসলাম শব্দ দুটি ফ্লুইড দিয়ে মুছে তা পরিবর্তন করে দেয় গণমাধ্যম।

নেতিবাচক রিপোর্ট আর নেতিবাচক ঘটনা কি এক? একটি ঘটনার একটি বিষয়ের ব্যাখ্যা কিন্তু একাধিক হতে পারে এবং ঘটনার ব্যাখ্যা যিনি দেন, তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যে কোন স্থানে একটি বোমা হামলা হলো, এটি নেতিবাচক বিষয়। কারণ এর সাথে হত্যা বা মৃত্যু এবং সামাজিক অনৈক্য জড়িত। সাংবাদিকরা এ ঘটনার নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা দিতে পারেন, ঘটনার প্রভাব পাঠকের কাছে এমনিতেই নেতিবাচক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। আবার বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করে এ ঘটনাটিকে আরো নেতিবাচক করে রিপোর্টিং তৈরি করা যায়।

যখন কোন ঘটনায় ইসলাম বা মুসলিম জড়িত থাকে, তখন সেখানে ভাষাগত শ্রেণীবদ্ধকরণ দেখা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, ইসলাম, সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গীবাদ একসুরে গাঁথা মালার মতো ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে ইসলামের সাথেই নয়, গোত্র বা গোষ্ঠী, নারী বিশেষ করে মুসলিম নারীর ক্ষেত্রেও এ ধরণের বিশেষণ দেখা যায়। এছাড়া আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক কোন ঘটনায় জড়িত পাওয়া গেলে সেখানেও এসব প্রবণতা দেখা যায় *(আকবরজাদেহ ও স্মিথ; ২০০৫)*।

<u>ব্রিটিশ গণমাধ্যমে মুসলমানদের উপস্থাপন</u>ঃ সাম্প্রতিক সময়ে ইসলাম ও মুসলিমদের ব্রিটিশ গণমাধ্যমে উপস্থাপনের বিষয়টি আলোচনা ও বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। পশ্চিমা প্রধান গণমাধ্যমগুলো মুসলমানদের নেতিবাচকভাবে তুলে ধরছে। প্রাচ্যর দৃষ্টিকোণ থেকে (এডওয়ার্ড সাঈদ ১৯৮১ ও ১৯৯৬) ড্যানিয়েল (১৯৬০),এবং সরদার (১৯৯৯) গণমাধ্যম ও ইসলাম নিয়ে আহমেদ (১৯৯৪), রানিমেইড ট্রাস্ট (১৯৯৭ ও ২০০১), এবং বাংলাওয়ালা (২০০২), আব্বাস (২০০০), পুল (২০০১) উল্লেখযোগ্য। ইসলামের ভুলব্যাখ্যা, অসত্য তথ্য, অপব্যাখ্যা, বিকৃত তথ্য উপস্থাপন করে থাকে। মুসলিম ও ইসলাম বিষয়ে রিফ্লেকটিভ এ্যাপ্রোচ, ইনটেনশনাল এ্যাপ্রোচ, এবং কনস্ট্রাকশনাল এ্যাপ্রোচ থাকে *(হোয়াইটেকার; ২০০২)*। তার বিশ্লেষণে ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে বলেছেন, চার ধরনের শ্রেণীতে মুসলিমদের বিভিন্নভাবে চিহ্নিত করা হয়। প্রথমত মুসলিমরা অসহিষ্ণু, সহিংস বা নিষ্ঠুর, আগন্তুক এবং মিসোজাইনেস্টিক *(হোয়াইটেকার; ২০০২;৫৫)*।

ইসলামভীতি বা ইসলামোফোবিয়ার নামে গণমাধ্যমগুলো ইসলামকে ইতিহাসে ভীতিকর হিসেবে স্থান করে দিচ্ছে, কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে উপনিবেশবাদ, অভিবাসন, এ বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা হবে" (আব্বাস, ২০০০; ৬১)।

গণমাধ্যম বিপদজনক ধর্ম হিসেবে ইসলামকে সন্ত্রাস ও পৈশাচিক বলে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। যেখানে বিশ্ব নতুন নতুন ধারণার উদ্ভব ঘটাচ্ছে, তখন ইসলাম নিয়ে ১০, ২০ এমনকি ৩০ বছরের পুরনো শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে *(কনলি, ২০০১)*।

	মুসলিম শব্দের ব্যবহার		
সংবাদপত্র	২০০০-০১	২০০১-০২	% বৃদ্ধি
গার্ডিয়ান	৮১৭	২০৪৩	২৫০%
ইন্ডিপেন্ডেন্ট	৬৮১	১৫৫৬	২২৮%
টাইমস	৫৩৫	১৪৮৬	২৭৮%
টেলিগ্রাফ	৪১৭	১১৭৬	২৮২%
মেইল	২০২	৬৫০	৩২২%
মিরর	১৬৪	৯২০	৫৬১%
এক্সপ্রেস	১৩৯	৩০৫	২১৯%
গান	৮০	৫২৬	৬৫৮%
স্টার	৪০	১৪৪	৩৬১%

(সেপ্টেম্বর ২০০০-২০০১ এবং জুন ১৯, ২০০১ থেকে ১৯ জুন, ২০০২)
(*আকবরজাদেহ, শাহরাম ও স্মিথ, বিয়ানকা: ২০০৫)*

'আমেরিকান প্রিন্ট মিডিয়া এন্ড মুসলিম ওয়ার্ল্ড' নিউজ উইক এন্ড টাইম ম্যাগাজিন শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালিত হয়। এতে আমেরিকার দুটি স্বনামধন্য ম্যাগাজিন 'নিউজউইক ও টাইমে' ১৯৯১ থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত ২১৯ টি নির্বাচিত প্রবন্ধের উপর গবেষণাটি পরিচালিত হয়। ড.শাহজাদ আলী ১২ টি মুসলিম দেশের সাথে আমেরিকার সম্পর্ক ও ম্যাগাজিনে লেখার ভাষাও গবেষণার বিষয়বস্তুতে তুলে ধরেছেন। আমেরিকার বৈদেশিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে এ সম্পর্ক কেমন হবে সে প্রসঙ্গটি তিনি গবেষণায় এনেছেন। প্রধান সংবাদপত্রগুলো ইসলামকে মৌলবাদের মতোই মনে করে বলে অভিমত তার। মুসলিম, ইসলামিস্ট এক্সট্রিমিস্ট, মিলিট্যান্সি, টেরোরিজম, ফান্ডামেন্টালিস্ট শব্দগুলো বিভিন্ন প্রবন্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বা অপ্রয়োজনীয় হলেও জুড়ে দেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। আমেরিকার অভিজাত গণমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, টাইম, সিএনএন, সিবিএস, এনবিসি, ইসলামিক বিশ্বের ভাবমূর্তি বিকৃত করে বলে গবেষণায় দেখিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে ,

ইসলামিক মিলিট্যান্ট ফ্রম পাকিস্তান, পাকিস্তান বেকড মুসলিম রেবেল, ইসলামিক টেরোরিজম ট্রেনিং ক্যাম্প, লিবিয়া সাপোর্ট টেরোরিস্ট, ইরানিয়ান অথবা প্যালেস্টিনিয়ান টেরোরিস্ট গ্রুপ' নামে সংবাদের শিরোনাম বা সূচনায় লেখা হয়েছে। এ দুটো জনপ্রিয় ম্যাগাজিন নিউজউইক এবং টাইমে বস্তুনিষ্ঠ, নিরপেক্ষভাবে ইসলামিক বিশ্বের সংবাদ পরিবেশন না করায় এর সমালোচনা করেছেন তিনি। জন এপোসিতো যুক্তি দেখিয়েছেন,'পশ্চিমাদের প্রতি ইসলামিক বিশ্বের হুমকি একটি পৌরাণিক গল্প বা মিথ, যাতে গণতন্ত্র, সমাজ ও রাজনৈতিক বহুমাত্রিকতা থেকে তারা দূরে থাকে' *(এপসিতো জন, ১৯৯২,দ্য ইসলামিক থ্রেট মিথ অর রিয়েলিটি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস)*।

তার এ বক্তব্যকে সমর্থন করে আরো একধাপ এগিয়ে জন উইলিয়াম আরো শক্তিশালী মন্তব্য করেছেন। "তিনি বলেছেন, মৌলবাদীরা আমাদের শত্রু নয়, তারা আমাদের বন্ধু" *(উইলিয়াম জন, ১৯৯০; ২৪০)*।

এডওয়ার্ড সাঈদ তার লেখা 'পশ্চিমের চোখে ইসলাম' প্রবন্ধে ইসলামের নেতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরির জন্য পশ্চিমা গণমাধ্যমের ভূমিকার সমালোচনা করেন' *(সাঈদ ডব্লিউ এডওয়ার্ড কাভারিং ইসলাম, হাউ দ্য মিডিয়া এন্ড দ্য এক্সপার্টস ডিটারমাইন, হাউ উই সি দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, কিনটেজ বারসি, ১৯৯৭)*।

দ্য রাদারফোর্ড ইনস্টিটিউট আয়োজিত "Terrorism & The Media; A Symbiotic Relation" শীর্ষক প্রবন্ধে জন ডব্লিউ হোয়াইটহেড' লিখেছেন, কল্পনা করুন, 'আপনি একজন সন্ত্রাসী, অল্প খরচ করে, অল্প কিছু বোমা ফাটিয়ে আপনার বার্তা সারা বিশ্বকে পৌঁছে দিতে চান, আপনি কিভাবে এটা করবেন? এর সোজা উত্তর, আপনার সন্ত্রাসী ঘটনা প্রচারের জন্য গণমাধ্যমের সাহায্য প্রয়োজন। সাম্প্রতিক সময়ে বোস্টন ম্যারাথন শোতে দেখা যায়, সন্ত্রাসীরা পরিচিতি পাওয়ার জন্য যে ঘটনাকে বেছে নিয়েছে, তাতে তারা সারা বিশ্বের মনোযোগ পেয়েছে। বর্তমান সময়ে সন্ত্রাসীরা জানে, তাদের বিকশিত করার জন্য গণমাধ্যম প্রয়োজন। সিএনএন, ফক্সসহ অন্য সব অনলাইন মাধ্যমেও ২৪ ঘন্টা সম্প্রচার সময় পূরণের একটা তাগিদ থাকে, সেজন্য হত্যা বা সন্ত্রাসমূলক ঘটনার বিকল্প আর কি হতে পারে'।

সন্ত্রাসবাদ ও গণমাধ্যমের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় একটি আন্ত:সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষ করে টেলিভিশনের সাথে। বোস্টন ম্যারাথনে বোমা হামলার সংবাদটি প্রতিটি কোণ থেকে গণমাধ্যমগুলো দ্রুত সম্প্রচার করেছে। যার সংবাদমূল্য থাকুক বা না থাকুক। প্রতি মিনিটে মিনিটে তারা সর্বশেষ খবর দিতো। এ ঘটনার পর সিএনএন এর ওয়েব পেইজে ঘটনার বর্ণনার প্রতিটি ছবি, ভিডিও, মানচিত্র, প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাতকার, বিস্ফোরণ সব কিছুর সবিস্তার বর্ণনা রয়েছে। দেখে মনে হতে পারে যেন, একটি ভিডিও গেমস তৈরি হয়েছে। যেখানে ঘটনাটিকে বস্তুনিষ্ঠ ও সঠিকভাবে প্রচার করার কথা সাংবাদিকদেও, তখন সরাসরির বাড়াবাড়িতে এটা বিনোদনমূলক সংবাদে পরিণত হয়েছে। সন্ত্রাসবাদ বিশেষজ্ঞ ওয়াল্টার লিকোর তার 'দ্য নিউ টেরোরিজম '(১৯৯৯) গ্রন্থে বলেছেন,'এটা বলা যায়, সাংবাদিকরা হচ্ছে সন্ত্রাসীদের সবচেয়ে ভালো বন্ধু'। কারণ তারা সন্ত্রাসীদের কর্মকান্ডের সর্বোচ্চ প্রচার করে থাকে। এটা বলা হচ্ছেনা যে, সাংবাদিকদের একটি দল সন্ত্রাসীদের প্রতি সহানুভূতিশীল, কিন্তু আদতে তা মনে হচ্ছে। এখানে দেখা যাচ্ছে, সহিংসতা হচ্ছে সংবাদ, শান্তি ও সম্প্রীতি সংবাদ নয়। সন্ত্রাসীদের গণমাধ্যম প্রয়োজন আর সন্ত্রাসবাদের ঘটনার মধ্যে উত্তেজক উপাদান খুঁজে বেড়ায় গণমাধ্যম। প্রচারণা ও তাদের বার্তাগুলো পৌঁছে দেয়ার কৌশল হিসেবে তারা গণমাধ্যম ব্যবহার করে। মনে হতে পারে, প্রচারণার জন্য তাদের হাতে একটি মেগাফোন ধরিয়ে দেয়া হয়'। এটা তাদের সন্ত্রাসমূলক কাজ করতে উৎসাহ তৈরি করে ও সন্ত্রাসীদের দলে নিয়োগ করার হাতিয়ার, হতে পারে সেটা দেশে বা বিদেশে। অন্যভাবে, সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের উপর আলোকপাত করে সন্ত্রাসের অনেক কাজের একটি গণমাধ্যম করে দেয়।

লেকরের মতে, সন্ত্রাসীরা গণমাধ্যমের এ জাতীয় নিপুণ প্রচারণাকে যথেষ্ট গুরুত্ব ও সম্মান দেয়। এটাকে বিপণনের কলা বলা হয়েছে। লেকর একজন সন্ত্রাসী নেতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, 'if we put even a small bomb in a house in town we could be certain of making a headlines in the press, but if the rural guerilleros liquidated thirty soldiers in small village, there was just a small news item on the last page'.

প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে দ্রুত সংবাদ এবং বিনোদন পাওয়ার অবাধ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কি ঘরে, কি বাইরে। বাসে বা অফিসে কম্পিউটারে সামনে। মানুষ যতোই দেখে, গণমাধ্যম তাদের সেটা আরো বেশি করে দেখানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এর সমাধান কি- সন্ত্রাসী ঘটনার সংবাদকে অন্য ঘটনার মতো করেই কাভার করা। এটাকে সবিস্তারে বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। ওয়েবসাইটে ভিডিও গেমসের মতো করে তৈরি করে রাখার প্রয়োজন নেই এবং কোনভাবেই সন্ত্রাসী ঘটনাকে বিনোদনের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার তো প্রশ্নই আসেনা। এর সমাধান হিসেবে তিনি বলেছেন, দর্শকরা ঘর থেকেই শুরু করতে পারে। টিভি বন্ধ করে রাখার মাধ্যমে রাজনৈতিক খবরাদি জানার জন্য পয়সা খরচ বন্ধ করা যায়। শুধু কে সন্ত্রাসী হামলার নেপথ্যে সে খবর নিলেই হবে না এ থেকে কারা লাভবান হলো কে সেটাও তো দেখতে হবে *(হোয়াইটহেড, ২০১৩)*।

"Covering Terrorism Live" প্রবন্ধে বিবিসির সাবেক সাংবাদিক ও ইসলামাবাদে ডন পত্রিকার আবাসিক সম্পাদক জাফর আব্বাস সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সংবাদ কিভাবে কাভার করবে সে বিষয়ে বেশ কিছু নীতিমালা ও করণীয় সম্পর্কে বলেছেন। বিবিসি, সিএনএনসহ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো বিশেষ করে টেলিভিশনের জন্য সন্ত্রাসী ঘটনা কাভার করার ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালার কথা বলেছেন। সেগুলো হলো:

সরাসরি সম্প্রচারের ক্ষেত্রে সচেতন থাকতে হবে যে, সন্ত্রাসীরা তা শুনছে। প্রেক্ষাপট বুঝে রিপোর্ট করা, যদি জিম্মি অবস্থার রিপোর্ট করা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে হুমকির কারণ চিহ্নিত করা যেমন, জঙ্গীরা কি অর্থ চায়, না কারাগারে আটক তাদের কোন সদস্যের মুক্তি।

এ ধরনের অপরাধ নৈতিক বিবেচনায় এনে সতর্কভাবে করা;

একজন সন্ত্রাসীকে সরাসরি সম্প্রচারে না আনা;

যদি সম্ভব হয়, স্পর্শকাতর হলে পরিবেশনে সময় নেয়া, বিমান হাইজ্যাক কিন্তু এককভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা কারণ এর কোন কিছুই প্রাথমিকভাবে অনুমান করা যায়না;

ঝুঁকির বিষয়টি কর্তৃপক্ষের মুখে শোনানো;

সন্ত্রাস বিষয়ে রিপোর্টিং:

সঠিক বস্তুনিষ্ঠ এবং পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে এ ধরনের ঘটনার সংবাদ পরিবেশন করতে হয়। কিন্তু এখানে অতিরিক্ত কোন কিছু করা যাবেনা;

আবেগ তৈরি করে বা বিচারে প্রভাব ফেলে এমন বিষয়ে শব্দ প্রয়োগে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত;

শুধুমাত্র দায়সারা গোছের সন্ত্রাসী না বলে সেটা সুস্পষ্ট করা যেমন, বোম্বার, এ্যাটাকার, গানমেন, বিদ্রোহী, মিলিট্যান্ট হলে ভালো হয়;

কোর্ট মার্শাল, মৃত্যুদন্ডের সংবাদে বিচার প্রক্রিয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলে ধরা;

জনগণের মুখ থেকে বিশেষ করে তাদের কথা শোনা, যাতে পাঠক বা দর্শকরা সেটা বুঝতে পারে;

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা পদ্ধতিঃ

গবেষণায় প্রাসঙ্গিক বই, নিবন্ধ, সংবাদপত্রে প্রকাশিত কলাম, উপ-সম্পাদকীয়, ইন্টারনেটে এ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত, প্রবন্ধ, সংবাদ ও বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাতকার স্থান পেয়েছে। পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান জঙ্গী সংগঠন, বাংলাদেশের জঙ্গী সংগঠনগুলোর অবস্থা, গণমাধ্যম সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, না সন্ত্রাসীরা গণমাধ্যমকে ব্যবহার করছে, এর প্রাসঙ্গিক অনেক বিষয় গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে। আবার এ গবেষণায় ইসলামের প্রকারভেদ, মুসলমানদের প্রতি পাশ্চাত্য গণমাধ্যমের দৃষ্টিভঙ্গী, ইসলাম বা মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের সাথে জঙ্গীবাদের সম্পর্ক, বাংলাদেশের উত্তরের জেলাগুলোতে জঙ্গীবাদ বিকাশের কারণসহ নানা বিষয় গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ প্রসারে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রাসঙ্গিক সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আইন ও এর সমালোচনা বা সীমাবদ্ধতা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এ সংক্রান্ত প্রকাশিত সংবাদ বা প্রবন্ধের মূল্যায়ন এবং সর্বোপরি পর্যবেক্ষণসহ কিছু সুপারিশমালা যুক্ত হয়েছে। মূলত: একাডেমিক ও দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞদের প্রবন্ধ ও গবেষণার আলোকে এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। বাংলাদেশী কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্বের মতামত তুলে ধরা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে গবেষণাটি ভবিষ্যতে আরো উন্নততর গবেষণার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

গবেষণার প্রশ্নমালা: প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়েছে। পরিশিষ্টে সংযুক্ত হয়েছে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা:

যেহেতু বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ নিয়ে নিবিড়ভাবে কোন প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা হয়নি, তাই গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্য ঘাটতির কারণে প্রথমদিকে কিছুটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সন্ত্রাসবাদের সার্বজনীন সংজ্ঞা যেখানে বিশ্বব্যাপী নিরুপিত হয়নি, সেখানে জঙ্গীবাদের পরিপূর্ণ সংজ্ঞা তৈরি করা দুরুহ। সন্ত্রাসবাদের পরিধির ভিতর আরেকটি সংস্করণ বা প্রাসঙ্গিক বিষয় জঙ্গীবাদ। সন্ত্রাসবাদ রাজনীতি, রাজনীতি বহির্ভূত যেকোন উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হতে পারে, এর পেছনে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অথবা ব্যক্তিগত লাভের একটা বিষয় থাকে। সে হিসেবে সন্ত্রাসবাদের কাছাকাছি বিষয় হচ্ছে জঙ্গীবাদ। এ দুই চরমপন্থার মধ্যে আদর্শ ও উদ্দেশ্যগত পার্থক্য থাকলেও দুটোই একটি স্থিতিশীল রাষ্ট্রের জন্য হুমকি। গবেষণার ক্ষেত্রে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ কি, উৎপত্তিগত দিক, ঐতিহাসিক বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর ভূমিকা, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের মধ্যে পার্থক্য, ইসলামের ইতিহাসে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদসহ জঙ্গীবাদের প্রাসঙ্গিক সব বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে এ সংক্রান্ত বাংলাদেশী গবেষকদের অ্যাকাডেমিক বইয়ের সংখ্যা খুবই কম। এ নিয়ে অনেক বিশেষজ্ঞ খোলাখুলি কথা বলতেও রাজি হননি। আবার অনেকেই বিষয়টি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাই গবেষণায় বেশ কিছু বিদেশী বইয়ের সাহায্য নেয়া হয়েছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ, উপ-সম্পাদকীয় ও প্রবন্ধ, রেডিওতে প্রচারিত বিশেষজ্ঞ সাক্ষাতকার, ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন রচনা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধের সাহায্য নেয়া হয়েছে। এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে জঙ্গীবাদ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা তৈরি ও এটি নির্মূলে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে এ গবেষণা কর্ম ভবিষ্যতে অধিকতর গবেষণার ক্ষেত্রে অবশ্যই সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণার বিষয় বিশ্লেষণ ও ধারণাগত কাঠামো

জঙ্গীবাদ: আকাদমিক দৃষ্টিভঙ্গী:

ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে 'জঙ্গ' থেকেই জঙ্গী শব্দের উদ্ভব। শব্দটি মূলত: ফার্সি ভাষার; যার অর্থ যুদ্ধ বা লড়াই। সে হিসেবে জঙ্গী শব্দের অর্থ যোদ্ধা বা লড়াকু। জঙ্গী, জঙ্গীবাদ, জঙ্গীবাদী শব্দগুলো ইংরেজি militant, militancy শব্দগুলোর অনুবাদ। সাম্প্রতিক সময়ে এগুলো বাংলাদেশে বহুল ব্যবহৃত ও অতিপরিচিত শব্দ। এক যুগ আগেও এ শব্দটি খুব বেশি ব্যবহৃত হতো না বাংলাদেশে। আভিধানিক ও ব্যবহারিকভাবে এগুলো নিন্দনীয় ও খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হতো না। শাব্দিক বা রুপক অর্থে যোদ্ধা, সৈনিক বা যুদ্ধে ব্যবহৃত বস্তু বোঝাতে এ শব্দগুলো ব্যবহৃত হতো। বৃটিশ ইন্ডিয়ার কমান্ডার ইন চিফকে 'জঙ্গীলাট'বলা হতো।

শক্তিমত্তা বা উগ্রতা বোঝাতে এ শব্দটি এখন ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। Oxford Advanced Learners's Dictionary তে বলা হয়েছে, (militan.adj. favouring the use of force or strong pressure to achieve one's aim…militant .n. militant person,esp.in politics .

Merriam Wepster's Collegiate Dictionary-তে বলা হয়েছে, militant 1: engaged in Warfare or combat: fighting 2: aggresively active (as in a cause).

তবে, এসব অর্থের কোনটিই বেআইনী কোন অপরাধ বোঝায় না। কিন্তু বর্তমানে জঙ্গী বলতে রাজনৈতিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে বেআইনীভাবে নিরপরাধ বা অযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, হত্যা ইত্যাদি অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিকে বোঝায়। আর এদের মতবাদকেই জঙ্গীবাদ বলা হচ্ছে। এ অর্থে সুপরিচিত ভাষা সন্ত্রাস।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় Militancy বলতে বোঝানো হয়েছে:

1. Fighting or warring.
2. Having a combative character; aggressive, especially in the service of a cause: a militant political activist.

A fighting, warring, or aggressive person or part
Middle English, from Old French
Militancy:

1. The state or condition of being combative or disposed to fight.
2. The active championing of a cause or belief.

জঙ্গীবাদের বৃহত্তর সংজ্ঞা:

প্রায়ই মৌলবাদ, ধর্মীয় মৌলবাদ, জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থী ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দ বাংলাদেশের মানুষের দৈনন্দিন কথাবার্তায় একার্থে বা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। ফলে এদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের পার্থক্য বা সীমারেখাটি অস্পষ্ট হয়ে যায় এবং বহুবিধ ব্যাখ্যার অস্পষ্টতায় আক্রান্ত হয়। সেজন্য 'জঙ্গীবাদ' শব্দটির অর্থ প্রথমে পরিষ্কার করে নেয়া প্রয়োজন।

আক্ষরিক অর্থে 'জঙ্গীবাদ' শব্দটি 'জঙ্গ' বা যুদ্ধ থেকে উদ্ভূত। সেদিক থেকে দেখলে যে কোনো 'যুদ্ধবাজ' মানবগোষ্ঠীকে 'জঙ্গী' এবং তাদের মতবাদকে 'জঙ্গীবাদ' বলা যেতে পারে। কিন্তু এমন দল বা মানবগোষ্ঠী পাওয়া মুশকিল, যারা কোনো না কোনোভাবে তাদের শ্রেণীশত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত নয়। যদিও সে যুদ্ধ সর্বদা সশস্ত্র রূপ ধারণ করে না, কখনও কখনও নিরস্ত্র এবং শান্তিপূর্ণও হয়ে থাকে। তাই বলে সমগ্র মানবজাতিকে 'জঙ্গীবাদী' বলা অমূলক।

Dhaka University Institutional Repository

জঙ্গীবাদের ইংরেজি শব্দগত উৎপত্তি:

পনেরো শতাব্দিতে ল্যাটিন 'militare' শব্দের উৎপত্তি ঘটে যার অর্থ সৈনিকের সেবা। মিলিশিয়া শব্দের আধুনিক সমার্থক শব্দ হচ্ছে সমর যোদ্ধা। অ্যাংলো-সাক্সনদের সময়ে গড়ে ওঠা'fyrd'দের বিরুদ্ধে লড়াই করা একটি রক্ষণাত্মক সংগঠন। সংকটকালে,মিলিশিয়ারা তাদের নাগরিক দায়িত্ব বাদ দিয়ে সৈনিক বেশে জরুরি অবস্থা শেষ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যায়। যুদ্ধ শেষ হলে সে তার পুরনো কাজে ফিরে যায়।

ব্রিটিশ গণমাধ্যম এবং মাওবাদী সংগঠনগুলো একে দেখে জঙ্গীবাদী প্রবণতা হিসেবে। সাধারণত সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে কোন ব্যক্তি বা দলের শারীরিক বা বাচনিক লড়াই বা আক্রমণাত্মক কার্যকলাপকে জঙ্গীবাদ বোঝায়। সরকারী সামরিক বাহিনীর সদস্য নয়, এমন লোকদের বোঝাতে গণমাধ্যমকর্মীরা একটি নিরপেক্ষ শব্দ হিসেবে জঙ্গীবাদ শব্দটি প্রায়ই ব্যবহার করে থাকে। অন্যদিকে, একজন জঙ্গী নির্যাতন ও হয়রানির অভিযোগ এনে সহিংসতায় জড়িত হয়, কিন্তু এ শব্দটি অনেক সময় কারো কারো শক্ত মতামত বা দর্শন বোঝাতেও ব্যবহার হয়। যেমন খ্রীস্টান জঙ্গী, নাস্তিক জঙ্গী ইত্যাদি *(militant.askdefine.com)*। অনেক সময় জনপ্রিয় এ শব্দটির ব্যবহার সন্ত্রাসীদের সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। জঙ্গী রাষ্ট্র কথার অর্থ সাধারণভাবে বলা যায়, একটি আদর্শ বা মতামতকে ধারণ করে রাষ্ট্রের আক্রমণাত্মক বা দৃঢ় সমর্থন। ফ্রান্স,স্প্যানিশ এবং ফিলিপাইনে ইংরেজি শব্দ 'মিলিট্যান্ট'কে আধুনিক 'অ্যাক্টিভিস্ট' শব্দ দিয়েও বোঝানো হয়ে থাকে। অন্য শব্দে শারীরিক সহিংসতা অগ্রাহ্য করা বা সহিংসতা এড়িয়ে চলা ব্যক্তি জঙ্গীবাদী।

জঙ্গীবাদের বৈশিষ্ট্য:

একক কোন ব্যক্তি বা দল ,সাধারণত বিশেষ কোন কারণে সংগঠিত ও প্রশিক্ষিত। এ শব্দটি দিয়ে আক্রমণাত্মক ও শক্তিশালী ক্ষমতাকে বোঝায়। অনেক জঙ্গী বিদ্যমান অসহিষ্ণুতা ধারণ করার মানসিকতা পোষণ করে। জঙ্গীদের কাজ এবং সমর্থন সাধারণত আন্তর্জাতিক আইন, মানবতা ও নাগরিক অবাধ্যতার মধ্যে সীমিত থাকে। জঙ্গীবাদ শব্দটিকে ব্যাখ্যা করলে অর্থ দাঁড়ায়, আন্দোলনের নামে যারা একটি রাজনৈতিক দর্শন প্রতিষ্ঠার জন্য আক্রমণাত্মক ও সহিংস আচরণ করে (কখনো তারা এর সমাধানের জন্য অতি উগ্র আচরণ করে)। অনেক আন্দোলন সফল করার ক্ষেত্রে জঙ্গীবাদ প্রয়োগ করা হয়েছে, অথবা যারা সংকট সমাধানে এ পন্থাকে যৌক্তিক রুপ দিতে চায়, তারা কখনো কখনো তাদের কৌশলগুলো প্রয়োগ করেছে। অনেক জঙ্গী নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে অংশ নিয়েছে। ১. শক্তি ও সহিংসতার সরাসরি ব্যবহার; হয় আক্রমণ না হয় রক্ষা ও ২. তাদের নিয়োজিত নিজস্ব গোষ্ঠীর কাছে আদর্শগত বাণী প্রচার ও একে সমর্থন করা;

জঙ্গীদের বা জঙ্গীবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যুদ্ধকেই তারা একটি 'আদর্শ' বলে গ্রহণ করে বা 'পরম' গণ্য করে। আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে নিপীড়িতের যে যুদ্ধ সেটির সঙ্গে জঙ্গীবাদের প্রস্তাবিত যুদ্ধের মৌলিক তফাৎ রয়েছে। জঙ্গীবাদীরা আক্রমণাত্মক আদর্শের অনুসারী। নিজেদের মতাদর্শকে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচনা করেই (প্রায়ই তারা মতাদর্শের ধর্মীয়করণ ঘটিয়ে থাকে এবং একে ঈশ্বরপ্রদত্ত বিধান বা মতাদর্শের রূপদান করেই) ক্ষান্ত হয় না, সমাজে সে আদর্শের প্রভুত্ব বা আধিপত্য কায়েমের জন্য এর শত্রুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র নিষ্ঠুর ক্ষমাহীন সংগ্রামের ঘোষণা দেয়। এ অর্থে জঙ্গীবাদীরা উদার মানবতাবাদ ও গণতন্ত্র শুধু নয়, মধ্যপন্থারও বিরোধী। আর সেটা নীতিগতভাবেই। তারা নিজস্ব মতবাদের প্রয়োগের ক্ষেত্রে মূলত ফ্যাসিবাদের অনুসারী।

হিটলারের মতো সকল জঙ্গীবাদীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আক্রমণ করে, বলপ্রয়োগ করে ও যুদ্ধ করে নিজেদের মতবাদ ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা। এর সবচেয়ে ভয়ানক ও যুক্তিহীন রূপ হচ্ছে ধর্মীয় জঙ্গীবাদ। হিটলার যেমন জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, ধর্মীয় জঙ্গীবাদীরা তেমনি কোনো একটি বিশেষ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী। হিটলার জার্মানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বাকি সকল জাতির বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।
ধর্মীয় জঙ্গীবাদীরাও সকল বিধর্মীর বিরুদ্ধে জিহাদ, ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের আহ্বান জানায়। তাই সমাজে মুসলিম জঙ্গীবাদী, ক্রিশ্চিয়ান জঙ্গীবাদী, হিন্দু জঙ্গীবাদী ও ইহুদি জঙ্গীবাদী- এ চার ধরনের ব্যক্তির দেখা মেলে (*আকাশ এম এম, ২০১৩; http://opinion.bdnews24.com/bangle/13/05/10)*।

গণমাধ্যমে বহুল ব্যবহৃত হওয়া শব্দ:

সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্রে প্রায়ই গণমাধ্যম মিলিট্যান্ট বা জঙ্গীবাদ শব্দটি ব্যবহার করে। সাংবাদিকরা সন্ত্রাসবাদের কৌশল বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক সময় একে জঙ্গীবাদী আন্দোলনের সাথে মিলিয়ে ফেলেন। গণমাধ্যম প্রায়ই সন্ত্রাসী সংগঠন, জঙ্গী গোষ্ঠী বা মৌলবাদী জঙ্গী শব্দগুলো বারবার ব্যবহার করে। অনেক সময় সন্ত্রাসী ঘটনা হলেও ব্যবহৃত হয় জঙ্গীবাদ শব্দটি। সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন এবং অন্যান্য তথ্য সূত্রে জঙ্গী শব্দটিকে নিরপেক্ষ পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করে (militant.askdefine.com)।

জঙ্গীবাদের অর্থের উৎস:

নানাভাবে রাজনৈতিক ইসলাম অর্থসংগ্রহ করে থাকে। তাদের অর্থের প্রধান উৎসগুলো নিম্নরূপ:

ক) আয়বর্ধক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মুনাফা;
খ) পেট্রোডলার, প্রবাসী-প্রেরিত অর্থ এবং মিত্ররাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা প্রদত্ত অর্থ;
গ) দলীয় সদস্যদের চাঁদা ও লেভী;
ঘ) ধর্মবিশ্বাসী মুসলমানদের দান, খয়রাত ও যাকাত;
ঙ) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিও-র ফান্ড; এবং
চ) রাষ্ট্রের যেসব বরাদ্দ আছে তাকে সুকৌশলে ইসলামি সংগঠনের দিকে পরিচালিত করা ইত্যাদি;
এ সমস্ত উৎস থেকে অর্থ সরবরাহের পূর্বশর্ত হচ্ছে, এসব জায়গায় বিশ্বাসী অনুগামীদের উপস্থিতি । গোপনে কাজটি সবচেয়ে সাফল্যের সঙ্গে করতে সক্ষম হয়েছে জামায়াতে ইসলামী। ড. আবুল বারাকাতের হিসেব অনুসারে এ দলটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তমান নিট বার্ষিক মুনাফার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে কমপক্ষে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ১ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা। বর্তমান জাতীয় উন্নয়ন বাজেটের প্রায় চার শতাংশ। ড. আবুল বারাকাতের অনুমান হচ্ছে, এর তেত্রিশ শতাংশ তারা রাজনৈতিক ভাবাদর্শ নির্মাণে ব্যবহার করে। অর্থাৎ প্রতিবছর এর নানাবিধ তৎপরতা পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যয় হচ্ছে ৫৭৭ কোটি টাকা (*আকাশ এম এম, ২০১৩: http://opinion.bdnews24.com/bangla/13/05/10)*।

সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা:

সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা নিয়ে স্পষ্ট বিতর্ক রয়েছে। নিজ দেশের আইনের অধীনে বিভিন্ন আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাও বিভিন্নভাবে সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা নিরুপিত করেছে। যদিও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সার্বজনীন গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা তৈরির ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহের ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে। এ সমস্যা দেখা দেয়, যখন শব্দটির রাজনৈতিক ও আবেগীভাবে এর প্রয়োগ ঘটে। এ প্রেক্ষাপটে অ্যাংগাস মার্টিন,অস্ট্রেলিয়ান পার্লামেন্টে বলেছেন, সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা নিরুপণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কখনোই সফল হবে না। ১৯৭০ ও ১৯৮০র দশকে জাতিসংঘ এ বিষয়ে একটি উদ্যোগ

নিলেও স্বাধীনতা যুদ্ধে ও নিজের দৃঢ়চেতা মনোভাবের বিষয়ে সদস্যদের মতানৈক্য হওয়ায় সে উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়নি। প্রকৃত অর্থে বা একবাক্যে সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা দেয়া কঠিন। বাস্তবতা হচ্ছে, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বা সন্ত্রাসবাদ বৃহৎ সামরিক অথবা ভৌগলিক রাজনীতির কৌশলগত একটি ইস্যু। ১৯৯৪ সালের ৯ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত রেজ্যুলেশনে ৪৯/৬০বলা হয়েছে: "Measures to Eliminate International Terrorism" Contains a Provision describing terrorism. Criminal acts intended or calculated to provoke a state of terror in the general public, a group of persons or particular persons for political purposes are in any circumstance unjustifiable, whatever the considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or any other nature that may be invoked to justify them"... "আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ দমনের মাপকাঠি অনুযায়ী সন্ত্রাসবাদের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে,"রাষ্ট্রের জনগণকে ভয়ভীতি দেখিয়ে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা যা যেকোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়, যদিও সেটা রাজনৈতিক, দার্শনিক,আদর্শিক, গোত্রগত, প্রথা ধর্মীয় বা অন্য যে কোন পন্থায় তাকে বিবেচনাকরা হোক না কেন"।

The UN Member States still have no agreed-upon definition of terrorism, and this fact has been a major obstacle to meaningful international countermeasures. Terminology consensus would be necessary for a single comprehensive convention on terrorism, which some countries favor in place of the present **12 piecemeal conventions and protocols**. Cynics have often commented that one state's "terrorist" is another state's "freedom fighter"."জাতিসংঘের সদস্যরা সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞার ব্যাপারে এখনও আন্তর্জাতিক মানদন্ডে উন্নীত একটি সংজ্ঞায় উপনীত হতে পারেননি। একক সংজ্ঞা যা ১২ টি কনভেনশন ও প্রটোকলের নিরিখে সংজ্ঞায়িত হবে। দেখা যাচ্ছে, একটি রাষ্ট্রের কাছে যা সন্ত্রাসী, অন্য রাষ্ট্রের কাছে সেটা মুক্তিযোদ্ধা"।

A **UN panel**, on March 17, 2005, **described terrorism** as any act "intended to cause death or serious bodily harm to civilians or non-combatants with the purpose of intimidating a population or compelling a government or an international organization to do or abstain from doing any act." ২০০৫ সালের ১৭ মার্চ জাতিসংঘের একটি প্যানেল সন্ত্রাসবাদের ব্যাখ্যা দিয়েছে এভাবে, "সরকার,আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী বা কোন জনগোষ্ঠীকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে করা এমন কাজ, যা সামরিক বা বেসামরিক কোন ব্যক্তির মৃত্যু অথবা গুরুতর শারীরিক ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে"।

United Kingdom:

The **United Kingdom's Terrorism Act 2000** defines terrorism to include an act "designed seriously to interfere with or seriously to disrupt an electronic system". An act of violence is not even necessary under this definition- যুক্তরাজ্যের টেরোরিজম এ্যাক্ট ২০০০ অনুযায়ী সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে, এমন কোন কাজ যা মারাত্মকভাবে কোন কিছুকে বাধাগ্রস্ত করে অথবা ইলেকট্রনিক ব্যবস্থাকে তছনছ বা ব্যহত করে"।

United States:

The United States has defined terrorism under the Federal Criminal Code. Title 18 of the United States Code defines terrorism and lists the crimes associated with terrorism. In Section 2331 of Chapter 113(B), defines terrorism as: "…activities that involve violent… or life-threatening acts… that are a violation of the

criminal laws of the United States or of any State and… appear to be intended (i) to intimidate or coerce a civilian population; (ii) to influence the policy of a government by intimidation or coercion; or (iii) to affect the conduct of a government by mass destruction, assassination, or kidnapping; and…(C) occur primarily within the territorial jurisdiction of the United States…" *(http://azdema.gov/museum/famousbattles/pdf/Terrorism)*। "ফেডারেল অপরাধী ধারার ১৮ নং বিধান অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞায়িত করেছে। ১১৩বি অধ্যায়ের ২৩৩২ নং সেকশন অনুযায়ী সন্ত্রাসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, সহিংস ঘটনা অথবা জীবনহানিকারক এমন কাজ, যা যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য রাষ্ট্রের ফৌজদারি আইনের লঙ্ঘন এবং সাধারণ জনগণকে ভীত করা, ভয় ভীতি দেখিয়ে সরকারকে তার নীতি বদলাতে বাধ্য করার চেষ্টা, ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ, গুপ্তহত্যা অথবা অপহরণ এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যমান আইন মোতাবেক অপরাধ"।

US Patriot Act of 2001: terrorist activities include

- Threatening, conspiring or attempting to hijack airplanes, boats, buses or other vehicles.
- Threatening, conspiring or attempting to commit acts of violence on any "protected" persons, such as government officials
- Any crime committed with "the use of any weapon or dangerous device," when the intent of the crime is determined to be the endangerment of public safety or substantial property damage rather than for "mere personal monetary gain

ইউ এস প্যাট্রিয়ট এ্যাক্ট ২০০১: যেসব কাজ সন্ত্রাসী বলে গণ্য হবে:

হুমকি, ষড়যন্ত্র অথবা বিমান, নৌকা, বাস বা যে কোন যানবাহন জিম্মি করা;

হুমকি, ষড়যন্ত্র অথবা যে কোন সরকারী কর্মকর্তা বা নিরাপত্তা পাওয়া ব্যক্তির প্রতি সহিংসতা, অস্ত্র বা যেকোন বিপদজনক যন্ত্রের মাধ্যমে করা কোন অপরাধ, যা ব্যক্তিস্বার্থে জনগণের নিরাপত্তা লঙ্ঘন বা সম্পদ ধ্বংসের কারণ হয়;

FBI definition of terrorism:

"The unlawful use of force or violence against persons or property to intimidate or coerce a Government, the civilian population, or any segment thereof, in furtherance of political or social objectives".

ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেটিভ (এফবিআই) **প্রদত্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,** "কোনো সরকার বা সাধারণ নাগরিকদের ভয় দেখিয়ে রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যক্তি বা সম্পদের বিরুদ্ধে ক্ষমতা বা সহিংসতার বেআইনী ব্যবহার করা"।

এ সংজ্ঞায় মূল কর্মের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। শক্তি, ক্ষমতা বা সহিংসতার ব্যবহার যদি বেআইনী হয়, তবে তা 'সন্ত্রাস' বলে গণ্য হবে । আর যদি তা আইনসম্মত হয় তবে তা সন্ত্রাস বলে গণ্য হবে না। এখানে সমস্যা হচ্ছে আইন ও বেআইনী বিষয় নির্ধারণ নিয়ে। এভাবে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীকে চিহ্নিত করা কঠিন এবং এ বিষয়ে ঐক্যমত্য ও প্রায় অসম্ভব। এজন্য অনেক সমাজবিজ্ঞানী কর্মের উপর নির্ভর না করে আক্রান্তের উপর নির্ভর করে একে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তাদের ভাষায়, 'terrorism is premediated, politically motivated violence perpretrated against noncombatant targets': ''রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে পূর্বপরিকল্পিতভাবে অযোদ্ধা লক্ষ্যের বিরুদ্ধে করা সহিংসতা সন্ত্রাস"।

U.S. Army Manual:

Definition of terrorism is the "calculated use of unlawful violence or threat of unlawful violence to inculcate fear.It is intended to coerce or intimidate governments or societies ..[to attain] political, Religious, or ideological goals." ইউএস আর্মি ম্যানুয়াল অনুযায়ী সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে, "সরকার ও সমাজে রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও আদর্শগত লক্ষ্য পূরণের জন্য বেআইনী সহিংস আচরণ করা অথবা ভীতি তৈরির জন্য বেআইনীভাবে হুমকি দেয়া" (*U.S. Army Field Manual No. FM 3-0, Chapter 9, 37, 14 June 2001*)।

Encycloprdia of the Social Sciences এ সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "It is a term used to describe the method where by an organized group or a party seeks to achieve its vowed aims, chiefly through the systematic use of violence. Terrorist acts are directed against persons who as individuals, agents or representatives of authority interfere with the consummation or the objections of such a group. The terrorists do not threaten; death or destruction is part of his programmes of action and if he is caught, his behavior during trial is generally directed primarily not towards winning his freedom but towards spreading a knowledge of his doctrines." To understand the problem of terrorism, we should look into what makes a person terrorist. Generally people with the characteristics of action oriented and aggressive minded turn into terrorist. Most of the terrorist sustained psychological damage during childhood. Some of them had lost father or mother or of both at the age of 14 years.

সন্ত্রাস এর সংজ্ঞায় এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে, 'terrorism: the systemetic use of violence to create a general climate of fear in a population and thereby to bring about a particular political objective…সন্ত্রাস: নির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুশৃঙ্খলভাবে সহিসংতার ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা'।

স্বনামধন্য স্কলার Bruce Hoffman **এর** মতে ,একটি সরকারের আলাদা আলাদা সংস্থার সন্ত্রাসবাদ নিয়ে দেয়া সংজ্ঞাও এক রকম হয়নি। বিশেষজ্ঞ এবং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ পন্ডিত ব্যক্তিরাও এ বিষয়ে একমত হতে ব্যর্থ হয়েছেন। রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ : একটি গবেষণা গ্রন্থ অ্যালেক্স সিমিড ১০০টি বইয়ে ১০০টি সংজ্ঞা পর্যালোচনা করে একটি বড় আকারের সংজ্ঞা তৈরি করেছেন। ৪ বছর পর তার প্রকাশিত বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি লিখেছেন, একটি পর্যাপ্ত সংজ্ঞার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

Dhaka University Institutional Repository

হফম্যান সন্ত্রাসবাদের কিছু বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন: সেগুলো হচ্ছে:

রাজনৈতিক লক্ষ্য ও মোটিভ থাকে সন্ত্রাসবাদে;

সংঘাত বা হুমকিযুক্ত সংঘাত;

শিকার বা ভিকটিমকে মনস্তাত্ত্বিক ভাবে দুর্বল করে অনেকদূর এগিয়ে যাওয়া;

একটি সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত যাদের সহজেই চিহ্নিত করা যায়; এবং বাইরের কোন গোষ্ঠী বা বিদেশীদের দিয়ে পরিচালিত; *(হফম্যান, ২০০৬; ১১৮)*।

সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে সংঘাতের একটা ধারাবাহিক ব্যবহার। ভয় বা ভীতি প্রদর্শনপূর্বক কিছু করা। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মতে, সন্ত্রাসবাদের আইনগত কোন ভিত্তি নেই। সাধারণ সংজ্ঞায় সন্ত্রাসবাদ বলতে জনমনে ভীতি সৃষ্টি করে ধর্মীয়, রাজনৈতিক,আদর্শগত এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে নিরাপত্তা হুমকি তৈরি করা। সন্ত্রাসবাদ শব্দটি রাজনৈতিক ও আবেগদ্বারা আক্রান্ত। এর সংক্ষিপ্ত এবং সর্বজন বিদিত সংজ্ঞা দেয়া কঠিন। সন্ত্রাসবাদের অন্তত একশ'টি সংজ্ঞা পাওয়া গেছে। রাষ্ট্র কর্তৃক সন্ত্রাসবাদের ধারণা কখনো কখনো বিতর্ক তৈরি করে। রাষ্ট্র তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কখনো কখনো নিরপরাধ মানুষকে ও সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে থাকে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বৃহৎ পরিসরে সন্ত্রাসবাদের অনুশীলন চলে। ডানপন্থী বা বামপন্থী, জাতীয়তাবাদী চেতনা, ধর্মীয়, বিপ্লবী, এমনকি শাসকগোষ্ঠীও এটি ব্যবহার করতে পারে। এর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সাধারণের উপর নির্বিচার প্রয়োগ করে একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ব্যাপক প্রচারণা পেতে পারে। মানুষের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করে উদ্দেশ্য হাসিল করা এর অন্যতম লক্ষ্য।

জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যে পার্থক্য:

বর্তমান বিশ্বে জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের প্রসার ব্যাপকভাবে লাভ করেছে। একটি উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে এ দুটো শব্দ হচ্ছে বড় ধরনের সমস্যা। বিশ্বে সহিংসতা সৃষ্টিতে এ দুটো শব্দের প্রয়োগ দেখা দেয়। বেশিরভাগ সময় যেকোন সন্ত্রাসী হামলা বা ঘটনার সময় এ দুটি শব্দ বিপরীতভাবে ব্যবহৃত হয়। সতর্কভাবে দেখলে জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। অভিধানের দিকে তাকালে সন্ত্রাসবাদের ব্যাখ্যায় বলা হয়, "লক্ষ্য অর্জনে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে যে সহিংসতা পরিচালিত হয়, সেটাই সন্ত্রাসবাদ। সন্ত্রাসীরা লক্ষ্য অর্জনে যে কোন পর্যায়ে সহিংসতা চালাতে পারে''।

জঙ্গীবাদের সংজ্ঞায় দেখা যায়, এটাও এক ধরনের সন্ত্রাস। কিন্তু তারা লক্ষ্য অর্জনে সচরাচর সহিংস হয়ে উঠেনা। আবার পরিস্থিতি বাধ্য করলে তারা সহিংসতা করতে পিছপাও হয়না। সচরাচর তারা লক্ষ্য আদায়ে চাপ সৃষ্টি করে থাকে"। সন্ত্রাসী ও জঙ্গীবাদীরা বেআইনী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। সন্ত্রাসীরা সবসময় মানুষ বা সরকারকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে থাকে। মানুষের জন্য এদের মনে কোন মানবিক বিষয় নেই। এরা নিজেদের বিধ্বংসী নয়, ত্রাতা ভাবে। অন্যদিকে জঙ্গীরা জাতির স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করে থাকে। সন্ত্রাসীরা প্রকৃত সহিংসতা করলেও জঙ্গীরা হুমকি দিয়ে সহিংসতা ছড়ায়। সন্ত্রাসীদের সহায়তাকারীকে জঙ্গীবাদীরা নেতা ভাবে। অনেক জঙ্গী প্রতীক হিসেবে বিবেচিত।

একজন সন্ত্রাসী তার ইচ্ছানুযায়ী যেকোন স্থানে সহিংসতা করতে পারে;

একজন জঙ্গী সন্ত্রাসীর মতো ব্যক্তিত্ব হলেও সে প্রয়োজন ছাড়া সহিংস হয়না;

একজন সন্ত্রাসী সরকার ও জনগণকে ভয় দেখিয়ে থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ছাড়া মানুষের প্রতি তার মানবিক আচরণ নেই। অন্যদিকে, স্বাধীনতার প্রয়োজনে আসল দোষী জঙ্গীরা অস্ত্র হাতে তুলে নেয়; এবং

সন্ত্রাসীদের অস্ত্র প্রয়োগের বিপরীতে হুমকি দিয়ে থাকে জঙ্গীরা;

Dhaka University Institutional Repository

জঙ্গীবাদের প্রকৃতি:

মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র ১৯৬৩ সালে ওয়াশিংটনে তার দেয়া বক্তৃতায় বর্ণবিরোধী সংগ্রামকে "the marvelous new militancy" বলে অভিহিত করেছেন। এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি একে সময়ের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন। মাদক যেমন ধীরে ধীরে মানুষ আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলে, তেমনি সংস্কারবাদীদের আন্দোলনের গতি ত্বরান্বিত করতে বৈসাদৃশ্যমূলক কাজ করেছিলেন তিনি *(কিং, মার্টিন লুথার; ১৯৬৩ আই হেভ অ্যা ড্রিম)*। ১৯৬৮ সালে কিংয়ের মৃত্যুর বছর সবকিছুর বিনিময়ে শুধু আন্দোলনকে জোরদার করার কথা বলা হয়েছে। মৃত্যুর আগের রাতে দেয়া তার শেষ বক্তব্যে বলেছেন, "we don't need any bricks and bottles, we don't need any Molotov cocktails" *(কিং মার্টিন লুথার, আই সি দ্য প্রমিজ ল্যান্ড, ১৯৬৮ এ)*।

তার এ বক্তব্য কি বিবেচ্য? ইট, বোতল, বিস্ফোরক ছাড়া কেউ জঙ্গীবাদকে স্বাগত জানাতে পারে?

একাডেমিক জার্নালের বাইরে অল্প কিছু নিবন্ধে জঙ্গীবাদের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এমন একটি নিবন্ধ 'what do we mean by `militancy'? by Steve D'Arcy, published in 2011 by Znet. এ নিবন্ধে সম্পদ ধ্বংস ও রাজপথে সহিংসতার পরিবর্তে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের শান্তিপূর্ণ জঙ্গীবাদের ধারণাকে সমর্থন করা হয়েছে। স্টিভ ডি'আর্কির মতে, কোন কার্যক্রমকে জঙ্গী বলতে হলে সেখানে নিচের বিষয়গুলোর উপস্থিতি থাকতে হবে:

ক. প্রতিবাদী : কোন কিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা সামাজিক পরিবর্তনের ইচ্ছা থেকে চালিত।

খ. প্রতিকূলতা : যেখানে সুস্পষ্টভাবে শত্রুচিহ্নিত করা হয়েছে; যেখানে ধরেই নেয়া হয়েছে প্রতিপক্ষকে জয় করা বা বুঝিয়ে পক্ষে আনা অসম্ভব; একমাত্র উপায় তাদের চাপ দিয়ে বা আন্দোলনের মাধ্যমে পরাজিত করা।

গ. সংঘাতমূলক : যেখানে সংঘাত শুরু করা হয়, সেটার লালন ও উস্কে দেয়া হয় এবং যেখানে বোঝাপড়া বা ছাড় দেয়ার চিন্তাই অনুপস্থিত।

ঘ. যৌথ প্রয়াস : এটা যৌথ আন্দোলনের অংশ; একান্ত ব্যক্তিগত পদক্ষেপটিও এখানে বৃহৎ সামাজিক আন্দোলনের অংশ।

এর সাথে পঞ্চম একটি বিষয় যুক্ত হতে পারে...

ঙ. মধ্যস্থতামুক্ত : যেখানে তৃতীয় কোন পক্ষের মধ্যস্থতার বাইরে সরাসরি পদক্ষেপ নেয়া হয়।

এই ধরণের জঙ্গী ধারণা থেকে চার ধরণের কাজ হতে পারে- বলছেন স্টিভ ডি'আর্কি...

১. প্রতীকি অবাধ্যতা: কোন ব্যক্তি, কর্মকান্ড, নীতি বা প্রতিষ্ঠান যেগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি রয়েছে- সেগুলোর বিরুদ্ধে প্রতীকি বা সাংস্কৃতিক তৎপরতার মাধ্যমে বর্জনের ঘোষণা। যেমন, আইনি নিষেধ উপেক্ষা করে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ করা বা কোন ডকুমেন্ট পোড়ানো।

২. শারীরিক প্রতিবাদ: প্রতিপক্ষের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া।

৩. সম্পদ ধ্বংস করা: সম্পদ ধ্বংস বা বিনষ্ট করা। যেমন, জানালা ভাঙ্গা, যানবাহন ভাংচুর বা যন্ত্রপাতির ক্ষতি করা।

৪. দাপ্তরিক কাজকর্মে ব্যঘাত ঘটানো: কোন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে বাধা দেয়া। যেমন, কোন সরকারী অফিসে ঢুকে সেখানে কাজ করতে না দেয়া।

মার্কস-লেলিনবাদ, নৈরাজ্যবাদ, মাওবাদ ও নব্য বামপন্থীদের আন্দোলনের গভীর পর্যালোচনা থেকে তিনটি পরস্পরনির্ভর বিষয় তুলে এনেছেন মাইকেল আলবার্ট, যেগুলো একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তি গড়ে তোলে।

১. তত্ত্ব : বিদ্যমান সমাজের মধ্যকার বৈপরিত্যগুলো বোঝার চেষ্টা করা এবং সেগুলো সমাধানের উপযোগী পন্থা বাতলে দেয়া। একটি ভাল তত্ত্ব সমস্যার সুস্পষ্ট সমাধান নির্দেশ করে এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপন্থাও সঠিকভাবে নির্দেশ করে।

২. কৌশল : উদ্দীষ্ট লক্ষ্য পূরণের উপায়। সামাজিক সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য রাজনৈতিক তত্ত্বের মাধ্যমে উপায় বাতলে দেয়া। কৌশল যত সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হবে, সেটি ততো শক্তিশালী তত্ত্ব হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। কৌশল অস্পষ্ট হলে সেটাকে অনেকটা অসম্পূর্ণ তত্ত্বের অংশ বলতে হবে।

৩. পদক্ষেপ/কর্মপন্থা: কৌশল বাস্তবায়নের জন্য গৃহিত বাস্তব পদক্ষেপ। যে কোন কর্মপন্থা বা পদক্ষেপকে হতে হবে বাস্তব পরিস্থিতির সাথে মানানসই। যদি পদক্ষেপ ব্যর্থ হয়, তবে সেটা বর্জনের সিদ্ধান্তও থাকতে হবে ।

(আর্কি, স্টিভ ২০১১; www.zcommunications.org/what do we mean by militancy)।

<u>বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার</u>:

বিখ্যাত তুর্কী যোদ্ধা ইখতিয়ারউদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী ১২০৪ সালে বঙ্গবিজয় করেন। এরপর ১৩ শতাব্দি শুরুতে এদেশে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন শুরু হয়। ঐতিহাসিকভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বঙ্গবিজয়ের অনেক আগ থেকেই উপকূলীয় এলাকার মানুষ কিছুটা ধর্মচর্চা করতো। ৮ম শতকে আরব বণিকরা এদেশে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য আসতো উপকূলীয় এলাকায়। তাছাড়া অনেক সুফী সাধক এদেশে পরিদর্শন করেছেন, এসেছেন ধর্ম প্রচারের জন্য। তাদের সরলতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সদ্ভাবের কারণে মানুষ ধর্মের উপর আকৃষ্ট হয়। বখতিয়ার খলজীর পর অনেক সুফি সাধক এদেশে এসেছেন, তারা শুধু ইসলাম প্রচার নয়, বরং এর প্রসারে একটি মুসলিম সংস্কৃতির সূচনা করেন। রিচার্ড ইটন তার গবেষণায় দেখেছেন, জনগণের কাজে সম্পৃক্ত থেকে বন জঙ্গল পরিস্কার, ভূমিরক্ষা এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারের মাধ্যমে সুফীরা মানুষের মনে স্থায়ী অবস্থান তৈরি করে নিয়েছিল। ইটন যুক্তি দেখিয়েছেন, ১৬ থেকে ২০ শতকের মধ্যে বাংলার সুফীদের তিনটি কাজ করতে হয়েছে। বন জঙ্গলের সাথে সম্পর্ক, অতিপ্রাকৃতিক বিশ্ব এবং ইসলাম প্রচারে মসজিদকে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। এভাবে, স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস একটা সময়ে ইসলামের উপর গিয়ে বর্তায়। হিন্দু ও বৌদ্ধ অধ্যুষিত জনপদে আদি এবং ইসলামের বিষয়গুলো সুফীদের মাধ্যমে মানুষ পূরণ করতে থাকে। আল্লাহর পরে অতিশুদ্ধ মানব হযরত মুহাম্মদ (সা:) এবং নীচে সুফীপীর মুর্শিদদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম শাসকদের নীতি ও সুফীদের অংশগ্রহণমূলক কাজে ব্যাপক অংশগ্রহণ এর বিকাশকে সহজ করে তোলে। সভ্যতা বিনির্মাণে ইসলামকেই মানুষ আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। আবার অনেকে বলে থাকেন ভারতীয় দর্শনের সাথে সুফীবাদের বিকাশের ফলে কুরআনের গন্ধ মানুষ হারিয়ে ফেলে। তবে হিন্দু ও মুসলমানদের সহনশীল সহাবস্থান তৈরিতে সবচেয়ে বড় অবদান সুফীদের। অনেক হিন্দু বা অন্য ধর্মের মানুষ ও কিন্তু মাজারে যায় *(বারকেলি এন্ড লন্ডন; ১৯৯৩; দেসা; ১৯৭১)*।

বাংলাদেশের বর্তমান ইসলাম:

"দ্য ন্যাশনাল ব্যুরো অফ এশিয়ান রিসার্চের" এনবিআর প্রকল্পের অধীনে ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। সেখানে প্রফেসর আলী রিয়াজ "ইন্টারঅ্যাকশন অফ ট্র্যান্সন্যাশনাল এন্ড লোকাল ইসলাম ইন বাংলাদেশ" প্রবন্ধে ইসলাম ও ইসলামী দলগুলোর অবস্থা তুলে ধরেন। বাংলাদেশের লোকগীতি বা লোকসংগীত যেমন একটি ঐতিহ্য তেমনি পীর, মাজারে যাওয়া প্রার্থনা করা এগুলো সাধারণ অনুশীলন।এখানে বিভিন্ন মাজহাবের এবং মাসালার আলেম ওলামা রয়েছেন। বাংলাদেশের ইসলামকে বৃহৎ আঙ্গিকে দুইভাগে দেখিয়েছেন তিনি। একটি সামাজিক ইসলাম, অন্যটি রাজনৈতিক ইসলাম। সামাজিক ইসলাম বলতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা দেয়াকে বুঝিয়েছেন যা সচরাচর দেখা যায়। এটা বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে সাধারণভাবে দেখা যায়। রাজনৈতিক ইসলাম হচ্ছে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তৈরি ধর্মীয় সংগঠন। সেখানে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যার পাশাপাশি কোন ব্যক্তিকে তার পরলৌকিক জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে ইসলামের রাজনীতিতে নিয়ে আসা। রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ইসলামকে ব্যবহার করে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করা।

ইসলামের প্রকারভেদঃ

সামাজিক ইসলাম				
সুফিপ্রথা	**পীর ও মাজার**	**তাবলিগ জামায়াত**	**ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠান**	**ধর্মীয় অনুষ্ঠান**
মুজাদ্দেদী	ফুরফুরা, জৈনপুরি	দাওয়া, সম্মেলন	সালিস	ঈদ
চিশতী	শর্শিনা, চরমোনাই	বিশ্বইজতেমা	ফতোয়া	রোজা
নকশবন্দি	আটরশি		মাদ্রাসা	মিলাদুন্নবী
কাদেরিয়া	এনায়েতপুরি ফুলতলি			
	মাজার: মাইজভান্ডারী খানজাহান আলী, শাহজালাল বায়েজিদ বোস্তামি			

রাজনৈতিক ইসলাম		
মূলধারার ইসলামি দল	**র‍্যাডিকাল**	**জঙ্গী**
ইসলাম হচ্ছে আদর্শ;শরীয়াহ মোতাবেক এর রাজনৈতিক ব্যাখ্যা; সাংবিধানিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে ভিত্তি মজবুত করা;	ইসলাম রাজনৈতিক আদর্শ ইসলামের আলোকে সবকিছুর ব্যাখ্যা দেয়া; শরীয়াহ বাস্তবায়ন সাংবিধানিক রাজনীতিতে অংশ গ্রহণে অনাগ্রহ; বাইরের সাথে সম্পর্ক; প্রয়োজনে জঙ্গীগোষ্ঠীর ব্যবহার।	ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান গ্রামপর্যায়ে এর ভিত্তি;সংবিধান নয়,ধর্মীয় বিধি বিধান পালন; প্রয়োজনে জঙ্গী হওয়া;

এখানে দেখা যাচ্ছে, রাজনৈতিক ইসলাম রাজনৈতিক সংগঠন, রাজনৈতিক কৌশল এবং নির্বাচনের রাজনীতি এ তিনটি উপধারায় বিভক্ত। এখানে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং বিস্তৃতির দিকে তাকালে পাঁচ ধরনের ইসলামী দলের সুস্পষ্ট কার্যক্রমের বিষয়টি লক্ষ্যণীয়।

বাংলাদেশে ইসলামী দলগুলোর বিভাজন:

ধরণ	উল্লেখযোগ্য দিক	দলেরনাম
রাষ্ট্রশাসন/সুযোগ	রাষ্ট্রের মাধ্যমে সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা; ইসলামী বিপ্লবের বিশ্বাস থেকে নির্বাচনে অংশ নেয়া; সমর্থন দেশব্যাপী	জামায়াত
আদর্শগত/প্রচলিত	পুরোপুরি ইসলামী রাষ্ট্র বাস্তবায়ন ভারতের দেওবন্দি অনুসারী; কওমী মাদ্রাসা	পুরোপুরি ইসলামী রাষ্ট্র বাস্তবায়ন ভারতের দেওবন্দি অনুসারী; কওমী মাদ্রাসা
পীরও মাজার কেন্দ্রিক	ঐতিহ্যগত ও শরীয়াহ মোতাবেক সংগঠন পরিচালিত হয়;ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগঠন দুর্বল;	জাকের পার্টি; ইসলামী শাসনতন্ত্র; তরিকত ফেডারেশন;
শহর কেন্দ্রিক এলিট	খেলাফত প্রতিষ্ঠা ; আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ; উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী; নির্বাচনে অংশ নেয়নি ;	হিযবুত তাহরীর ;
জিহাদ/জঙ্গী	জিহাদের মাধ্যমে দেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা;আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বিশেষ করে পাকিস্তান	হরকতুল জিহাদ; জেএমবি;হিযবুত তাওহীদ;শাহাদাত-ই-আল হিকমা;

এখানে উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি হচ্ছে, বিগত বছরগুলোতে কিছু সংগঠন সামাজিক ইসলাম ও রাজনৈতিক ইসলামের মধ্যে যে পার্থক্য, সেটা মুছে দিয়েছে। বিশেষ করে ১৯৮০সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে কোন পীরও মাজার অনুসারীরা কোন রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত হয়নি। গত দু'যুগের নগরকেন্দ্রিক অভিজাত শ্রেণী ও জঙ্গী গোষ্ঠী ইসলামী রাজনীতিতে জড়িত হয়েছে। (*রিয়াজ, আলী এবং আর রাজি, খ আলী : হু আর দ্য ইসলামিস্ট এবং আলী রিয়াজ ও ক্রিস্টিয়ান ফেয়ার পলিটিক্যাল ইসলাম এন্ড গভর্নেন্স ইন বাংলাদেশ)*।

জঙ্গীবাদের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট:

এগারো সেপ্টেম্বর, ২০০১ সালে আমেরিকার টুইন টাওয়ার, পেন্টাগণ হাউজে বোমা ও সন্ত্রাসী হামলার পর নড়ে চড়ে বসে মার্কিন প্রশাসন। বিশ্বব্যাপী জঙ্গীবাদের বিষয়ে তারা নতুন করে ব্যাখ্যা ও এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করে। আল কায়েদাকে এ জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়। এর প্রধান ওসামা বিন লাদেনকে ধরতে বিশ্বব্যাপী মরিয়া হয়ে ওঠে মার্কিন প্রশাসন। আফগানিস্তানে অভিযান, ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের বিপক্ষে অভিযান পরিচালনা অত:পর পাকিস্তানে মার্কিন বাহিনীর অভিযানে ওসামা বিন লাদেনকে নিশ্চিহ্ন করার দাবি করে মার্কিন বাহিনী। এছাড়াও পাকিস্তান, সিরিয়া ও ইরানে রাসায়নিক অস্ত্র তৈরির বিরুদ্ধে অব্যাহত হুমকি দিয়ে আসছে মার্কিন বাহিনী। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে স্টিং অপারেশনের নামে বিভিন্ন ব্যক্তিকে শাস্তির আওতায় নিয়ে এসেছে মার্কিন বাহিনী। ২০১৩ সালের ৯ আগষ্ট, বাংলাদেশী যুবক নাফিসকে বোমা হামলায় পরিকল্পনার অভিযোগে ৩০ বছরের কারাদন্ড দেয় মার্কিন আদালত।

Dhaka University Institutional Repository

৯/১১ তে যুক্তরাষ্ট্রে আলকায়েদার সন্ত্রাসী হামলার পর 'ন্যাশনাল কমিশন অন টেরোরিস্ট অ্যাটাকস আপন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস'। জন রথ, ডগলাস গ্রিনবার্গ, সেরেনা উইলি কমিশনের দেয়া রিপোর্টে আলকায়েদা ও সহযোগী সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর আর্থিক অবস্থা ও লেনদেন প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়।

২০০১ সালের সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখ আমেরিকার সময় সকাল ৮ টা ৪৬ মিনিট। আল কায়েদার ১৯ জঙ্গী যুক্তরাষ্ট্রের চারটি যাত্রীবাহী বিমান ছিনতাই করে। এর মধ্যে নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে দুটি বিমান দিয়ে আক্রমণ চালানো হয়। এতে বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে আগুন ধরে যায়। দুই ঘন্টার মধ্যে টুইন টাওয়ার ধ্বসে পড়ে। সঙ্গে আশে পাশের আরো কয়েকটি ভবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর মধ্য দিয়ে তৃতীয় ফ্লাইটটি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সদর দফতর পেন্টাগণে হামলা চালায় জঙ্গীরা। চতুর্থ ফ্লাইটটি দিয়ে ছিনতাইকারীরা পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের শাংকসভেলি এলাকার আকাশে যায়। এসময় জঙ্গীরা ফ্লাইটটি ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটাল হিল বা হোয়াইট হাউজের দিকে নিতে গেলে বিমানের ক্রু ও যাত্রীদের সাথে ধস্তাধ্বস্তিতে তা আকাশেই বিধ্বস্ত হয়। এতে বিমানে থাকা ছিনতাইকারীদের সবাই মারা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের স্মরণকালের ভয়াবহতম এ হামলায় ২হাজার ৭৪৯ জন মানুষ নিহত হয়। বেশিরভাগই বেসামরিক ব্যক্তি, নারী ও শিশু। নিহতদের মধ্যে ৩৪৩ জন দমকল কর্মী ও ৬০ জন পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন। পেন্টাগণে আত্মঘাতী হামলায় মারা যায় ১৮৪ জন। যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও বিশ্বের ৭০টি দেশের প্রবাসীরাও নিহতের তালিকায় ছিলেন। এ হামলার পরে আহত, অসুস্থ্য ও উদ্ধারকর্মী আরো ৮৩৬ জন পরে মারা যান। পুরো ঘটনা পাল্টে দেয় গোটা যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা। ২০০১ এর সন্ত্রাসী হামলার পর যুক্তরাষ্ট্রের ঋণের খাতায় যোগ হয় ৪০০ কোটি ডলার। যুদ্ধ ও জাতীয় নিরাপত্তার জন্য এসব অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। এ ঘটনার পর থেকে জের হিসেবে পরবর্তিতে অন্তত: ২ লাখ ৩৬ হাজার ৫০০ মানুষ নিহত হয়েছেন *(বাংলাদেশ প্রতিদিন,১৩ সেপ্টেম্বও; ২০১৩)*। রোড আইল্যান্ডের ব্রাউন ইউনিভার্সিটির ওয়াটসন ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের কস্ট অব ওয়ার শীর্ষক" গবেষণা প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা যায়। প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের এ হামলায় তাৎক্ষণিক মৃত্যুবরণ করে ২ হাজার ৯৯৫ জন। এতে ক্ষতি হয় ৫ থেকে ১০ হাজার কোটি ডলার। আর এর জেরে মারা যায় ২ লাখ ৩৬ হাজার ৫০০ থেকে ২ লাখ ৬১ হাজার ৭০০ মানুষ নিহত হন। যদিও একই স্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওয়ান ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার নির্মাণ শুরু করেছে ২০০৬ সালে। এটি নির্মাণে ব্যয় হবে ৩ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার। সারা বিশ্বের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতীক হবে এ সেন্টারটি *(ওয়াটসন ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের কস্ট অফ ওয়ার)*।

সন্ত্রাসবাদের আন্তর্জাতিক অবস্থা:

আমেরিকার টুইন টাওয়ারে হামলার ঘটনায় আল কায়েদা জড়িত থাকার কথা স্বীকার করলে এর প্রধান ওসামা বিন লাদেনকে অভিযুক্ত করে মার্কিন সরকার। এসময় ওসামা বিন লাদেন মার্কিন সরকারের বিপক্ষে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে মুসলমানদের আহবান জানায়। যদিও সৌদিআরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সবকটি দেশ ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করে ।

মধ্যপ্রাচ্যের সৌদিআরবের রিয়াদে ২০০৩ সালের মে মাসে বিদেশী জনঅধ্যুষিত এলাকায় আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরিত হয়। ২০০৪ সালে সৌদিআরবের মার্কিন কনস্যুলেটের বিদেশী জনঅধ্যুষিত আবাসিক এলাকায় একই ধরনের সন্ত্রাসী হামলা হয়। ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে লেবাননের বৈরুতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী রফিক হারিরির উপর সন্ত্রাসী হামলা হয়। ২০০৫ সালের এপ্রিলে ইরাকে অন্তবর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের দিন ব্যাপক বোমা হামলা হয়।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় জামেয়া ইসলামিয়া নামের আল কায়েদার সাথে সম্পর্কিত একটি সংগঠন ইন্দোনেশিয়ায় বড় ধরনের নাশকতা চালায়। পরবর্তিতে এটা জানা যায়, ফিলিপাইনের আরো কিছু ইসলামিক চরমপন্থী দলের সাথে জামেয়া ইসলামিয়ার সম্পর্ক রয়েছে বলে জানা যায়।

ইউরোপের দেশ স্পেনের মাদ্রিদে ২০০৪ সালের মার্চ মাসে বেশ কিছু ট্রেনে সন্ত্রাসী ও বোমা হামলা চালানো হয়। এতে ১৯১ জন মারা যায় এবং অন্তত ১৬০০ লোক আহত হয় । এর রেশ কাটতে না কাটতে একই বছরের আগস্টে রাশিয়ার দুটি আভ্যন্তরীণ বিমান ফ্লাইটে বোমা বিস্ফোরণে ৯০ জন মারা যায়। একই বছরের সেপ্টেম্বরে নর্থ ওসেটিয়া আলানিয়ার একটি স্কুল সন্ত্রাসীরা দখল করে। গুলি ও বিস্ফোরকের ফলে সেখানে ৩৩০ জনের মৃত্যু হয় এবং ৭০০ লোক আহত হয়। যুক্তরাজ্যের লন্ডনে ২০০৫ সালের জুলাইয়ে জি-৮ এর প্রস্তুতি চলাকালে একসাথে বাস-ট্রেনে বোমা হামলা হয়। এতে ৫৬ জন মানুষ নিহত হয় ও ৭০০ জন আহত হয়। এর দুই সপ্তাহ পর লন্ডনে একই ধরনের বোমা হামলা হয়। যাতে কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। পরে জানা যায় এ ঘটনায় একজন তরুণ ইউরোপীয় জড়িত যে সন্ত্রাসী হতে চেয়েছিল।

আফ্রিকার তিউনিশিয়ার ডিজারবা দ্বীপে ২০০২ সালের এপ্রিলে ইহুদী সমাবেশস্থলে গাড়ী বোমা বিস্ফোরিত হয়। একই বছরের নভেম্বরের কেনিয়ার মোবাসায় ইহুদী মালিকানাধীন হোটেলে একটি আত্মঘাতী গাড়ীবোমা বিস্ফোরিত হয়। ২০০৩ সালের মে মাসে মরক্কোর কাসাব্লান্কার ৫টি স্থানে একযোগে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। মিশরের তারায় অক্টোবর ২০০৪ ও শারম আল শেখে জুলাই ২০০৫ সালে সিরিজ সন্ত্রাসী হামলা ঘটে। এর ফলে অনেক নীরিহ মানুষের প্রাণহানি ঘটে।

মানব ইতিহাসে সন্ত্রাসঃ

প্রাচীন যুগ থেকেই বিভিন্ন দল, গোষ্ঠি ও রাষ্ট্র সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়েছে। তবে মানব ইতিহাসে প্রাচীন যুগের প্রসিদ্ধতম সন্ত্রাসী কর্ম ছিল উগ্রপন্থী ইহুদী যীলটদের সন্ত্রাস। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী ও তার পরবর্তী সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে বসবাসরত ইহুদী উগ্রবাদী এ সকল ইহুদীরা নিজেদের ধর্মীয় ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আপোসহীন ছিল। যে সকল ইহুদী রোমান রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা করত বা সহাবস্থানের চিন্তা করত এরা তাদেরকে গুপ্ত হত্যা করত। এ জন্য এরা শিকারী (The sicarii dagger man) বা ছুরি-মানব নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এরা প্রয়োজনে আত্মহত্যা করত, কিন্তু প্রতিপক্ষের হাতে ধরা দিত না।

ইসলামের ইতিহাসে জঙ্গীবাদঃ

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বাদ দিলে সাধারণভাবে সন্ত্রাস বা জঙ্গীবাদকে রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ে এক প্রকার যুদ্ধ বলা যায়। তবে যুদ্ধের সাথে এর পার্থক্য হলো: যুদ্ধ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের দাবিদার কর্তৃক পরিচালিত হয়, ফলে সেক্ষেত্রে ক্ষমতা ব্যবহারের বৈধতা বা আইনসিদ্ধতার দাবি করা হয়। এতে সাধারণত যোদ্ধাদেরকে লক্ষ্যবস্তু করা হয় এবং এর উদ্দেশ্য হয় সামরিক বিজয়। অন্যদিকে, সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা দল রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী নয়। তবে রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন তারা চায়। এ জন্য যোদ্ধা-অযোদ্ধা সবাইকে তারা নির্বিচারে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতি করে। যেন এক পর্যায়ে ভীত হয়ে সংশ্লিষ্ট সরকার ও জনগণ অভিষ্ট 'রাজনৈতিক পরিবর্তন' করতে রাজি হয়। সাধারণভাবে যারা সম্মুখ বা গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের উপর সামরিক বিজয় লাভ করতে পারবে না বলে মনে করেন তারাই এরূপ সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের আশ্রয় নেন। প্রাচীন যুগ থেকে ইহূদী উগ্রবাদী ধার্মিকগণ 'ধর্মীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়েছেন। মধ্যযুগে খৃষ্টানদের মধ্যে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে সন্ত্রাসের অগণিত ঘটনা দেখা যায়। বিশেষত ধর্মীয় সংস্কার, পাল্টা-সংস্কার both the Reformation and the Counter-Reformation)-এর যুগে ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টদের মধ্যে অগণিত যুদ্ধ ছাড়াও যুদ্ধ বহির্ভূত সন্ত্রাসের অনেক ঘটনা পরিলক্ষিত হয়।

ইসলামের ইতিহাসে যুদ্ধ দেখতে পেলেও সন্ত্রাস খুবই কম দেখা যায় । এ ধরনের যে সামান্য কিছু ঘটনা দেখা যায় তার মধ্যে অন্যতম খারিজী ও বাতিনী সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ড। সমকালীন জঙ্গীবাদী কর্মকাণ্ডের কারণ ও প্রতিকার জানার জন্য এদের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করা অপরিহার্য। কারণ ও তত্ত্ব সবদিক থেকেই আধুনিক জঙ্গীবাদ প্রাচীন জঙ্গীবাদের সাথে একই সূত্রে বাঁধা।

খারিজী সম্প্রদায় উৎপত্তি ও ইতিহাস:

ইসলামের ইতিহাসে সন্ত্রাসী উত্থানের প্রথম ঘটনা দেখা যায়, খারিজী সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডে। হিজরী ৩৫ সালে (৬৫৬ খৃ) ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান হযরত উসমান ইবনু আফফান (রা) কতিপয় বিদ্রোহীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। বিদ্রোহীদের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার মত কেউ ছিল না। তারা রাজধানী মদীনার সাহাবীগণকে এ বিষয়ে চাপ দিতে থাকে। একপর্যায়ে হযরত আলী (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মুসলিম রাষ্ট্রের সেনাপতি ও গভর্ণরগণ আলীর আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু সিরিয়ার গভর্ণর হযরত মু'আবিয়া (রা) আলীর আনুগত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি দাবি জানান যে, আগে খলীফা উসমানের হত্যাকারীদের বিচার করতে হবে। হযরত আলী বলেন, ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পূর্বে বিদ্রোহীদের বিচার শুরু করলে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে পারে, কাজেই আগে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ক্রমান্বয়ে বিষয়টি গৃহ যুদ্ধে রূপান্তারিত হয়। সিফফীনের যুদ্ধে উভয়পক্ষে হতাহত হতে থাকে। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য একটি সালিসী মজলিস গঠন করেন। এই পর্যায়ে আলীর (রা) অনুসারীগণের মধ্য থেকে কয়েক হাজার মানুষ আলীর পক্ষ ত্যাগ করেন। এদেরকে 'খারিজী' অর্থাৎ দলত্যাগী বা বিদ্রোহী বলা হয়। এরা ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় প্রজন্মের মানুষ, যারা রাসূলুল্লাহর ইন্তেকালের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। এদের প্রায় সকলেই ছিলেন যুবক। এরা ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক, সৎ ও নিষ্ঠাবান আবেগী মুসলিম। সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় ও সরাদিন যিকির ও কুরআন পাঠে রত থাকার কারণে এরা 'কুর্রা' বা 'কুরআনপাঠকারী দল' বলে সুপরিচিত ছিলেন। এরা দাবি করেন যে, একমাত্র কুরআনের আইন ও আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছুই চলবে না। আল্লাহর বিধান অবাধ্যদের সাথে লড়তে হবে। আল্লাহ বলেছেন:"মুমিনগণের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলের উপর অত্যাচার বা সীমালঙ্ঘন করলে তোমরা জুলুমকারী দলের সাথে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে" *(আল-কুরআন আল-কারীম,সূরা-আল হুজরাত,আয়াত:৯)* ।

আল্লাহ এখানে নির্দেশ দিয়েছেন যে, সীমালঙ্ঘনকারী দলের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। মু'আবিয়ার দল সীমালঙ্ঘনকারী, কাজেই তাদের আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। এ বিষয়ে মানুষকে সালিস করার ক্ষমতা প্রদান অবৈধ।

এছাড়া কুরআনুল কারীমে এরশাদ করা হয়েছে, "কর্তৃত্ব শুধুমাত্র আল্লাহরই' বা "বিধান শুধু আল্লাহরই।" *(আল-কুরআন আল-কারীম,সূরা আনআম,আয়াত:৫৭; সূরা ইউসুফ,আয়াত:৪০)* । কাজেই মানুষকে ফয়সালা করার দায়িত্ব প্রদান কুরআনের নির্দেশের স্পষ্ট লঙ্ঘন। কুরআন কারীমে আরো এরশাদ করা হয়েছে । "আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির" *(আল-কুরআন আল-কারীম, সূরা-আল মায়েদা, আয়াত:৪৪)* ।

আর আলী ও তার অনুগামীগণ যেহেতু আল্লাহর নাযিল করা বিধান মত মু'আবিয়ার সাথে যুদ্ধ না চালিয়ে, সালিসের বিধান দিয়েছেন, সেহেতু তাঁরা কাফির। তারা দাবি করেন, আলী (রা), মু'আবিয়া (রা) ও তাঁদের অনুসারীগণ সকলেই কুরআনের আইন অমান্য করে কাফির হয়ে গিয়েছেন। কাজেই তাদের তাওবা করতে হবে। তাঁরা তাঁদের কর্মকে অপরাধ বলে মানতে অস্বীকার করলে তারা তাঁদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে। তাঁরা তাঁদের মতের পক্ষে

কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উদ্ধৃত করতে থাকেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) ও অন্যান্য সাহাবী তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, কুরআন ও হাদীস বোঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পারঙ্গম হলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আজীবনের সহচর সাহাবীগণ। কুরআন ও হাদীসের তোমরা যে অর্থ বুঝেছ তা ঠিক নয়, বরং সাহাবীদের ব্যাখ্যাই সঠিক। এতে কিছু মানুষ উগ্রতা ত্যাগ করলেও বাকিরা তাদের মতকেই সঠিক বলে দাবি করেন। তারা সাহাবীদেরকে দালাল, আপোষকামী, অন্যায়ের সহযোগী ইত্যাদি মনে করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে।

সালিসি ব্যবস্থায় আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা)-এর মধ্যকার বিবাদ নিষ্পত্তিতে ব্যর্থ হওয়াতে তাদের দাবি ও প্রচারণা আরো জোরদার হয়। তারা আবেগী যুবকদেরকে বুঝাতে থাকে যে, আপোসকামিতার মধ্য দিয়ে কখনো হক্ক প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। কাজেই দীন প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআনের নির্দেশ অনুসারে জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। ফলে বছর খানেকের মধ্যেই তাদের সংখ্যা ৩/৪ হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২৫/৩০ হাজারে পরিণত হয়। ৩৭ হিজরীতে মাত্র ৩/৪ হাজার মানুষ আলীর (রা) দল ত্যাগ করেন। অথচ ৩৮ হিজরীতে নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে আলীর বাহিনীর বিরুদ্ধে খারিজী বাহিনীতে প্রায় ২৫ হাজার সৈন্য উপস্থিত ছিল।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য এদের সংগ্রাম ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। এদের কবিতা আরবী সাহিত্যে ইসলামী জযবা ও জিহাদী প্রেরণার অতুলনীয় ভাণ্ডার। এদের ধার্মিকতা ও সততা ছিল অতুলনীয়। রাতদিন নফল সালাতে দীর্ঘ সাজদায় পড়ে থাকতে থাকতে তাদের কপালে কড়া পড়ে গিয়েছিল। তাদের ক্যাম্পের পাশ দিয়ে গেলে শুধু কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজই কানে আসতো। কুরআন পাঠ করলে বা শুনলে তারা আল্লাহ ও আখিরাতের ভয়ে ও আবেগে কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে যেত। পাশাপাশি এদের হিংস্রতা ও সন্ত্রাস ছিল ভয়ঙ্কর। অনেক নিরপরাধ অযোদ্ধাসহ হাজার হাজার মুসলিমের প্রাণ নষ্ট হয় এদেরই হিংস্রতা ও সন্ত্রাসের কারণে।

৩৭ হিজরী থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এদের সন্ত্রাস, হত্যা ও যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। ৬৪-৭০ হিজরীর দিকে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর ও উমাইয়া বংশের শাসকগণের মধ্যে যুদ্ধে তারা আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরকে সমর্থন করে। কারণ তাদের মতে, তিনিই সত্যিকার ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন উসমান ও আলীকে কাফির বলে মানতে অস্বীকার করলেন এবং তাদের প্রশংসা করলেন তখন খারিজীরা তার বিরোধিতা শুরু করে।

৯৯-১০০ হিজরীর দিকে উমাইয়া খলীফা উমার ইবনু আব্দুল আযীয তাদের ধার্মিকতা ও নিষ্ঠার কারণে তাদেরকে বুঝিয়ে ভাল পথে আনার চেষ্টা করেন। তারা তাঁর সততা, ন্যায়বিচার ও ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণের বিষয়ে একমত পোষণ করে। তবে তাদের দাবি ছিল, উসমান (রা) ও আলী (রা)-কে কাফির বলতে হবে, কারণ তারা আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত বিধান প্রদান করেছেন। এছাড়া মু'আবিয়া ও পরবর্তী উমাইয়া শাসকদেরকেও কাফির বলতে হবে, কারণ তারা আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে শাসকদের মনগড়া আইনে দেশ পরিচালনা করেন। যেমন, রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, রাজকোষের সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহারে শাসকের ক্ষমতা প্রদান ইত্যাদি। উমার ইবনু আব্দুল আযীয তাদের এ দাবী না মানাতে শান্তি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁর নিজের শাসনকার্য ইসলাম সম্মত বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে।

এরা ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে 'পিউরিটান' ধারণা লালন করত। তারা মনে করত যে, ইসলামী বিধিবিধানের লঙ্ঘন হলেই মুসলিম ব্যক্তি কাফিরে পরিণত হয়। এজন্য তারা এরূপ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 'ইসলাম প্রতিষ্ঠা' বা রাজনৈতিক পর্যায়ে ইসলামী বিধিবিধান পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের বাইরে দলবদ্ধ হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধ পরিচালনা করে। পাশাপশি এই মহান উদ্দেশ্যে তারা যুদ্ধের ময়দান ছাড়া অন্যত্র গুপ্ত হত্যা করে। এছাড়া আলীকে কাফির মনে করেন না এরূপ সাধারণ অযোদ্ধা পুরুষ, নারী ও শিশুদের হত্যা করতে থাকে।

এখানে উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ সাহাবী আলী (রা) ও মু'আবিয়া (রা) এর মধ্যকার রাজনৈতিক মতবিরোধ ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন। প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন (১১০ হি) বলেন, "যখন ফিতনা শুরু হলো, তখন হাজার হাজার সাহাবী জীবিত ছিলেন। তাদের মধ্য থেকে ১০০ জন সাহাবীও এতে অংশ গ্রহণ করেন নি। বরং এতে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা ৩০ জনেরও কম ছিল।"

এ সকল সাহাবী ও অন্যান্য সাহাবী-তাবিয়ীগণ নৈতিকভাবে আলীর (রা) কাজ সমর্থন করতেন। তাকে পাপী বা ইসলামের নির্দেশ লঙ্ঘনকারী বলতে কখনোই রাজি হতেন না। খারিজীগণ এদেরকেও কাফির বলে গণ্য কাজ করতো এবং হত্যা করতো।

সাহাবী খাব্বাব ইবনুল আরাত-এর পুত্র আব্দুল্লাহ তাঁর স্ত্রী পরিজনদের নিয়ে যাচ্ছিলেন। খারিজীগণ তাঁকে উসমান (রা) ও আলী (রা) সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তিনি তাঁদের সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করেন। তখন তারা তাঁকে নদীর ধারে নিয়ে গলাকেটে হত্যা করে এবং তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী ও কাফেলার অন্যান্য নারী ও শিশুকে হত্যা করে। এসময়ে তারা একস্থানে বিশ্রাম করতে বসে। সেখানে একটি খেজুর গাছ থেকে একটি খেজুর ঝরে পড়লে একজন খারিজী তা তুলে নিয়ে মুখে দেয়। তখন অন্য একজন বলে, তুমি মূল্য না দিয়ে পরের জিনিস খেলে? লোকটি তাড়াতাড়ি খেজুরটি উগরে দেয়। আরেকজন খারিজী একটি শূকর দেখে তার দেহে নিজের তরবারী দিয়ে আঘাত করে। তখন তার বন্ধুরা প্রতিবাদ করে বলে, এতো অন্যায়, তুমি এভাবে আল্লাহর যমিনে বিশৃঙ্খলা ছড়াচ্ছ ও পরের সম্পদ নষ্ট করছ! তখন তারা শূকরের অমুসলিম মালিককে খুঁজে তাকে টাকা-পয়সা দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়।

১৭ জন সাহাবী থেকে এ ধরনের প্রায় ৫০টি পৃথক সূত্রের হাদীস রয়েছে। এসব হাদীস যদিও সর্বজনীন এবং সকল যুগেই এরূপ মানুষের আবির্ভাব হতে পারে, তবে সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ একমত যে, এ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম বাস্তবায়ন হয়েছিল খারিজীদের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে।

প্রায় অর্ধশত- হাদীস থেকে খারিজীদের কিছু কারণ ও এদের কিছু বৈশিষ্ট্য জানা যায়। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, ইয়ামান থেকে আলী (রা) মাটি মিশ্রিত কিছু স্বর্ণ প্রেরণ করেন। তিনি উক্ত স্বর্ণ ৪ জন নওমুসলিম আরবীয় নেতার মধ্যে বণ্টন করে দেন। তখন বসা চক্ষু, উচু গাল, বড় কপাল ও মুণ্ডিত চুল, যুল খুওয়াইসিরা নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে: "হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহকে ভয় করুন, আপনি তো বে ইনসাফি করলেন! তিনি বলেন, দুর্ভোগ তোমার! পৃথিবীর বুকে আল্লাহকে ভয় করার সবচেয়ে বড় অধিকার কি আমার নয়? আমি যদি আল্লাহর অবাধ্যতা করি বা বে-ইনসাফি করি তবে আল্লাহর আনুগত্য এবং ন্যায় বিচার আর কে করবে? আল্লাহ আমাকে পৃথিবীবাসীর বিষয়ে বিশ্বস্ত বলে গণ্য করলেন, আর তোমরা আমার বিশ্বস্ততায় আস্থা রাখতে পারছ না! এরপর লোকটি চলে গেল। তখন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি কি লোকটিকে কুফরী করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করব না? তিনি বলেন, না। হয়তোবা লোকটি সালাত আদায় করে। অতঃপর চলে যাওয়া ঐ ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, এই ব্যক্তির অনুগামীদের মধ্যে এমন একদল মানুষ বের হবে যারা সর্বদা সুন্দর-হৃদয়গ্রাহীভাবে কুরআন তিলাওয়াত করবে, অথচ কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তাদের সালাত দেখে তোমাদের মধ্যকার একজন মানুষ নিজের সালাতকে ঘৃণা করবে, তাদের সিয়াম দেখে তোমাদের মধ্যেকার একজন মানুষ নিজের সিয়ামকে ঘৃণা করবে। তীর যেমন শিকারের দেহ ভেদ করে বেরিয়ে চলে যায়, এরাও তেমনি ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে চলে যাবে। তারা ইসলামে অনুসারীদের হত্যা করবে এবং প্রতিমা-পাথরের অনুসারীদের ছেড়ে দেবে। আমি যদি তাদেরকে পাই, তবে আদ সম্প্রদায়কে যেভাবে নির্মুল করা হয়েছিল,

Dhaka University Institutional Repository

সেভাবেই আমি তাদেরকে হত্যা করে নির্মুল করব" (*আল-বুখারী,আল জামি আস-সহীহ,১ম সংস্করণ (কায়রো: দারু আশ-শাআব, ১৪০৭ হি/১৯৮খৃ) খ.৫:২০৭; ইবনে মুসলিম (বৈরুত:দারুল আফাক আল-জাদীদ) খ.৩:১১০)।*

মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, যুল খুওয়াইসিরা বা হুরকূস নামক এ ব্যক্তি খারিজীদের গুরুজনদের একজন ছিল।

এখানে এ ব্যক্তি ও তার অনুসারীদের বিভ্রান্তির মূল কারণটি হলো, ইসলামকে বুঝার ক্ষেত্রে নিজের উপলব্ধিকে একমাত্র সঠিক বলে মনে করা এবং এর বিপরীতে সকলকেই অন্যায়কারী বলে মনে করা। এখানে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম রাসূলুল্লাহ করেছেন। তিনি সকল যোদ্ধার মধ্যে বা প্রয়োজনের ভিত্তিতে তা বণ্টন না করে অল্প কয়েকজনকে তা দিয়েছেন। এতে তার মনে প্রশ্ন জেগেছে ।

এখানে ইসলামের নামে বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে সন্ত্রাসী কর্মের মূল একটি বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো, এরা এদের সকল সন্ত্রাসী কর্ম মূলত 'মুসলিমদের' বিরুদ্ধে পরিচালিত করে। 'মুরতাদ', 'কাফির' ইত্যাদি অভিযোগে এরা মুসলিমদেরকে হত্যা করে। হযরত আলী (রা) এবং আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) থেকে বিভিন্ন সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- "শেষ যুগে এমন একটি সম্প্রদায় আগমন করবে, যারা বয়সে তরুণ এবং তাদের বুদ্ধিজ্ঞান অপরিপক্কতা, বোকামি ও প্রগভতায় পূর্ণ। তারা সর্বোত্তম মানুষের কথা বলবে। তারা সত্য-ন্যায়ের কথা বলবে। কিন্তু তারা সত্য, ন্যায় ও ইসলাম থেকে তেমনি ছিটকে বেরিয়ে যাবে, যেমন করে তীর শিকারের দেহ ভেদ করে ছিটকে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তোমরা যখন যেখানেই তাদেরকে পাবে তখন তাদেরকে হত্যা করবে; কারণ তাদেরকে যারা হত্যা করবে তাদের জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট পুরস্কার থাকবে" (ইমাম বুখারী, আল-জামি আস-সহীহ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৪৪)।

এখানে ইসলামের নামে বা সত্য, ন্যায় ও হক্ক প্রতিষ্ঠার নামে সন্ত্রাসী কর্মে লিপ্ত মানুষদের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে:

প্রথমত, এরা অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সের। 'যুল খুওয়াইসিরা'র মত দু'চার জন বয়স্ক মানুষ এদের মধ্যে থাকলেও এদের নেতৃত্ব, সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি সবই যুবক বা তরুণদের হাতে। সমাজের বয়স্ক ,অভিজ্ঞ আলিম ও নেতৃবৃন্দের নেতৃত্ব বা পরামর্শ এরা মূল্যায়ন করে না।

দ্বিতীয়ত, এদের বুদ্ধি অপরিপক্ক ও প্রগলভতাপূর্ণ। সকল সন্ত্রাসই মূলত রাজনৈতিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। আর রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য অস্থিরতা ও অদুরদর্শিতা সন্ত্রাসী কর্মের অন্যতম কারণ। অপরিপক্ক বুদ্ধি, অভিজ্ঞতার অভাব ও দূরদর্শিতার কমতির সাথে নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধির অহঙ্কার এ সকল সত্যান্বেষী ও ধার্মিক যুবককে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করেছিল।

এদের বিদ্রোহের পরে হযরত আলী (রা) এদেরকে বুঝিয়ে রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের মধ্যে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা তাদের নির্বিচার হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত রাখলে একপর্যায়ে আলী (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে তারা পরাজিত হয় এবং অনেকে নিহত হয়। বাকিরা নতুন উদ্দীপনা নিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জমায়েত হতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, যেহেতু আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা) মুসলিম উম্মাহকে খোদাদ্রোহিতার মধ্যে নিমজ্জিত করেছেন, সেহেতু তাদেরকে গুপ্ত হত্যা করলেই জাতি এই পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার পাবে। এজন্য আব্দুর রাহমান ইবনু মুলজিম নামে একব্যক্তি ৪০ হিজরীর রামাদান মাসের ২১ তারিখে ফজরের সালাতের পূর্বে আলী যখন বাড়ি থেকে বের হন, তখন বিষাক্ত তরবারী দিয়ে তাঁকে আঘাত করে। আলীর (রা) শাহাদতের পরে তাঁর উত্তেজিত সৈন্যেরা যখন আব্দুর রাহমানের হাত পা কেটে দেয় তখন সে মোটেও দুঃখিত হলোনা, বরং আনন্দ প্রকাশ করে। কিন্তু যখন তারা তার জিহ্বা কেটে দিতে চায় তখন সে অত্যন্ত আপত্তি ও বেদনা প্রকাশ করে। তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে, আমি চাই যে, আল্লাহর যিকির করতে করতে সে শহীদ হবে।

আলীকে (রা) এভাবে গুপ্ত হত্যা করাতে আব্দুর রাহমানকে প্রশংসা করে তাদের এক কবি ইমরান ইবনু হিত্তান (মৃত্যু ৮৪ হি) বলেন, "কত মহান ছিলেন সেই নেককার মুত্তাকি মানুষটি, যিনি সেই মহান আঘাতটি করেছিলেন! সেই আঘাতটির দ্বারা তিনি আরশের অধিপতির সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই চান নি। আমি প্রায়ই তাঁর স্মরণ করি এবং মনে করি, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি সাওয়াবের অধিকারী মানুষ তিনিই।

আলী (রা) ও অন্যান্য সাহাবী এদের নিষ্ঠা ও ধার্মিকতার কারণে এদের প্রতি অত্যন্ত দরদ অনুভব করতেন। তাঁরা এদেরেকে উগ্রতার পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারা তাদের 'ব্রান্ডের' ইসলাম বা ইসলাম ও কুরআন সম্পর্কে তাদের নিজস্ব চিন্তা ও ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। আলীকে প্রশ্ন করা হয়: এরা কি কাফির? তিনি বলেন, এরা তো কুফরী থেকে বাঁচার জন্যই পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বলা হয়, তবে কি তারা মুনাফিক? তিনি বলেন, মুনাফিকরা তো খুব কমই আল্লাহর যিকির করে, আর এরা তো রাত-দিন আল্লাহর যিকিরে মশগুল। বলা হয়, তবে এরা কি? তিনি বলেন, এরা বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়ে অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছে।

বিভ্রান্তির কারণগুলো নিম্নরুপঃ

জ্ঞানের অহঙ্কার: ইসলামের ইতিহাসে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের এ ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জ্ঞানের অহঙ্কারই ছিল তাদের বিভ্রান্তির উৎস। এরূপ উগ্রতা ও সন্ত্রাসে লিপ্তদের দুটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা হচ্ছে, তারুণ্য এবং বুদ্ধির অপরিপক্কতা বা হটকারিতা। এ কারণে তারা ইসলাম বুঝার ক্ষেত্রে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজেদের বুঝকেই অধিক চূড়ান্ত মনে করত। রাসূলুল্লাহ (সা:)এর জ্ঞানী সাহাবীগণের মতামতকে অবজ্ঞা করা বা তাদের পরামর্শ গ্রহণকে তারা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করত। তাদের বুঝের বাইরে মত প্রকাশকারীদের তারা অবজ্ঞা করত।

এছাড়া তারা কুরআন বুঝার জন্য সুন্নাতের গুরুত্ব অস্বীকার করে। তারা হাদীস একেবারে অস্বীকার করত না। কখনো কখনো সাহাবীদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে তারা হাদীস শিক্ষার জন্য যেত ও প্রশ্ন করত। কিন্তু তারা ইসলামী জীবনব্যবস্থার ক্ষেত্রে কুরআনকেই যথেষ্ট বলে মনে করত। রাতদিন তারা কুরআন -এর ব্যক্তিগত কর্ম,পাঠ ও চর্চায় রত থাকত। কুরআন বুঝার জন্য রাসূলুল্লাহ ব্যাখ্যা বা হাদীসের গুরুত্ব তারা অস্বীকার করত।

শুরু থেকেই সাহাবীগণ এদের বিভ্রান্তির কারণ উপলব্ধি করেছিলেন। এজন্য তারা 'সুন্নাত'-এর মাধ্যমে তাদের বিভ্রান্তি অপনোদনের চেষ্টা করতেন। আলী (রা:) যখন আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসকে (রা) তাদের বুঝানোর জন্য পাঠান তখন তিনি বলেন, "তুমি তাদের কাছে গিয়ে তাদের সাথে আলোচনা-বিতর্কে লিপ্ত হও। তাদের সাথে কুরআন দিয়ে বিতর্ক করো না; কারণ কুরআন বিভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। বরং তুমি সুন্নাত দিয়ে তাদের সাথে বিতর্ক করবে। ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, কুরআনের জ্ঞান তাদের চেয়ে আমার বেশি, আমাদের বাড়িতেই তো কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আলী (রা) বলেন, তুমি সত্য বলেছ। তবে পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন প্রকারের অর্থ ও ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে, আমরাও কুরআনের কথা বলব এবং তারাও কুরআনের কথা বলবে। কিন্তু তুমি সুন্নাত দিয়ে তাদের সাথে বিতর্ক করবে; তাহলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করার কোনো পথ পাবে না। এসব বিভ্রান্তি হচ্ছে সন্ত্রাসী কাজকে জিহাদ মনে করার মতোই।

মুসলিমকে কাফির বলা:

খারিজীদের বিদ্রোহ, উৎপত্তি ও বিকাশের প্রথম সূত্র ছিল, কুরআন কারীমের কিছু আয়াতের আলোকে আল্লাহর বিধানমত ফয়সালা না দেওয়ার কারণে আলী ও তাঁর অনুগামীদেরকে কাফির বলা। এটিই ছিল খারিজীদের প্রথম মূলনীতি। তারা কুরআনের কিছু আয়াতের বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে দাবি করে যে, মুসলিম পাপে লিপ্ত হলে সে কাফির বা ঈমান হারা হয়ে যায়। তাদের মতে, ইসলামের অনুশাসন অনুসরণ করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কাজেই যে ব্যক্তি ইসলামের কোনো অনুশাসন লঙ্ঘন করে সে ঈমানহারা বা কাফিরে পরিণত হয়। ঈমান ও কুফরের মাঝে আর কোনো মধ্যম অবস্থা নেই। কাজেই যার ঈমানের পুর্ণতা নষ্ট হবে সে কাফিরে পরিণত হবে।

এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, অনেক বিষয় আছে যা কুরআন ও হাদীসের আলোকে স্পষ্টতই পাপ। যেমন, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মিথ্যাচার ইত্যাদি। খারিজীগণ শুধু এগুলোকে কুফরী বলে গণ্য করেনি। উপরন্তু, তাদের মতের বিপরীত রাজনৈতিক কর্ম বা সিদ্ধান্তকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে 'পাপ' বলে গণ্য করেছে, এরপর তারা সেই পাপকে কুফরী বলে গণ্য করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কাফির আখ্যা দিয়েছে। প্রকৃত পক্ষে ,খারিজীগণের কাফির-বলাকে মূল ভিত্তি 'পাপ' নয়, বরং 'রাজনৈতিক মতাদর্শ' । তারা তাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী নয় এমন সকল মুসলিমকে কাফির বলে গণ্য করত।

কাফির হত্যার ঢালাও বৈধতা চাওয়া:

কাউকে কাফির বলে গণ্য করা, আর তাকে হত্যা করা কখনোই এক বিষয় নয়। একমাত্র যুদ্ধরত কাফির ছাড়া অন্য কাউকে হত্যা করার কোনো অনুমতি ইসলামে নেই। কিন্তু খারিজীরা সাহাবীগণ ও সাধারণ মুসলিমদেরকে কাফির বলেই থেমে থাকেনি, তারা তাদের নির্বিচারে হত্যা করার বৈধতা দাবি করেছে। তারা মুসলিম দেশগুলোকে 'দারুল কুফর' বা অনৈসলামিক রাষ্ট্র বলে গণ্য করেছে এবং এ সকল দেশের নাগরিকদেরকে ঢালাওভাবে হত্যা ও লুণ্ঠন করার বৈধতা ঘোষণা করেছে। তবে এক্ষেত্রে তারা অমুসলিম নাগরিকদের হত্যা থেকে সাধারণত বিরত থেকেছে।

রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় আনুগত্য সম্পর্কে অস্বচ্ছ ধারণা:

বিচ্ছিন্ন গোত্র কেন্দ্রিক আরব ইসলামের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সমাজকে বিশ্বের সর্বপ্রথম আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে আনেন। আরবরা রাষ্ট্রিয় আনুগত্য বুঝতো না। তারা বুঝতো কবীলা বা গোত্র প্রধানের আনুগত্য। বিচ্ছিন্নভাবে ছোট বা বড় গোত্রের অধীনে তারা বাস করত। গোত্রের বাইরে কারো আনুগত্য বা অধীনতাকে তারা অবমাননাকর বলে মনে করত। এছাড়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ, স্বাধীনতাবোধ ইত্যাদি তাদেরকে তাদের মতের বাইরে সকল সিদ্ধান্ত অমান্য করতে প্রেরণা দিত।

এই বিচ্ছিন্ন জাতিকে প্রথমবারের মত রাসূলুল্লাহ কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসেন। তিনি এজন্য বারবার তাদেরকে রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের মধ্যে অবস্থান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় ঐক্য বা 'আল-জামা'আত', রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য বা 'আল-ইমাম', বা 'আল-আমীর' রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের শপথ বা 'বাইয়াত' ইত্যাদির বিষয়ে তাঁর অগণিত সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য বর্জন করা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা করা, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বাইরে বা রাষ্ট্রহীনভাবে বাস করাকে তিনি জাহিলী জীবন ও এই প্রকারের মৃত্যুকে জাহিলী মৃত্যু বলেছেন। পছন্দ হোক বা না হোক রাষ্ট্রের আনুগত্য করতে হবে। কোন অবস্থাতেই এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। প্রয়োজনে রাষ্ট্র প্রধানকে সৎকাজে আদেশ, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ ও সংশোধন করতে হবে। কিন্তু বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ ও হানাহানি তিনি কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন।

'ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের নিষেধ'-এর নামে শক্তিপ্রয়োগ করে খারিজীরা রাষ্ট্রদ্রোহিতায় লিপ্ত হয়। এছাড়া তারা রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তাও বুঝতে অক্ষম হয়। তারা শুধু বলতো 'কর্তৃত্ব বা বিধান কেবলমাত্র আল্লাহরই' এদ্বারা তারা বুঝাতো, আল্লাহ ছাড়া কোনো শাসন বা কতৃত্ব চলবে না। আল্লাহর বিধান যে যেভাবে বুঝবে সেভাবে পালন করবে।

এজন্য তাদের এই বক্তব্যের প্রতিবাদে আলী (রা) বলেন, "তারা একটি সঠিক কথাকে ভুল অর্থে প্রয়োগ করছে। তারা বলছে 'আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান নেই বা কর্তৃত্ব নেই। কিন্তু তারা বুঝাচ্ছে যে, আল্লাহ ছাড়া কারো শাসন নেই। কিন্তু মানুষের জন্য তো পুণ্যবান বা পাপী একজন শাসক প্রয়োজন। তার শাসনাধীনে মুমিন কর্ম করবে এবং পাপীও নাগরিক অধিকার ভোগ করবে। এভাবেই আল্লাহর নির্ধারিত সময় পূর্ণ হবে। যিনি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা

Dhaka University Institutional Repository

করবেন, জনগণের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন এবং সবল থেকে দুর্বলের অধিকার আদায় করবেন। এভাবে সৎ মানুষেরা শান্তি পাবে এবং অপরাধীরা দমিত হবে" ।

এভাবে প্রথমে খারিজীরা রাষ্ট্র, রাষ্ট্রপ্রধান ইত্যাদির কোনো গুরুত্ব স্বীকার করত না। পরবর্তীতে কেউ কেউ তাদেরকে রাষ্ট্র, ইমাম, বাইয়াত ইত্যাদির গুরুত্বের বিষয়ে বললে তারা তাদের মধ্য থেকে একজনকে 'আমীর' বা ইমাম বলে 'বাইয়াত' করে নেয়। এভাবে তারা রাষ্ট্রীয় পরিভাষাগুলিকে 'দলের' ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্র বিষয়ে তাদের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদের জন্ম নেয়।

জিহাদকে ইসলামের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য বলে গণ্য করা:

কুরআন-হাদীসের অগণিত স্থানে জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং জিহাদের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। কাফিরদের সাথে যুদ্ধ ছাড়াও মুসলিম-অমুসলিম সকলের মধ্যে 'সৎকাজে আদেশ ও অন্যায় কাজে নিষেধ করতে' নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভ্রান্তির ফলে খারিজী রাষ্ট্রীয় ফরয ও ব্যক্তিগত ফরযের মধ্যে কোনো পার্থক্য করত না। তারা জিহাদ ও 'আদেশ নিষেধ' বিষয়ক কুরআনী নির্দেশনার আলোকে প্রচার করে যে, জিহাদ ও আদেশ-নিষেধ ইসলামের রুকন ও ব্যক্তিগতভাবে পালন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।

"The second principle that flowed from their aggressive idealism was militancy, or jihād, which the Khawārij considered to be among the cardinal principles, or pillars, of Islām. Contrary to the orthodox view, they interpreted the Qurānic command about 'enjoining good and forbidding evil' to mean the vindication of truth through the sword"… "To these five, the Khawārij sect added a sixth pillar, the jihād"

খারিজীদের আগ্রাসী আদর্শবাদের দ্বিতীয় ভিত্তি ছিল জঙ্গীবাদ বা জিহাদ। খারিজীরা জিহাদকে ইসলামের মূল ভিত্তি বা রুকন বলে মনে করে। সাধারণ মুসলিমদের মতের বিপরীতে খারিজীগণ কুরআন নির্দেশিত 'সৎকাজে আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ' বলতে তরবারীর জোরে সত্য প্রতিষ্ঠা বুঝাতো। তারা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের সাথে জিহাদকে ষষ্ঠ স্তম্ভ হিসেবে যুক্ত করে।"

প্রকৃতপক্ষে তারা 'জিহাদ'-কে ইসলামের সবচেয়ে বড় রুকন মনে করত। এরপর 'জিহাদের' নামে ইসলাম নিষিদ্ধ খুনখারাবীতে লিপ্ত হতো। এটিই ছিল তাদের কঠিন ও ভয়ঙ্করতম বিভ্রান্তি।

কোনো মুসলিমকে কাফির বলা কঠিন বিভ্রান্তি। তা সন্ত্রাসের পথ উন্মুক্ত করে। ঢালাওভাবে যোদ্ধা-অযোদ্ধা সকল কাফিরকে হত্যা করা বৈধ বলে মনে করা কঠিন বিভ্রান্তি। তা সন্ত্রাসের পথে দ্বিতীয় পদক্ষেপ। আর ব্যক্তিগতভাবে বা দলগতভাবে জিহাদ পরিচালনা করা, কাফিরকে হত্যা করা বা শাস্তি দেওয়ার বৈধতা দাবি করা সন্ত্রাসের পথে চূড়ান্ত পদক্ষেপ।

ইসলাম এই তিনটি পথই চূড়ান্তভাবে রোধ করেছে। মুসলিমকে কোনো কারণে কাফির বলা কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। বিচারের মাধ্যমে অপরাধীকে এবং যুদ্ধের ময়দানে যোদ্ধা পুরুষ ছাড়া অন্য কোনো কাফিরকে হত্যা করা কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। যুদ্ধ ও বিচারকে একান্তভাবেই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে। যেন কেউ কখনো ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিকে কাউকে শাস্তি দিতে বা হত্যা করতে না পারে। পাশাপাশি জাতি,ধর্ম,বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রাণ, সম্পদ ও মর্যাদার ক্ষতি করাকে কঠিন হারাম বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। যেন অন্তত আখেরাতের শাস্তির ভয় মানুষকে আবেগতাড়িত হয়ে জানমালের ক্ষতি করা থেকে বিরত রাখতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

খারিজীদের বিভ্রান্তি দূর করতে সাহাবীদের প্রচেষ্টা:

হযরত আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) ও অন্য কয়েকজন সাহাবী খারিজীদের সামনে তাদের মতামতের বিভ্রান্তি তুলে ধরার চেষ্টা করেন। অনেকে এ প্রচেষ্টায় সংশোধিত হলেও অন্য অনেকেই তাদের উগ্রতা পরিত্যাগ করতে অসম্মত হয়। এর মূল কারণ ছিল, কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের পারঙ্গমতার বিষয়ে তাদের অহঙ্কার।

বস্তুত, কুরআনের বাস্তব প্রয়োগ রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সুন্নাত। আর সুন্নাতের আলোকেই কুরআনের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা সম্ভব। পরবর্তী প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ সাহাবীগণ এভাবে সুন্নাতের আলোকে খারিজীদের উন্মাদনা রোধের চেষ্টা করেছেন। প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থসমূহে সংকলিত হাদীসের আলোকে দেখা যায় যে, সাহাবীগণ মূলত তাদের 'জিহাদ' কেন্দ্রিক বিভ্রান্তিগুলি অপনোদনের চেষ্টা করেছেন। জিহাদ-কিতাল বিষয়ক আয়াতগুলির আলোকে খারিজীগণ জিহাদ, দীনপ্রতিষ্ঠা ও ফিতনা দূরীকরণকে দীনের রুকন বা অন্যতম ফরয বলে গণ্য করে। এভাবে তারা বিভিন্নমুখি বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়। তাদের মানসিকতা ছিল, সমাজের অন্য মানুষের জীবনে 'দীন' প্রতিষ্ঠা না হলে বোধ হয় নিজের দীন পালন মূল্যহীন হয়ে গেল। সাহাবীগণ সুন্নাতের আলোকে তাদের এই বিভ্রান্তি সংশোধনের চেষ্টা করেন। তাবিয়ী নাফি বলেন, একব্যক্তি (খারিজী নেতা নাফি' ইবনুল আযরাক) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের (রা) নিকট এসে বলে, হে আবূ আব্দুর রাহমান, কি কারণে আপনি এক বছর হজ্জ করেন আরেক বছর উমরা করেন এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পরিত্যাগ করেন? অথচ আপনি জানেন যে, আল্লাহ জিহাদের জন্য কী পরিমাণ উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন? তখন আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, ভাতিজা, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের উপর। আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের রামাযানের সিয়াম, যাকাত প্রদান ও বাইতুল্লাহর হজ্জ। ঐ ব্যক্তি বলে, হে আবূ আব্দুর রাহমান, আল্লাহ তাঁর কিতাবে কী উল্লেখ করেছেন তা কি আপনি শুনছেন না? তিনি বলেছেন: 'মুমিনগণের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলের উপর অত্যাচার বা সীমলঙ্ঘন করলে তোমরা জুলুমকারী দলের সাথে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।' (তিনি আরো বলেছেন) এবং তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাবৎ ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হয় (ইমাম বুখারী,আল-জামি আস-সহীহ, প্রাগুক্ত, খ.৯:৩২)।

এখানে ইবনু উমার (রা)-এর বক্তব্য থেকে কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়।

প্রথমত, শুধু ফযীলত, নির্দেশনা বা প্রেরণামূলক আয়াত ও হাদীসের ভিত্তিতে কোনো ইবাদতের গুরুত্ব নির্ধারণ করা যায় না। কুরআন কারীম ও রাসূলুল্লাহ -এর সামগ্রিক শিক্ষার আলোকেই তা নির্ধারণ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, কুরআন কারীমে সালাত, সিয়াম, যাকাত, জিহাদ, দাওয়াত, আদেশ, নিষেধ ইত্যাদি অনেক ইবাদতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এগুলির মধ্যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ন এবং কোনটি কম গুরুত্বপূর্ণ, কোনটি ব্যক্তিগত এবং কোনটি সামষ্টিগত, কোনটি সকলের জন্য সার্বক্ষণিক পালনীয়, কোনটি বিশেষ অবস্থায় পালনীয় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয় নি। এ সকল কুরআনী নির্দেশ যিনি গ্রহন করেছেন, তাঁর বাস্তব প্রয়োগ ও বাণী থেকেই এ সকল বিষয় বিস্তারিত জানা যায়।

কুরআনে উল্লিখিত রাসূলুল্লাহ সকল নির্দেশের মধ্যে এই পাঁচটি কর্ম সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপর্ণ এবং এগুলির উপরেই দীনের ভিত্তি। জিহাদ, দাওয়াত, আদেশ-নিষেধ, দীন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ইবাদতের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবে সেগুলো পালনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অবস্থার আলোকে ছাড়ের সুযোগ আছে। যেমন পিতামাতার খিদমত বা আনুসঙ্গিক প্রয়োজনের জন্য জিহাদ পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত, রাষ্ট্র, সমাজ ও অন্য মানুষের জীবনে দীন প্রতিষ্ঠাকে নিজের ব্যক্তি জীবনে দীন প্রতিষ্ঠার মত একই পর্যায়ের ইবাদত বলে মনে করা, অথবা তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা উগ্রতা ও সন্ত্রাসের কারণ। এই উগ্রতা বিভিন্ন বিভ্রান্তির পথে পরিচালিত করে, যেমন, অন্যান্য মুমিনের বা রাষ্ট্রের পাপ অন্যায় দূর করতে ব্যর্থ হয়ে তাদেরকে কাফির বলা, সমাজের মানুষদেরকে ঘৃণা করতে শুরু করা, জোর করে মানুষকে সংশোধনের চেষ্টা করা, নিজের জীবনে ইবাদত বা তাহাজ্জুদ, যিকির, ক্রন্দন ইত্যাদিতে অবহেলা করা।

ইসলাম ধর্ম ও সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বকে নিয়ে ইসলাম একটি সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা। তবে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাভাবিক পার্থক্য রক্ষা করা হয়েছে ইসলামে। রাষ্ট্র ব্যবস্থাসহ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছাড়া সব দেশের সকল সমাজের মানুষদের জন্য পালনীয় প্রশস্ততা রয়েছে ইসলামে। মুসলিম-অমুসলিম সকল দেশ ও সমাজে বসবাস করে একজন মুসলিম তার ধর্ম পালন করতে পারেন। রাষ্ট্র ব্যবস্থা ইসলামের একটি অংশ। ইসলামে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান আছে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র যে কোনো ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যবস্থা লঙ্ঘিত হলে সুযোগ ও সাধ্যমত কুরআন নির্দেশিত উত্তম আচরণ দ্বারা খারাপ আচরণের প্রতিরোধ পদ্ধতিতে দাওয়াত, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের মাধ্যমে তা সংশোধন ও পরিবর্তনের চেষ্টা করবেন। তবে এই চেষ্টা সফল না হলে মুমিনের দ্বীন-পালন ব্যাহত হয় বা সমাজ ও রাষ্ট্রের পাপের কারণে ব্যক্তি মুমিন পাপী হন এরূপ চিন্তা বিভ্রান্তিকর। মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন, "হে মুমিনগণ, তোমাদের উপরে শুধু তোমাদের নিজেদেরই দায়িত্ব। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তাহলে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না" (আল-কুরআন আল-কারীম, সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ১০৫)। কাজেই পরিবর্তনের আগ্রহে কোনো মানুষের জান, মাল, সম্মান ইত্যাদির ক্ষতি করা বা অন্য কোনো ইসলাম নিষিদ্ধ পাপের মধ্যে নিপতিত হওয়া চরম বিভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নয়। ইবনু উমার নিজেও কাফির রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন। তবে জিহাদের অনেক শর্ত রয়েছে, সেগুলির অন্যতম যে, জিহাদ শুধু যুদ্ধরত কাফিরের বিরুদ্ধেই হবে। মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক মুসলিম বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যদিও বৈধ করা হয়েছে, কিন্তু ইবনু উমার (রা) ও অন্যান্য অধিকাংশ সাহাবী এক্ষেত্রে দূরে থাকাই পছন্দ করতেন, কারণ ভুল জিহাদে কোনো মুসলিমকে হত্যা করার চেয়ে, সঠিক জিহাদ থেকে বিরত থাকা উত্তম।

তৃতীয়ত, তাঁরা ফিতনা দূরীকরণ ও আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মুসলিমের দীন পালনের নিরাপত্তাটিই মূল বলে মনে করেছেন। মুসলিম যতক্ষণ দীন পালনের নিরাপত্তা ভোগ করছেন ততক্ষণ ফিতনা দূরীভূত করার নামে যুদ্ধ করার সুযোগ নেই। বরং দাওয়াত, আদেশ, নিষেধ ইত্যাদির মাধ্যমে সমস্যা দূর করার চেষ্টা করতে হবে।

যে সকল সাহাবী খারিজীদের বুঝাতে চেষ্টা করেন তাঁদের একজন জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ (৬০ হি) একবার তিনি 'কুর্রা' বা সদাসর্বদা কুরআন তিলাওয়াত ও চর্চায় লিপ্ত এ সকল খারিজীদের কতিপয় নেতাকে ডেকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন- "যে ব্যক্তি কাঠিন্য বা উগ্রতার পথ অবলম্বন করবে আল্লাহও তার জন্য কাঠিন্য বা উগ্রতার পথ অবলম্বন করবেন। কেউ যদি কোনো মানুষের হাতের তালুতে রাখার মত সামান্য রক্তও প্রবাহিত করে (যেন যে মুরগী জবাই করছে) তবে সেই রক্ত তার ও জান্নাতের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে (সে জান্নাত দেখতে পাবে, কিন্তু সেই রক্ত তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দিবে না) কাজেই যদি কেউ পারে এরূপ রক্তপাত থেকে আত্মরক্ষা করতে, তবে সে যেন আত্মরক্ষা করে" (ইমাম বুখারী, আল-জামি আস-সহীহ, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৮০)।

এ কথা শুনে উপস্থিত লোকজন খুব কাঁদতে লাগল। তখন জুনদুব (রা) বলেন, এরা যদি সত্যবাদী হয়, তবে এরা মুক্তি পেয়ে যাবে।.. কিন্তু পরে আবার তারা উগ্রতার পথে ফিরে যায়।

এখানে জুনদুব (রা) দুটি বিষয়ের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত, উগ্রতার ভয়াবহতা। উগ্রতার দুটি দিক রয়েছে। প্রথম দিক, নিজের ব্যক্তিগত জীবনে দীন পালনের জন্য নফল-মুস্তাহাব ইত্যাদি বিষয়ে অতি কষ্টদায়ক রীতি অনুসরণ করা। দ্বিতীয় দিক, অন্য মানুষদের ভুলভ্রান্তি সংশোধনকে নিজের অন্যতম বোঝা বলে গ্রহণ করা এবং সেজন্য উগ্রতার পথ অবলম্বন করা। দুটি বিষয়ই সুন্নাতের পরিপন্থী, যা মুমিনের জীবনে দীন পালনকে কঠিন করে তোলে।

দ্বিতীয়ত, তিনি সুন্নাতের আলোকে জিহাদ বনাম হত্যার ভয়াবহতা তুলে ধরছেন এবং জিহাদের নামে হত্যা বা রক্তপাতের ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সালাত, সিয়াম, যিকির ইত্যাদি ইবাদতের মত ইবাদত নয় জিহাদ। এ সব ইবাদত যদি কোনো কারণে ভুল হয় তবে তাতে ইবাদতকারী কঠিন পাপের মধ্যে নিপতিত হয় না। পক্ষান্তরে জিহাদ বিচারের মত বান্দার হক জড়িত ইবাদত। ইসলামের মূলনীতি এই যে, বিচারকের ভুলে নিরপরাধীর সাজা হওয়ার চেয়ে অপরাধীর বেঁচে যাওয়া বা সাজা কম হওয়া ভাল।

অনুরূপভাবে জিহাদের নামে ভুল মানুষকে হত্যা করার চেয়ে জিহাদ না করা অনেক ভাল। জিহাদের নামে ভুল মানুষকে হত্যা করলে শত পুন্য করেও জান্নাত থেকে বঞ্চিত হতে হবে। পক্ষান্তরে সাধারণভাবে আজীবন জিহাদ না করলেও এইরূপ শাস্তিলাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। বিশেষত জিহাদের গুরুত্ব অনুধাবন করা সত্ত্বেও জিহাদের শর্ত না পাওয়ার কারণে জিহাদ বর্জন করলে কোনোরূপ গোনাহ হবে বলে কুরআন বা হাদীসে কোথাও উল্লেখ করা হয় নি।

এখানে লক্ষণীয় যে, জ্ঞান ও অনুভূতি আসার পরেও তারা উগ্রতা পরিত্যাগ করতে পারল না। এর কারণ সম্ভবত এদের মধ্যে সকলেই সৎ ও আন্তরিক ছিল না। এ সকল সন্ত্রাসী কর্মের মাধ্যমে নেতৃত্ব, ক্ষমতা, সম্পদ ও অন্যান্য জাগতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যও অনেকের ছিল। অথবা উগ্রতার উন্মাদনা ও সঙ্গীসাথীদের অপপ্রচার তাদেরকে আবারো বিপথগামী করে।

বিভিন্ন হাদীসের আলোকে দেখা যায় যে, তারা মনে করতেন, যারা সংঘাতে লিপ্ত তারা তাদের উদ্দেশ্য ও কর্মের আলোকে ভাল বা মন্দ বলে গণ্য হবেন। তবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে রাজনৈতিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়া জরুরী নয়। কিন্তু হারাম থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। অন্যদিকে খারিজীগণ এবং তাদের মত আবেগীগণ মনে করত, এই সংঘাতের মধ্যেই 'ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে কাজেই 'ইসলাম প্রতিষ্ঠার' এই মহান উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কিছু মানুষ হত্যা করা কোনো ব্যাপার নয়। বিশেষত যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে বাধা হয়েছে তাদেরকে হত্যা করতে অসুবিধা কী? ৭৩ হিজরীতে হাজ্জাজ ইবনু ইউসূফ যখন মক্কা অবরোধ করে ইবনু যুবাইরের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক আক্রমন চালাতে থাকে, তখন দুই ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা)-এর নিকট এসে বলে-

"মানুষেরা ফিতনা-ফাসাদে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আপনি ইবনু উমার, রাসূলুল্লাহ -এর সাহাবী, আপনি কেন বেরিয়ে যুদ্ধে অংশ নিচ্ছেন না? তিনি বলেন, কারণ আল্লাহ আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছেন। তারা বলে, আল্লাহ কি বলেন নি, 'এবং তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাবৎ ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়'? তখন তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধ করেছিলাম এবং ফিতনা দূরীভূত হয়েছিল এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর তোমরা চাচ্ছ যে, তোমরা যুদ্ধ করবে যেন ফিতনা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দীন আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য হয়।" (ইমাম বুখারী, আল-জামি আস-সহীহ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩২) ।

এখানে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) প্রথমত, জিহাদের আদেশ ও হত্যার নিষেধাজ্ঞার মধ্যে তুলনা করছেন। ইসলামের মূলনীতি আদেশ পালনের চেয়ে নিষেধ বর্জন অগ্রগণ্য। বিশেষত এ ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কর্মটি কুরআন-হাদীসে বারবার ভয়ঙ্করতম কবীরা গোনাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে জিহাদের বারবার আদেশ করা হলেও তার জন্য অনেক শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে ফরয আইন বলে কোথাও উল্লেখ করা হয় নি এবং তা পরিত্যাগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কাজেই পরিত্যাগযোগ্য একটি কর্ম পালনের জন্য মুমিন কখনোই ভয়ঙ্করতম একটি হারামে লিপ্ত হতে পারেন না।

দ্বিতীয়ত, তিনি 'জিহাদ-কিতাল' ও 'ফিতনা' বা সন্ত্রাসের মধ্যে পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সাহাবীগণ যে কিতাল করেছিলেন তা ছিল ফিতনা রোধ করতে, আর খারিজীগণ যে কিতাল করছে তা ফিতনা প্রতিষ্ঠার জন্য। তিনি এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্যের কারণ উল্লেখ করেন নি। আমরা পরবর্তী আলোচনা থেকে দেখতে পাব যে, ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ ও ফিতনা বা সন্ত্রাসের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য যে, জিহাদ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত যুদ্ধ এবং ফিতনা-সন্ত্রাস ব্যক্তি বা গোষ্ঠি পরিচালিত যুদ্ধ। কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা অনুসারে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশে ও নেতৃত্বেই জিহাদ-কিতাল পরিচালিত হবে। খারিজীগণ বিষয়টিকে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠিগত পর্যায়ে নিয়ে এসে সন্ত্রাসের জন্ম দেয়। বস্তুত, হত্যা, বিচার, শক্তিপ্রয়োগ ইত্যাদি বিষয় যদি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত না হয় তবে তা ফিতনার মহাদ্বার উন্মোচন করে। পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষই অন্য কোনো না কোনো মানুষের দৃষ্টিতে অন্যায়কারী ও অপরাধী। প্রত্যেক ব্যক্তি বা গোষ্ঠি যদি নিজের মতমত বিচার, যুদ্ধ ও শক্তিপ্রয়োগ করতে থাকে তবে তার চেয়ে বড় ফিতনা আর কিছুই হতে পারে না।

বাতিনী সম্প্রদায় উৎপত্তি ও ইতিহাস:

শিয়া সম্প্রদায়ের অনেক উপদলের একটি হচ্ছে 'বাতিনী' সম্প্রদায়। শিয়াগণ ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা 'ইমামত' বংশতান্ত্রিক বলে বিশ্বাস করে। তাঁদের মতে রাসূলুল্লাহ উভয়বিধ নেতৃত্ব আলী (রা)-এর প্রাপ্য ছিল। এরপর তা তাঁর বংশধরদের মধ্যেই থাকবে। এই নেতৃত্ব বা ইমামতকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে অনেক দল উপদল সৃষ্টি হয়েছে। অধিকাংশ শিয়া বিশ্বাস করেন যে, আলী বংশের ৬ষ্ঠ ইমাম জা'ফার সাদিকের (১৪৮ হি) পরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মূসা কাযিম (১৮৩ হি) ইমামতি লাভ করেন। একটি উপদল মনে করে যে, জা'ফার সাদিকের জৈষ্ঠ্য পুত্র ইসমাঈল (১৪৮ হি) ছিলেন প্রকৃত ইমাম। তাঁর পরে এই ইমামত তাঁর সন্তানদের মধ্যে থাকে। এদেরকে ইসমাঈলিয়া বাতিনীয়া সম্প্রদায় বলা হয়।

'বাতিনীয়া' সম্প্রদায়ের মতামতের মূল ভিত্তি ধর্মের নির্দেশাবলীর 'বাতিনী' বা গোপন ব্যাখ্যা। তাঁদের মতে কুরআনের বা ইসলামের নির্দেশাবলীর দুটি অর্থ রয়েছে। প্রথমত বাহ্যিক বা যাহিরী অর্থ। এই অর্থ সকলেই বুঝতে পারে। আর দ্বিতীয় অর্থ বাতিনী বা গোপন অর্থ। এ অর্থ শুধু আলী বংশের ইমামগণ বা তাদের খলীফা বা প্রতিনিধিগণ জানেন। আর এই গোপন অর্থই 'হাকীকত' বা ইসলামের মূল নির্দেশনা।

এ মূলনীতির ভিত্তিতে বাতিনী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নেতা তাদের সুবিধামত কুরআনের নির্দেশাবলী ব্যাখ্যা করতেন। ঈমান, সালাত, সিয়াম, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি ইবাদতের মনগড়া ব্যাখ্যা করে তারা সেগুলো বাতিল করেন। মদ, ব্যভিচার, ইত্যাদি পাপের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে তারা সেগুলি বৈধ করে দেন। তাঁদের অনুসারীগণ তাদের এ সকল ব্যাখ্যা ভক্তিভরে মেনে নিতেন। আবার তাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে এ সকল ব্যাখ্যার বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিভিন্ন উপদল গড়ে উঠত।

তৃতীয়-চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে ইয়েমেন ইরাক, মরক্কো, মিসর ইত্যাদি অঞ্চলে ইসমাইলীয় বাতিনী শিয়াগণ 'কারামিতা', ফাতিমিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন নামে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এরা যেহেতু ইসলামের নির্দেশনাগুলিকে নিজেদের মতামত ব্যাখ্যা করত সেহেতু এরা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য প্রয়োজনমত সন্ত্রাস, নির্বিচার হত্যা, গুপ্ত হত্যা ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করত। তাদের অনুসারীরা বিনা যুক্তিতে তাদের আনুগত্য করত। এ সকল সন্ত্রাসীদের অন্যতম ছিল হাশাশিয়া নিযারিয়া বাতিনী সম্প্রদায়। যারা পঞ্চম-ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বে সন্ত্রাস ও গুপ্ত হত্যার অপ্রতিরোধ্য ধারা সৃষ্টি করে।

হাসান ইবনু সাবাহ নামোক এক ইরানী নিজেকে ইসমাঈলীয়া ফাতিমীয়া শিয়া মতবাদের ইমাম ও মিসরের শাসক মুসতানসির বিল্লাহ (৪৮৭ হি)-এর জৈষ্ঠ্য পুত্র নিযার-এর খলীফা ও প্রতিনিধি বলে দাবি করেন। তিনি প্রচার করেন যে, বুদ্ধি, বিবেক বা যুক্তি দিয়ে কুরআন ও ইসলামের নির্দেশ বুঝা সম্ভব নয়। কুরআনের সঠিক ও গোপন ব্যাখ্যা বুঝতে শুধু নিষ্পাপ ইমামের মতামতের উপরেই নির্ভর করতে হবে। আর সেই ইমাম লুক্কায়িত রয়েছেন। তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে হাসান নিজে কাজ করছেন। তিনি তার ভক্তদের মধ্যে একদল জানবায ফিদায়ী তৈরি করেন। যারা তার নির্দেশে তাৎক্ষণিকভাবে আত্মহনন সহ যে কোনো কর্মের জন্য প্রস্তুত থাকত। এদের মাধ্যমে তিনি উত্তর পারস্যে আলবুর্জ পর্বতের দশ হাজার কুড়ি ফুট উচ্চ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যরাজি পরিপূর্ণ উপত্যাকায় 'আল-মাওত' নামক এক দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করে সেখান তার রাজনৈতিক কেন্দ্র স্থাপন করেন। সেখান থেকে তিনি তার ধর্মীয়-রাজনৈতিক প্রচারণা চালাতে থাকেন। তার প্রচারিত 'ধর্মীয়-রাজনৈতিক' আর্দশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাকেই তিনি শত্রু মনে করতেন তাকে গুপ্ত হত্যা করার নির্দেশ দিতেন। ইসলামের ইতিহাসে ধর্মের নামে বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ঢালাও গুপ্তহত্যা এভাবে আর কোনো দল করে নি। এসকল দুর্ধর্ষ আত্মঘাতী ফিদায়ীদের হাতে তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ উযির নিযামুল মুলক, প্রসিদ্ধ আলিম নজুমুদ্দীন কুবরা সহ অনেক মুসলিম নিহত হন। পার্শবর্তী এলাকা ও দেশগুলিতে গভীর ভীতি ও সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কারণ কেউই বুঝতে পারতেন না যে, এসকল ফিদাঈদের পরবর্তী টার্গেট কে। হাসানের পরে তার বংশধরেরা আল-মাওত দূর্গ থেকে ফিদাঈদের মাধ্যমে তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। তৎকালীন মুসলিম সরকারগণ এদের দমনে অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে ৬৫৪ হিজরীতে (১২৫৬ খৃ:) হালাকু খার বাহিনী এদের নির্মূল করে।

খারিজী ও বাতিনী সম্প্রদায়ের কর্মকান্ডের তুলনামূলক আলোচনা:

ইসলামের ইতিহাসের প্রাচীন দুটি সংগঠনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মধ্যে মৌলিক তিনটি পার্থক্য দেখা যায়: প্রথমত, খারিজীরা মুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতো। যুদ্ধ ছাড়াও তারা মুসলিম জনবসতির উপর আক্রমন করতো এবং অযোদ্ধা পুরুষ, নারী ও শিশুদের হত্যা ও লুটপাট করতো। তবে সাধারণত তারা গুপ্ত হত্যার আশ্রয় নিতো না। তাদের দৃষ্টিতে "ইসলামের শত্রু" বাহিনীর প্রধান হিসেবে আলী (রা), মুআবিয়া (রা) এবং উমর ইবনুল আসকে (রা) গুপ্তহত্যা করার পরিকল্পনা তারা গ্রহণ করে এবং আলীর (রা) ক্ষেত্রে তারা সফল হয়। তবে অযোদ্ধা মানুষদের কখনো গুপ্ত হত্যা করেছে বলে জানা যায়নি। বাতিনী সম্প্রদায়ের মূল পদ্ধতিই ছিল গুপ্ত হত্যা। এ কারণেই বাতিনীদের কর্মকাণ্ড সমাজে গভীর ভীতি ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। খারিজীদের আক্রমণ থেকে পালিয়ে বাঁচার কিছু সম্ভাবনা থাকলেও বাতিনীদের গুপ্ত হত্যা থেকে আত্মরক্ষার কোনো পথ মানুষ খুঁজে পেত না।

দ্বিতীয়ত, খারিজীরা ইসলামের বাহ্যিক ও পরিপূর্ণ অনুসরণের ক্ষেত্রে আপোসহীন ছিল। বিজয় লাভের জন্য ইসলামে নিষিদ্ধ কোনো কাজ তারা করত না। এজন্য তাদের মধ্যে আত্মহত্যা, আত্মঘাতী হামলা ইত্যাদির কোনো ঘটনা দেখা যায়নি। আব্দুর রাহমান ইবনু মুলজিম হযরত আলীকে (রা:) হত্যা করে ধরা দিয়েছে, কিন্তু আত্মহত্যার চেষ্টা করেনি। কারণ নিজের হাতে নিজের জীবন নষ্ট করা আত্মহত্যা ও কঠিন পাপ বলে কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, আর শত্রুর হাতে শহীদ হওয়াকে শাহাদত ও জান্নাতের কারণ। অন্যদিকে বাতিনী ফিদাঈগণ যে কোনোভাবে ইমামের নির্দেশমত জীবন দান করাকেই জান্নাতের পথ বলে বিশ্বাস করত, আত্মহত্যা বা অপরের হাতে হত্যার মধ্যে তারা পার্থক্য করতো না।

তৃতীয়ত, খারিজীরা কখনোই নিজেদের আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য গোপনীয়তা বা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করত না। তারা নিজেদের বিশ্বাস ও কর্মের কথা স্পষ্টভাবেই প্রচার করতো। আর বাতিনী সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডের ভিত্তিই ছিল গোপনীয়তা ও মিথ্যা। তারা সর্বদা নিজেদের মতবাদ গোপন রেখে সমাজের মানুষদের সাথে মত, বিশ্বাস ও কর্মে একাত্মতা প্রকাশ করত। শুধু বাছাই করা মানুষদের কাছে নিজেদের মতামত প্রকাশ করে দাওয়াত দিত।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক উচ্চাভিলাস:

বাতিনী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে কিছু উচ্চাভিলাসী অসৎ ব্যক্তির ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ইসলামের নামে কিছু বিভ্রান্তি ছড়াতে সক্ষম হয়। খারিজীদের ক্ষেত্রেও একথা বলা যায় যে, এদের মধ্যে অনেকেই রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উচ্চাভিলাসের জন্য সঠিক বিষয় উপলব্ধি করার পরেও উগ্রতার পথ পরিহার করে নি। বিষয়টি এদের কিছু নেতার ক্ষেত্রে স্পষ্ট। অন্যরা এদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে।

ইসলাম সম্পর্কে ভুল শিক্ষা লাভ:

খারিজীরা কুরআনকে ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করলেও, কুরআনের নির্দেশ বোঝার ক্ষেত্রে-এর বাস্তব কর্মজীবন ও সাহাবীদের মতামতের গুরুত্ব না দিয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছে। পক্ষান্তরে বাতিনীরা ইসলামের নির্দেশনা বোঝার ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ অধিকার ও পবিত্রতায় বিশ্বাস করে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছে।

ইসলামের নামে বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড রোধ করতে সন্ত্রাসীদের বিভ্রান্তির স্বরূপ উদ্ঘাটন প্রয়োজনীয়। কারণ যে কোনো যুগে ও সমাজে ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ প্রচার করতে একই বিভ্রান্তির উপর নির্ভর করা হয়।

পান্ডিত্য ও ধার্মিকতার অহঙ্কার:

নিঃসন্দেহে কুরআন ও হাদীস ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস এবং প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব নিজে কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। তবে মনে রাখা প্রায়োজন, সকল মুসলিম কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করবেন, কিন্তু সকল মুসলিমই বিশেষজ্ঞ হবেন না। প্রত্যেক মুমিন নিজ জীবনের পাথেয় হিসেবে কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করবেন। কিন্তু উম্মাহর সমস্যায় সমাধান দেওয়ার জন্য অবশ্যই ইসলামী জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ হতে হবে। মহান আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করে তার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও বর্ণনার দায়িত্ব প্রদান করেন রাসূলুল্লাহ (সা:) -কে। তাঁর এ সকল ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করেছেন সাহাবীগণ।

ইসলামী জ্ঞানের বিশেষজ্ঞ বা ফতোয়া প্রদানের ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ ধর্মের বা কোন বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার মূলনীতি লঙ্ঘন করার কারণেই ইসলামের ইতিহাসে প্রাচীন দুটি সন্ত্রাসী সম্প্রদায় জন্মলাভ করেছে। খারিজীরা সাহাবীদের এবং তাঁদের পরে সমাজের মূলধারার আলিমদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। নিজেদের মতামতকেই তারা চূড়ান্ত বলে মনে করেছে। তবে তারা এরূপ মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির বিশেষ ক্ষমতা, অধিকার বা আল্লাহর সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক, কাশফ, ইলহাম, গোপন জ্ঞান ইত্যাদির কোনো দাবি করেনি। স্বাভাবিক মানবীয় জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে প্রত্যেক মুসলিমই কুরআন বুঝতে পারে এবং তার বুঝ চূড়ান্ত বলে তারা দাবি করেছে। পক্ষান্তরে বাতিনীরা বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ গোপন জ্ঞান, কাশফ, ইলহাম, ইলকা, আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক বা বিশেষ 'পদাধিকার' দাবি করেছে। ফলে এ সকল কল্পিত নেতা বা নেতাদের নামে অন্য কেউ তাদের কঠিন বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত করেছে। উভয় পদ্ধতিতেই মুসলিমের মধ্যে ধার্মিকতা, ধর্মপালন ও ধর্মজ্ঞান সম্পর্কে অপ্রতিরোধ্য 'অহঙ্কার' সৃষ্টি করা হয়েছে।

কাফির আখ্যা দেয়া:

কাউকে হত্যা করতে হলে তাকে 'কাফির' ও 'ইসলামের শত্রু' প্রমাণ করা খুব জরুরী। নইলে মুসলিম সমাজ সহজে হত্যাকান্ডে অংশগ্রহণ বা সমর্থন দেবে না। এজন্য প্রকৃত বা কল্পিত পাপের কারণে মুসলিমকে কাফির বলা সন্ত্রাসের পথে অন্যতম পদক্ষেপ। খারিজী ও বাতিনী সব সন্ত্রাসী গোষ্ঠী এ পথ অবলম্বন করেছে। তাদের মতের স্বপক্ষে তারা

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন ও হাদীস থেকে অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছে। কিন্তু এ সকল উদ্ধৃতির অর্থ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে 'সুন্নাত' ও সাহাবীদের মত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। এভাবে তারা প্রকৃত পাপের কারণে মুসলিমকে কাফির বলেছে, রাজনৈতিক কারণে কাফির বলেছে এবং সমর্থন বা আনুগত্যের অভিযোগে অনেক মুসলিমকে কাফির বলেছে।

পাপাচারের কারণে কাফির বলাঃ

ইসলাম মানুষকে পরিপূর্ণ সততা ও পাপমুক্ত জীবন যাপনে উৎসাহ দিয়েছে, কিন্তু মুসলিম বলে গণ্য হওয়ার জন্য পরিপূর্ণ পাপমুক্ত হওয়ার শর্তারোপ করেনি। আল্লাহর বিধান অনুসারে ফয়সালা না করাকে কুরআনে কুফরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া কুরআন ও হাদীসে অনেক পাপকে কুফরী বলা হয়েছে। এগুলোর উপর নির্ভর করে খারিজীরা দাবি করে যে, আল্লাহর বিধান অমান্য করে যে কোনো পাপে লিপ্ত হওয়ার অর্থই আল্লাহর বিধানের বাইরে ফয়সালা দেওয়া। কাজেই সকল পাপীই কাফির।

তাদের এ মত কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা ছাড়া কিছুই নয়। কুরআন ও হাদীসে যেমন বিভিন্ন পাপকে 'কুফরী' বলা হয়েছে, তেমনি কঠিন পাপে লিপ্ত ব্যক্তিকেও মুমিন বলা হয়েছে। দেখা গেছে যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুসারে যারা ফয়সালা করে না, তাদের কাফির বলা হয়েছে। আর আল্লাহর অন্যতম বিধান, এক মুমিন অন্য মুমিনকে হত্যা করবে না, বা পরস্পর যুদ্ধ করবে না। স্পষ্টতই মুমিনের সাথে যুদ্ধ করাকে 'কুফরী' বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন: "মুসলিমকে গালি দেওয়া পাপ এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী।" *(ইমাম বুখারী,আল-জামি আস-সহীহ, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ-১৯)।* অথচ আল্লাহর এই বিধানের বিরুদ্ধে ফয়সালা দিয়ে মুমিনের সাথে যুদ্ধরত ব্যক্তি, হাদীসের ভাষায় যে স্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত, তাকে কুরআন কারীমে 'মুমিন' বলে অভিহিত করা হয়েছে। উপরোল্লিখিত আয়াতে পরস্পরে যুদ্ধরত মানুষদেরকে মুমিন বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং পরের আয়াতে যুদ্ধরত মুমিনদেরকে অন্য মুমিনদের ভাই বলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অগণিত হাদীসে পাপীদেরকে মুমিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল আয়াত ও হাদীসের সাহচার্যে লালিত সাহাবীগণ বলতেন যে, কুরআন কারীমে আলোকে রাসূলুল্লাহ ব্যবহৃত কুফর, নিফাক ও জুলম দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে: কখনো তা অবিশ্বাস, ঈমানের অনুপস্থিতি ও চূড়ান্ত অন্যায় অর্থে এবং কখনো তা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতার পাপ, মুনাফিকের গুণ ও সাধারণ পাপ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলা সন্ত্রাস ও অশান্তির প্রথম পদক্ষেপ। এ বিষয়ে তার উম্মতকে সতর্ক করেছেন ও কঠিন সতর্কতা অবলম্বন করতে রাসূলুল্লাহ (সা) শিক্ষা দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেন, "যদি কোনো ব্যক্তি তার ভাইকে কাফির বলে, তবে এ কথা দু জনের একজনের উপর প্রযোজ্য হবে। যদি তার ভাই সত্যিই কাফির হয় তবে ভাল, নইলে যে তাকে কাফির বলল তার উপরেই কুফরী প্রযোজ্য হবে।"*(ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত,খ.১, পৃ-৫৬)।*

সাবিত ইবনু দাহহাক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন- "যদি কেউ কোনো মুমিনকে কুফরীতে অভিযুক্ত করে তবে তা তাকে হত্যা করার মতই অপরাধ হবে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাহাবীগণকে সতর্ক করতেন" (ইমাম বুখারী, আল-জামি আস সহীহ, প্রাগুক্ত, খ.৮, পৃ-৩২)।

কুরআন-হাদীসের এ সকল নির্দেশনার আলোকে এবং কুরআন-হাদীসের সকল বক্তব্যের সামগ্রিক ও সমন্বিত অর্থের উপর নির্ভর করে সাহাবীগণ এবং তাদের অনুসারী পরবর্তী সকল যুগে মুসলিম উম্মাহর মূলধারার মুসলিমগণ ঈমানের দাবিদার কাউকে কাফির বলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তাদের মুলনীতি এই যে, মুমিন নিজের ঈমানের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকবেন। সকল কুফর, শিরক, পাপ, অন্যায়, অবাধ্যতা ও ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী চিন্তাচেতনা থেকে সতর্কতার সাথে আত্মরক্ষা করবেন। কিন্তু অন্যের ঈমানের দাবি গ্রহণ করার বিষয়ে

Dhaka University Institutional Repository

বাহ্যিক দাবির উপর নির্ভর করবেন। কোনো ঈমানের দাবিদারকেই কাফির না বলার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবেন। ভুল করে কোনো মু'মিনকে কাফির মনে করার চেয়ে ভুল করে কোনো কাফির, মুশরিক বা মুনাফিককে মুসলিম মনে করা অনেক ভাল ও নিরাপদ। প্রথম ক্ষেত্রে কঠিন পাপ ও নিজের ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয় রয়েছে। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোনোরূপ পাপ বা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

এ মূলনীতির প্রতি সাহাবীগণের বিশ্বাস এত দৃঢ় ছিল যে, তাঁরা কখনো খারিজীদের কাফির বলেন নি। খারিজীরা তাদেরকে কাফির বলেছে, নির্বিচারে এদের সাথে যুদ্ধ করতে ও মুসলিমদেরকে হত্যা করেছে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা:) এদের হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, সাহাবীগণ তাদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, কিন্তু কখনো আলী (রা:) বা অন্য কোনো সাহাবী তাদেরকে কাফির বলে ফতোয়া দেন নি। বরং তাঁরা এদের সাথে মুসলিম হিসেবেই মিশেছেন, কথাবার্তা বলেছেন, আলোচনা করেছেন এমনকি এদের ইমামতিতে সালাত আদায় করেছেন। যুদ্ধের ময়দানে বা বিচারের কাঠগড়া ছাড়া কখনোই এদের হত্যার অনুমতি দেন নি।

কাফির বলার রাজনৈতিক কারণ:

খারিজী ও বাতিনীদের কাফির বলার মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। কুরআন-হাদীস নির্দেশিত সুস্পষ্ট পাপে লিপ্ত তাদের দলভুক্ত ব্যক্তিদেরকে অনেক সময় তারা মুমিন বলে গ্রহণ করেছে। পক্ষান্তরে, রাজনৈতিক বিরোধীদেরকে কল্পিত পাপ বা 'আল্লাহর আইন অমান্য' করার অপরাধে কাফির বলে গণ্য করেছে। আলী (রা:) ও তার অনুসারীদেরকে তারা কল্পিত পাপের অপরাধে কাফির বলে। এছাড়া উমার ইবনু আব্দুল আযীয ছাড়া অন্যান্য উমাইয়া শাসককেও তারা কাফির বলে গণ্য করে। কারণ তারা শাসক নির্বাচনের ক্ষেত্রে জনগণের পরামর্শ বা শূরা গ্রহণের বিষয়ে আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে এর বিপরীতে বংশতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ন্যায়বিচার, সাম্য ইত্যাদি বিষয়ক আল্লাহর বিধানগুলো পরিত্যাগ করে মানুষের মনগড়া নিয়মনীতি প্রবর্তন করেন। উমার ইবনু আব্দুল আযীযকে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠাকারী, সৎ ও ন্যায়বিচারক হিসেবে মানলেও, তিনি যেহেতু পূর্ববর্তী শাসকদেরকে কাফির বলতে অস্বীকার করেন, সেহেতু তারা তাঁর বিরুদ্ধেও যুদ্ধ অব্যাহত রাখে।

যেমন,মদ পান ইসলামে হারাম ও মদপান প্রমাণিত হলে বেত্রাঘাতের বিধান দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি মদ বৈধ মনে করেন অথবা মদপানের জন্য শাস্তি প্রদানকে সেকেলে বা অমানবিক বিশ্বাস করেন তবে তিনি কাফির বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে, যদি কোনো বিচারক মদের অবৈধতা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন এবং মদপানের জন্য শাস্তি দেওয়াই সঠিক বলে মনে করেন। দল বা সেনাবাহিনীকে অনুগত রাখার লোভে, শাসক বা আমীরের চাপে, জাগতিক কোনো স্বার্থ হাসিলের জন্য বা পক্ষপাতিত্বের কারণে আইন প্রয়োগ না করেন বা অপরাধীকে শাস্তি না দেন, তবে তিনি পাপী বলে গণ্য হবেন, আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার কারী বলে গণ্য হবেন, কিন্তু অবিশ্বাসী বলে গণ্য হবেন না। বিশেষত যে ব্যক্তি নিজেকে মুমিন বলে দাবি করছেন, তিনি 'আল্লাহর আইন' অমান্য করলে বা 'আল্লাহর আইনের বাইরে ফয়সালা দিলে' তার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিই গ্রহণ করতে হবে, যতক্ষণ না তার স্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা তার কুফরী প্রমাণিত হবে। এজন্যই উমাইয়া শাসনামলে বসবাসকারী সাহাবীগণ কখনোই এ সকল শাসককে কাফির বলে গণ্য করেন নি। বরং তাদের পিছনে সালাত আদায় করেছেন এবং তাদের সাথে সকল প্রকার ইসলামী মু'আমালাত অব্যাহত রেখেছেন।

ব্যক্তি বনাম রাষ্ট্র:

রাসূলুল্লাহ (সা:) এর মতামত অস্বীকার করে কুরআন মানতে গিয়ে সবচেয়ে মারাত্মক যে বিভ্রান্তিতে খারিজীরা নিপতিত হয় তা ছিল রাষ্ট্র ব্যবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন না করা। ফলে তারা তিনটি বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়।

প্রথমত, অন্যায়ের প্রতিবাদ ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার মধ্যে পার্থক্য না করা। ফলে তারা কাল্পনিক বা প্রকৃত অন্যায়ের প্রতিবাদের নামে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও সমাজ বিচ্ছিন্নতায় লিপ্ত হয়।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের আনুগত্য ও সাধারণ পাপীর পাপের সমর্থনের মধ্যে পার্থক্য না করা। ফলে তারা রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের সাধারণ আনুগত্যকে পাপীর আনুগত্য ও পাপের সমর্থন বলে গণ্য করে। অথচ সুন্নাতের আলোকে প্রথমটি ইসলাম নির্দেশিত ইবাদত ও দ্বিতীয়টি পাপ ও অন্যায়।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় ফরয ও ব্যক্তিগত ফরযের মধ্যে পার্থক্য না করা। ফলে তারা বিচার ও জিহাদকে ব্যক্তিগত পর্যায়ের ইবাদত বলে গণ্য করে এবং ব্যক্তিগত বা দলগত ভাবে জিহাদ পরিচালনার নামে হত্যা, লুণ্ঠন ও সন্ত্রাসে লিপ্ত হয়।

রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের ক্ষেত্রে উগ্রতা পরিহারে রাসূলুল্লাহ (সা:) নির্দেশ দিয়েছেন। মুসলিমের ব্যক্তি জীবনে ইসলাম পালনের ক্ষেত্রে যেমন ভুলক্রটি পাপ ও ইসলামী বিধান লঙ্ঘন হতে পারে, তেমনি রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিচালনায়ও ইসলামী বিধিবিধানের লঙ্ঘন ঘটতে পারে। ব্যক্তি মুসলিমকে যেমন পাপের কারণে কাফির বলা যায় না, রাষ্ট্রকেও তেমনি পাপ বা অন্যায়ের কারণে 'কাফির' বলা যাবে না বা বিদ্রোহ করা যাবে না। বরং শান্তিপূর্ণভাবে পাপ, অপরাধ বা অন্যায়ের প্রতিবাদ সহ রাষ্ট্রীয় সংহতি, শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। ইবনু আব্বাস (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- "কেউ তার শাসক বা প্রশাসক থেকে কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখলে তাকে ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে। কারণ যদি কেউ জামা'আতের (মুসলিম সমাজ বা রাষ্ট্রের ঐক্যের বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠির সিদ্ধান্তের) বাইরে এক বিঘতও বের হয়ে যায় এবং এই অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তাহলে সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।" (ইমাম বুখারী, আল-জামি আস-সহীহ, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৭৮)।

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন-

"যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য থেকে বের হয়ে এবং জামা'আত বা মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করল সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।" (ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৬ পৃ. ২০)।

৬০ হিজরীতে হযরত মু'আবিয়ার (রা) ইন্তিকালের পরে ইয়াযিদ শাসনভার গ্রহণ করেন এবং চার বছর শাসন করে ৬৪ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। তার শাসনামলে ৬৩ হিজরীতে মদীনার অধিবাসীগণ ইয়াযিদের জুলুম-অত্যাচার, ইমাম হুসাইনের শাহাদত ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে বিদ্রোহ করেন। তাদের বিদ্রোহ ছিল যুক্তিসঙ্গত এবং একান্তই আল্লাহর ওয়াস্তে ও অন্যায় পরিবর্তন ও প্রতিরোধের অনুপ্রেরণা নিয়ে। কিন্তু তা সত্বেও সে সময়ে জীবিত সাহাবীগণ বিদ্রোহে রাজী ছিলেন না। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা) মদীনাবাসীদের বিদ্রোহের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনু মুতি'র নিকট গমন করেন। তিনি তাকে সম্মানের সাথে বসতে অনুরোধ করেন। ইবনু উমর বলেন, আমি বসতে আসিনি। আমি তোমাকে একটি হাদীস শুনাতে এসেছি। আমি রাসূলুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি-

"যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য থেকে নিজেকে বের করে নিল সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হলে নিজের জন্য কোন ওজর আপত্তি পাবে না। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল যে, তার গলায় কোন বাইয়াত বা রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের শপথ নেই সে ব্যক্তি জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।" (ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৬ পৃ. ২২)।

উম্মু সালামা (রা:) রাসূলুল্লাহ (সা) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন:

"অচিরেই তোমাদের উপর অনেক শাসক প্রশাসক আসবে, যারা ন্যায় ও অন্যায় উভয় ধরনের কাজ করবে। যে ব্যক্তি তাদের অন্যায়কে ঘৃণা করবে, সে অন্যায়ের অপরাধ থেকে মুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি আপত্তি করবে সে (আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে) নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু যে এ সকল অন্যায় কাজ মেনে নেবে বা তাদের অনুসরণ করবে

(সে বাঁচতে পারবে না।)" সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বলেন, "না, যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করবে।" (ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৬ পৃ. ২৩)।

যদি কোনো নাগরিক তার সরকারের অন্যায় সমর্থন করেন, অন্যায়ের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন বা অন্যায়ের ক্ষেত্রে সরকারের অনুসরণ করেন তবে তিনি তার সরকারের পাপের ভাগী হবেন। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা, চাকরী, কর্ম বা রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের কারণে কোনো নাগরিক পাপী হবে না। কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইউসূফ (আ) কাফির ফিরাউনের অধীনে স্বেচ্ছায় কর্মগ্রহণ করেছেন। এজন্য কোনো অবস্থাতেই তাঁকে ফিরাউনের কুফর, শিরক বা আল্লাহর আইন বিরোধিতায় সহযোগী বলে কল্পনা করা যায় না।

যালিম, পাপী বা অন্যায়ে লিপ্ত শাসক বা প্রশাসকের অন্যায়ের প্রতি আপত্তি সহ তার আনুগত্য বজায় রাখাই ইসলামের নির্দেশ। যালিম বা পাপী শাসক, প্রশাসক বা সরকার যদি পাপের নির্দেশ দেয় তবে তা মান্য করা যাবে না। অন্যান্য ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য ও সংহতি বজায় রাখতে হবে। আউফ ইবনু বলেছেন, বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন- "তোমরা হুশিয়ার থাকবে! তোমাদের কারো উপরে যদি কোনো শাসক-প্রশাসক নিযুক্ত হন এবং সে দেখতে পায় যে, উক্ত শাসক বা প্রশাসক আল্লাহর অবাধ্যতার কোনো কাজে লিপ্ত হচ্ছেন, তবে সে যেন আল্লাহর অবাধ্যতার উক্ত কর্মকে ঘৃণা করে, কিন্তু আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেবে না।" (ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৬ পৃ. ২৪)।

অন্য বর্ণনায়- "যখন তোমরা তোমাদের শাসক-প্রশাসকগণ থেকে এমন কিছু দেখবে যা তোমরা অপছন্দ কর, তখন তোমরা তার কর্মকে অপছন্দ করবে, কিন্তু তার আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিবে না।" (ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৬ পৃ. ২৪)।

আরো অনেক হাদীসে পক্ষপাতিত্ব, যুলুম ও পাপে লিপ্ত শাসক বা সরকারের প্রতি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বজায় রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরূপ শাসক বা সরকার কোনো ইসলাম বিরোধী নির্দেশ প্রদান করলে তা পালন করা যাবে না। আবার অন্যায় নির্দেশের কারণে বিদ্রোহ বা অবাধ্যতাও করা যাবে না। বরং রাষ্ট্রীয় সংহতি ও আনুগত্য বজায় রাখতে হবে। তবে শাসক বা প্রশাসক সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত সুস্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হলে বিদ্রোহ বা আনুগত্য পরিত্যাগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

জিহাদের নামে সন্ত্রাস:

সন্ত্রাসের পিছনে তাত্ত্বিক দিকগুলো যাই থাক, সন্ত্রাসের প্রকাশ হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি। খারিজীরা জিহাদকে ব্যক্তিগত ফরয ও ইসলামের রুকন বলে গণ্য করে এবং জিহাদের নামেই তারা এ সকল কর্ম করতে থাকে। সাহাবীগণ তাদেরকে হত্যার ভয়াবহতা বুঝাতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। কারণ অন্যান্য তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি যাই থাক, হত্যাই কঠিনতম পাপ যা মানুষের পরলৌকিক মুক্তির পথ রুদ্ধ করে দেয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে হত্যা:

বস্তুত, সাহাবীরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ইসলামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে সম্মানিত বস্তু মানব জীবন। মানুষকে আল্লাহ সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন। শুধুমাত্র 'আইনানুগ বিচার' অথবা 'যুদ্ধের ময়দান' ছাড়া অন্য কোনোভাবে কোনো মানুষকে হত্যা করা, সন্ত্রস্থ করা, আঘাত করা, কষ্ট দেওয়া বা কোনোভাবে কারো ক্ষতি করা কঠিনতম হারাম। এই বিধান সর্বজনীন। ইসলামের দৃষ্টিতে 'মানব রক্ত' কঠিনতম হারাম। একমাত্র সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনে 'মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই' একজন মানুষের হত্যা বৈধ করা হয়েছে। একান্ত প্রয়োজনে বিশেষ মুহূর্তে মানুষের রক্তপাত বৈধ করা হয়। শুধু দুইটি ক্ষেত্রে তা হয়: বিচার ও যুদ্ধ। এ দুটি বিষয়ই সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিচার, জিহাদ বা হত্যার অনুমতি থাকলে পৃথিবীর বুকে কোনো মানুষই বেঁচে থাকতে পারবে না।

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বনাম ব্যক্তিগত কর্তব্য:

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এজন্য কুরআন ও হাদীসে মানব জীবনের সকল দিকের বিধিবিধান বিদ্যমান। কোনো বিধান ব্যক্তিগতভাবে পালনীয়, কোনো বিধান সামাজিকভাবে বা রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনীয়। প্রত্যেক বিধান পালনের জন্য নির্ধারিত শর্তাদি রয়েছে। কুরআনে 'সালাত' প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবার কুরআনে 'চোরের হাত কাটার', 'ব্যভিচারীর বেত্রাঘাতের' ও জিহাদ বা কিতালের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম ইবাদতটি ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনীয়। অন্য কেউ পালন না করলেও মুমিনকে ব্যক্তিগতভাবে পালন করতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ নির্দেশটি 'রাষ্ট্রীয়ভাবে' পালনীয়। কখনোই একজন মুমিন তা ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠিগতভাবে পালন করতে পারেন না।

এখানে লক্ষণীয় যে, কোনো ইবাদতের শর্তাবলি কুরআনে কখনোই একত্রে বা একস্থানে উল্লেখ করা হয় নি। কুরআন ও হাদীসের সামগ্রিক বিধান বা রাসূলুল্লাহ (সা:)এর সামগ্রিক জীবন ও এ সকল নির্দেশ পালনে তাঁর রীতি-পদ্ধতি থেকেই সেগুলোর শর্ত ও পদ্ধতি বুঝতে হবে। দু'একটি আয়াত বা হাদীস সামনে রেখে মনগড়া অর্থ বা ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমেই বিভিন্ন ইসলামী পরিভাষার বিকৃতি ঘটানো হয়। জঙ্গীবাদীরা এভাবেই জিহাদ শব্দের বিকৃতি ঘটিয়েছে।

কুরআনে বারবার সালাত প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু, নির্দেশ দেওয়া হয়েছে-

"সূর্য হেলে পড়ার পর হতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে।" *(আল কুরআন, সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ৭৮)* ।

এই নির্দেশের উপর নির্ভর করে যদি কেউ সূর্যাস্তের সময় সালাতে রত হন, তবে তিনি নিজে যতোই দাবি করুন, মূলত তা ইসলামী ইবাদাত বলে গণ্য হবে না, বরং তা হাদীস শরীফে 'পাপ ও হারাম' বলে গণ্য হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা:) সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাত পর্যন্ত সালাত আদায়ের বৈধ ও অবৈধ সময় চিহ্নিত করেছেন এবং সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায় অবৈধ করেছেন। এভাবে শিক্ষার বাইরে মনগড়াভাবে অনেকে সমস্যা তৈরী করে।

বিচার ও হত্যা:

বিচারের ক্ষেত্রে নরহত্যা, বিবাহিতের ব্যভিচার ও স্বেচ্ছায় বুঝে শুনে ইসলাম গ্রহণ করার পরে ইসলাম ত্যাগ করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার বিধান আছে। এ জন্য অনেক কঠিন শর্ত রয়েছে। সবচেয়ে বড় বিষয় বিচারক সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন মৃত্যুদণ্ড না দেওয়ার। অপরাধের পূর্ণতার বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহ থাকলেও আর মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা যাবে না। কারণ, বিচারকের ভুলে নিরপরাধের শাস্তি বা কম অপরাধীর বেশি শাস্তি হওয়ার চেয়ে অপরাধীর মুক্তি বা বেশি অপরাধের কম শাস্তি হওয়া বাঞ্চনীয়।

এই বিচার অবশ্যই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যথাযথ বিচারকের আদালতে যথাযথ সাক্ষ্য, প্রমাণ ও আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হতে হবে। মুমিনকে ব্যক্তিগতভাবে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করতে এবং অন্যায়ের পরিবর্তন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কখনোই তাকে বিচার করতে বা আইন হাতে তুলে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় নি। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-

''তোমাদের কেউ যদি কোন অন্যায় দেখতে পায় তবে সে তাকে তার বাহুবল দিয়ে পরিবর্তন করবে। যদি তাতে সক্ষম না হয় তবে সে তার বক্তব্যের মাধ্যমে তা পবিবর্তন করবে। এতেও যদি সক্ষম না হয় তাহলে সে তার অন্তর দিয়ে তার পরিবর্তন (কামনা) করবে, আর এটাই ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।'' (ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ৫০) ।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রত্যেক মুমিনেরই দায়িত্ব, অন্যায় দেখতে পেলে সাধ্য ও সুযোগ মত তার পরিবর্তন বা সংশোধন করা।

Dhaka University Institutional Repository

জিহাদ ও কিতাল:

হত্যার দ্বিতীয় ক্ষেত্র 'জিহাদ'। কষ্ট, পরিশ্রম, সংগ্রাম আল্লাহর বিধান পালনের ও প্রতিষ্ঠার সকল প্রকার শ্রম বা প্রচেষ্টাকেই কুরআন ও হাদীসে কখনো কখনো 'জিহাদ' বলা হয়েছে। যেমন, কাফির মুনাফিকদের দাওয়াত দেয়া ও তাদের অন্যায় কাজের কঠোর প্রতিবাদ করাকে জিহাদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যালিম শাসকের সামনে সত্য ও ন্যায়ের কথা বলাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে। হজ্জকে জিহাদ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে। আল্লাহর আনুগত্য-মূলক বা আত্মশুদ্ধিমূলক যে কোনো কর্মের চেষ্টাকে জিহাদ বলা হয়েছে। তবে ইসলামী পরিভাষায় ও ইসলামী ফিকহ জিহাদ বলতে মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় যুদ্ধকেই বুঝানো হয়। আর এই যুদ্ধেরই নাম কিতাল।

কতল অর্থ হত্যা করা। আর কিতাল অর্থ পরস্পর যুদ্ধ। এজন্য জিহাদ বা কিতালের মূল শর্ত সামনাসামনি 'যুদ্ধ' পিছন থেকে হত্যা করা, না জানিয়ে হত্যা করা এবং গুপ্ত হত্যা করা কখনোই ইসলামী কিতাল বা জিহাদ নয়।

রাসূলুল্লাহ (সা:) দাওয়াতের মাধ্যমে 'ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। এক পর্যায়ে দাওয়াতের ভিত্তিতে মদীনার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ইসলামী জীবনব্যবস্থা মেনে তাকে তাঁদের রাষ্ট্রপ্রধান ও নেতা নিতে আগ্রহী হন। এভাবে দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামের বিরোধিতাকারীরা এই নতুন রাষ্ট্রটিকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চেষ্টা করে। তখন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, নাগরিকদের জান, মাল ও ধর্মীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জিহাদের বিধান প্রদান করা হয়। এজন্য জিহাদ বা কিতাল বৈধ হওয়ার জন্য 'রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপ্রতি বা 'ইমাম' শর্ত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন-

"রাষ্টপ্রধান হলেন ঢাল, যাকে সামনে রেখে কিতাল বা যুদ্ধ পরিচালিত হবে।" *(ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ-৬০)* ।

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে-

"রাষ্ট্রপ্রধান ধার্মিক হোক আর অধার্মিক হোক, উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর আনুগত্যে জিহাদ করা তোমাদের উপর ওয়াজিব।" (আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আশআছ আস-সিজিসতানী, সুনান আবি দাউদ (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবী, তা.বি. খ. ২ পৃ. ৩২৫)।

অন্য বর্ণনায়: "জালিম শাসকের জুলুম ও ন্যায়পরায়ণ শাসকের ন্যায়পরায়ণতা কোনোটিই জিহাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বাধা হবে না।"

রাষ্ট্রীয় যুদ্ধের ক্ষেত্রেও কাউকে হত্যা করার অগণিত শর্ত রয়েছে। যুদ্ধকারী যুদ্ধের জন্য সম্মুখে অস্ত্রসহ উপস্থিত থাকবে। যুদ্ধের আগে তাকে সন্ধি, আত্মসমর্পন, ইসলাম গ্রহণ, জিযিয়া প্রদান ইত্যাদির সুযোগ দিতে হবে। এ সকল শর্ত সহ যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধের সময় একেবারে অস্ত্রাঘাতের সময়ও যদি কেউ নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে তবে তাকে আর আঘাত করা যাবে না। ইত্যাদি অগণিত শর্ত বিদ্যমান। একজন ডাক্তার যেমন সর্বাত্মক চেষ্টা করেন রোগীর অঙ্গচ্ছেদ না করে চিকিৎসা করার- একান্ত বাধ্য হলেই কেবল তার কোনো অঙ্গ কেটে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করেন; তেমনি ইসলামে প্রতিটি মানুষের প্রাণ রক্ষা করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে।

জিহাদ বা কিতালের অন্যতম শর্ত, শত্রুপক্ষ রাষ্ট্র আক্রমণ করবে বা তার নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে। কুরআন কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে-

"যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।" (আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযি, আল-জামে আস-সহীহ আত-তিরমিযি (বৈরুত: দারু ইহইয়া আত-তুরাছিল আরাবী, তা.বি. খ. ৫, পৃ. ৩২৫); আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে হাম্বল আশ-শায়বানী, মুসনাদ আল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (কায়রো: মুয়াচ্ছাছাতু কারতাবা, তা.বি. খ. ১, পৃ. ২০৬)।

কিতালের অন্য শর্ত, শুধুমাত্র যারা যুদ্ধ করতে অস্ত্রধারণ করে সামনে এসেছে তাদেরই সাথে যুদ্ধ করতে হবে। কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের সাথে,যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে। কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করবে না, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীগণকে ভালবাসেন না।" (আল-কুরআন আল-কারীম, সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৯০)।

এ নির্দেশের মাধ্যমে ইসলাম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও যুদ্ধের নামে অযোদ্ধা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা, অযোদ্ধা মানুষদেরকে হত্যা করা ইত্যাদি সন্ত্রাসের পথ রোধ করেছে। যোদ্ধা ছাড়া কারো সাথে যুদ্ধ করা যাবে না এবং যুদ্ধের ক্ষেত্রেও সীমালঙ্ঘন, আগ্রাসন ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে হাদীসের নির্দেশ:

"যুদ্ধে তোমরা ধোঁকার আশ্রয় নেবে না, চুক্তিভঙ্গ করবে না, কোনো মানুষ বা প্রাণীর মৃতদেহ বিকৃত করবে না বা অসম্মান করবে না-(ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদ আল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০০)।

কোনো শিশু-কিশোরকে হত্যা করবে না, কোনো মহিলাকে হত্যা করবে না, কোনো সন্ন্যাসী বা ধর্মজাযককে হত্যা করবে না, কোনো বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, কোনো অসুস্থ মানুষকে হত্যা করবে না, কোনো জনপদ ধ্বংস করবে না, খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া গরু, উট বা কোনো প্রাণী বধ করবে না, যুদ্ধের প্রয়োজন ছাড়া কোনো গাছ কাটবে না তোমরা দয়া ও কল্যাণ করবে, কারণ আল্লাহ দয়াকারী- কল্যাণকারীদেরকে ভালবাসেন।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরেও যতগুলো আইনানুগ রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তাতে রাসূলুল্লাহ (সা:)শুধু মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক ও যোদ্ধাদের জীবনই নয়, উপরন্তু, তিনি শত্রুপক্ষের নাগরিক ও যোদ্ধাদেরও প্রাণহানি কমাতে চেয়েছেন। বস্তুত ইসলাম যুদ্ধকে যে মানবিক রূপ প্রদান করেছে তা অন্য কোনো ধর্মে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে অন্যান্য অনেক ধর্মে, বিশেষত ইহূদী-খৃস্টান ধর্মে যুদ্ধের সময় অযোদ্ধাদের হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে শুধু বৈধই করা হয় নি, উপরন্তু তার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বাইবেলে যুদ্ধের ক্ষেত্রে বেসামরিক মানুষদের এবং বিশেষ করে সকল পুরুষ শিশুকে এবং সকল বিবাহিত নারীকে নির্বিচারে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র কিশোরী কুমারী মেয়েদেরকে ভোগের জন্য জীবিত রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোনো দেশ যুদ্ধ করে দখল করতে পারলে তার সকল পুরুষ অধিবাসীকে নির্বিচারে হত্যা করতে হবে এবং নারী ও পশুদেরকে ভোগের জন্য রাখতে হবে। আর সেই দেশ যদি ইহূদীদের দেশের নিকটবর্তী কোনো দেশ হয়, তবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তথাকার সকল মানুষকে হত্যা করতে হবে। বাইবেলে বলা হয়েছে-

"Kill every male among the little ones, and kill every woman that hath known man by lying with him. But all the women children, that have not known a man by lying with him, keep alive for yourselves." … ''And when the LORD the God hath delivered it into thine hands, thou shalt smite every male thereof with the edge of the swore; but the women, and the little ones, and the cattle, and all that is in the city, even all the spoil thereof, shalt thou take unto thyself; and thou shalt eat the spoil of thine enemies, which the LORD thy God hath given thee. Thus shalt thou do unto all the cities which are very far from thee, which are not of the cities of these nations. But of the cities of these which the LORD thy God doth give thee for an inheritance, thou shalt save alive nothing that breatheth; but thou shalt utterly destroy them." *(The Bibles, numbers: 31/17-18)*

<u>কাফির যোদ্ধা হত্যা বনাম কাফির হত্যা:</u>

কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন স্থানে 'কাফির-মুশরিকদের' হত্যার অনুমতি বা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ থেকে খারিজীরা ধারণা করে যে, কাফির হলেই হত্যা করা যাবে। তাদের এই ধারণা ছিল 'সুন্নাত' বা রাসূলুল্লাহ (সা:) নির্ভর না করে মনগড়াভাবে কুরআনের অর্থ করার ফল। কুরআনে আয়াতের সমন্বয়ে ও রাসূলুল্লাহ (সা:) যেমন কোথাও কোথাও কাফিরদের বা মুশরিকদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি অন্যত্র শুধু যুদ্ধরতদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কখনোই বিচারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বা যুদ্ধরত 'কাফির' ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা:) অন্যদের হত্যা করেন নি। তাঁর রাষ্ট্রে অগণিত কাফির সকল নাগরিক অধিকার নিয়ে বসবাস করেছেন। তিনি কখনোই তাদের হত্যা করেন নি বা হত্যার অনুমতি দেননি। ঈমানের দাবিদার মুনাফিকগণকে তিনি চিনতেন। তাদেরকেও হত্যার অনুমতি তিনি দেন নি। উপরন্তু তিনি অযোদ্ধা সাধারণ অমুসলিম নাগরিককে হত্যা কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ও অন্যান্য সাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন-

"যদি কোনো ব্যক্তি মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক বা অমুসলিম দেশের অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে, তবে সে জান্নাতের সুগন্ধও লাভ করতে পারবেন না, যদিও জান্নাতের সুগন্ধ ৪০ বৎসরের দুরত্ব থেকে লাভ করা যায়" *(ইমাম বুখারী, আল-জামে আস সহীহ, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ-১২০)*।

পরিশেষে বলা যায়, প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার অনুপস্থিতিই ইসলামের নামে জঙ্গীবাদ বা সন্ত্রাসের জন্ম দিতে পারে। সন্ত্রাস রোধের জন্য ইসলামের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা প্রসার প্রয়োজন। কেউ বুঝে শুনে ধর্মকে বিকৃত করছেন, কেউ নিজেদের সুবিধামতো ধর্মের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, কেউ ইচ্ছাকৃতভাবেই জঙ্গীবাদকে প্রশ্রয় দিতে ও মুসলমানদের হেয় করার চেষ্টা করছে,আর বড় কারণটি হচ্ছে রাজনৈতিক। রাজনৈতিক ঐক্যমত এবং ধর্মের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সমাজে জঙ্গীবাদ দমনে সামাজিকভাবেই সহায়ক হতে পারে। যে কোনো দেশে বা যুগে ইসলামের নামে সন্ত্রাস বা জঙ্গীবাদ প্রচার করতে উপরের বিভ্রান্তিগুলো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলা হবে। কাজেই সচেতন হতে হবে। ধর্মের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে হবে।

জঙ্গীবাদ ও বাংলাদেশের আইনঃ

নিরাপত্তা সম্পর্কিত কোন বিধান সংবিধানে না রেখেই বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালে যাত্রা শুরু করে। ১৯৭৩ সালে তড়িঘড়ি করে এটা সংশোধিত হয় এবং ৭৪ সালে এ আইনের অধীনেই জরুরি অবস্থা জারী হয় । আবার ১৯৭৪ সালের স্পেশাল পাওয়ার অ্যক্ট ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর জারি করা হয়। ১৯৮১ সালেও এটা একবার জারি করা হয়। ১৯৮৭ সালে এবং ৯০ সালে একবার জারি করা হয় জরুরি অবস্থা। অব্যাহত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং সংঘাতের কারণে ২০০৭ সালে একবার জরুরি অবস্থা জারি হয়, যা ২০০৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে। নাইন ইলেভেন পরবর্তী বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় উগ্রপন্থা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে আভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে ২০০৭ সালে সন্ত্রাসবিরোধী অধ্যাদেশ পাস হয়। এরপর দুই দফায় আইনে সংশোধনী আনা হয়।

বাংলাদেশে সন্ত্রাস বিরোধী আইন গুলো নিম্নরুপঃ

দ্য আর্মস এ্যাক্ট, ১৮৭৮

দ্য এক্সপ্লোসিভ এ্যাক্ট, ১৮৮৪

দ্য আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার এক্সটেনশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৪২

দ্য স্মাগলিং অফ আর্মস এ্যাক্ট, ১৯৩৪

দ্য এক্সপ্লোসিভস সাবসটেন্সেস এ্যাক্ট, ১৯০৮

দ্য এনিমি এজেন্টস অর্ডিন্যান্স, ১৯৪৩

দ্য কন্ট্রোল অফ ডিসঅর্ডারলি এন্ড ডেন্‌জারাস পার্সনস (গুন্ডাস) এ্যাক্ট, ১৯৫৪ ইস্ট বেঙ্গল এ্যাক্ট

দ্য ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস (ট্রাইব্যুনালস) এ্যাক্ট, ১৯৭৩

দ্য স্পেশাল পাওয়ার এ্যাক্ট, ১৯৭৪

দ্য আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নস অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৯

সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন বিশেষ আইন, ১৯৯৪

বিমান-নিরাপত্তা বিরোধী অপরাধ দমন আইন,১৯৯৭

দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন, ২০০৩

যৌথ অভিযান দায়মুক্তি আইন, ২০০৩

আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২

রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ আইন, ২০০৬

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন , ২০০৯

সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯

অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২,

Dhaka University Institutional Repository

সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) আইন-২০১২

(২০১২ সনের ৬ নং আইন)

২০ ফেব্রুয়ারী ২০১২

সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১২ প্রচলিত আইনগুলোর সারসংক্ষেপ:

সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬নং আইন) এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ–

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন	১। (১) এই আইন সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে। (২) ইহা অবিলম্বে কাযর্কর হইবে।
২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন	২। সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (২), (১০) ও (১৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২), (১০) ও (১৪) প্রতিস্থাপিত হইবে এবং উপ-ধারা (১৫) এর পর নিম্নরূপ নতুন উপ-ধারা (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯) ও (৩০) সংযোজিত হইবে, যথাঃ– (২) 'অস্ত্র' অর্থ অস্ত্র আইন, ১৮৭৮ (১৮৭৮ সনের ১১ নং আইন) এর ধারা ৪ এ বর্ণিত অস্ত্রশস্ত্র এবং যে কোন ধরনের পারমাণবিক, রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্রও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; (১০) 'ব্যাংক' অর্থ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৫ (ণ) এ সংজ্ঞায়িত ব্যাংক কোম্পানী এবং অন্য কোন আইন বা অধ্যাদেশের অধীন ব্যাংক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত যে কোন প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; (১৪) 'সম্পত্তি' অর্থ দেশে বা দেশের বাহিরে অবস্থিত– (অ) বস্তুগত বা অবস্তুগত, স্থাবর বা অস্থাবর, দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান যে কোন ধরণের সম্পত্তি ও উক্ত সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত লাভ, এবং কোন অর্থ বা অর্থে রূপান্তরযোগ্য বিনিময় দলিলও (negotiable instrument) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; (আ) নগদ টাকা, ইলেকট্রনিক বা ডিজিটালসহ অন্য যে কোন প্রকৃতির দলিল বা ইন্সট্রুমেন্ট যাহা কোন সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব বা মালিকানা স্বত্বে কোন স্বার্থ নির্দেশ করে; (১৬) 'সন্দেহজনক লেনদেন' অর্থ এইরূপ লেনদেন– (১) যাহা স্বাভাবিক লেনদেনের ধরণ হইতে ভিন্ন; (২) যেই লেনদেন সম্পর্কে এইরূপ ধারণা হয় যে, (ক) ইহা কোন অপরাধ হইতে অর্জিত সম্পদ, (খ) ইহা কোন সন্ত্রাসী কার্যে, কোন সন্ত্রাসী সংঘটনকে বা কোন সন্ত্রাসীকে অর্থায়ন; (৩) যাহা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময়ে সময়ে, জারিকৃত নির্দেশনায় বর্ণিত অন্য কোন লেনদেন বা লেনদেনের প্রচেষ্টা; (১৭) 'সত্তা' অর্থ কোন আইনী প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বাণিজ্যিক বা অবাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী, অংশিদারী কারবার, সমবায় সমিতিসহ এক বা একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত যে কোন সংগঠন; (১৮) 'আর্থিক প্রতিষ্ঠান' অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ২(খ) এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

Dhaka University Institutional Repository

	(১৯) 'বীমাকারী' অর্থ বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ২(২৫) এ সংজ্ঞায়িত বীমাকারী; (২০) 'রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা' অর্থ– (অ) ব্যাংক; (আ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান; (ই) বীমাকারী; (ঈ) মানি চেঞ্জার; (উ) অর্থ অথবা অর্থমূল্য প্রেরণকারী বা স্থানান্তরকারী যে কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান; (ঊ) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতিক্রমে ব্যবসা পরিচালনাকারী অন্য কোন প্রতিষ্ঠান; (ঋ) (১) ষ্টক ডিলার ও ষ্টক ব্রোকার (২) পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার (৩) সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান (৪) সম্পদ ব্যবস্থাপক; (এ) (১) অ-লাভজনক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (Non Profit Organisation) (২) বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা (Non Government Organisation)ও (৩) সমবায় সমিতি; (ঐ) রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার; (ও) মূল্যবান ধাতু বা পাথরের ব্যবসায়ী; (ঔ) ট্রাস্ট ও কোম্পানী সেবা প্রদানকারী; (অঅ) আইনজীবী, নোটারী, অন্যান্য আইন পেশাজীবী এবং একাউন্টেন্ট; (অআ) সরকারের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময়ে সময়ে, বিজ্ঞপ্তি জারীর মাধ্যমে ঘোষিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান; (২১) 'মানি চেঞ্জার' অর্থ Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এর section 3 এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান; (২২) (অ) 'ষ্টক ডিলার ও ষ্টক ব্রোকার' অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (ষ্টক ডিলার, ষ্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর যথাক্রমে বিধি ২(ঝ) ও ২(ঞ) এ সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান; (আ) 'পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার' অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর যথাক্রমে বিধি ২(চ) ও ২(ঞ) এ সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান; (ই) 'সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান' অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সিকিউরিটি কাস্টডিয়াল সেবা) বিধিমালা, ২০০৩ এর বিধি ২(ঞ) এ সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান; (ঈ) 'সম্পদ ব্যবস্থাপক' অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়েল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর বিধি ২(ধ) এ সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান; (২৩) 'অ-লাভজনক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (Non Profit Organisation)' অর্থ কোম্পানী আইন

Dhaka University Institutional Repository

	(বাংলাদেশ), ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২৮ এর অধীন সনদ প্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান; (২৪) 'বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (Non Government Organisation) ' অর্থ Societies Registration Act, 1860 (Act No. XXI of 1860), Voluntary Social Welfare Agencies (Registration and Control) Ordinance (Ordinance No. XLVI of 1961), Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 (Ordinance No. XLVI of 1978), Foreign Contributions (Regulation) Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXXI of 1982)), সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ নং আইন) এর আওতায় অনুমোদিত বা নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান যাহা– (ক) স্থানীয় উৎস হইতে তহবিল (ঋণ, অনুদান, আমানত) গ্রহণ করে বা অন্যকে প্রদান করে; এবং/অথবা (খ) যে কোন ধরণের বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণ বা অনুদান গ্রহণ করে; (২৫) 'বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) ' অর্থ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৪ (১) এর বিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট; (২৬) 'বস্তুগত সহায়তা (material support) ' অর্থ কোন ব্যক্তি বা সত্তা কর্তৃক অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তাকে অর্থ, সেবা বা অন্য কোন সম্পত্তি সরবরাহ করা বা অন্য কোন সহায়তা করা যাহা দ্বারা এই আইনের আওতায় বর্ণিত সন্ত্রাসী কর্মকান্ড সম্পাদিত হইয়াছে বা সম্পাদিত হইতে পারে; (২৭) 'হাইকোর্ট বিভাগ' অর্থ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ; (২৮) 'রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার' অর্থ রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ২ (১৫) এ সংজ্ঞায়িত যে কোন রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার বা উহার কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা এজেন্ট যাহারা জমি, বাসা বা বাড়ি, বাণিজ্যিক ভবন এবং ফ্লাটসহ ইত্যাদির নির্মাণ ও ক্রয়-বিক্রয়ের সহিত জড়িত; (২৯) 'ট্রাস্ট ও কোম্পানী সেবা প্রদানকারী' অর্থ কোন ব্যক্তি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যাহা অন্য কোন আইনে সংজ্ঞায়িত করা হয় নাই এবং যে বা যাহা কোন তৃতীয় পক্ষকে নিম্নরূপ সেবাসমূহ প্রদান করিয়া থাকেঃ (১) কোন আইনী সত্তা প্রতিষ্ঠার এজেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন; (২) কোন আইনী সত্তার পরিচালক, সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন বা অন্য কাহাকেও নিয়োগ করা বা অংশীদারী ব্যবসায়ে অংশীদার হিসাবে দায়িত্ব পালন অথবা সমপর্যায়ের অন্য কোন দায়িত্ব পালন; (৩) কোন আইনী সত্তার নিবন্ধিত এজেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন; (৪) কোন এক্সপ্রেস ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসাবে দায়িত্ব পালন বা অন্য কাহাকে নিয়োগ করা; (৫) নমিনি শেয়ার হোল্ডার বা অন্য কোন ব্যক্তির পরিবর্তে পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন বা অন্য ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান; (৩০) 'জননিরাপত্তা' অর্থ যে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান।''।
২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন	৩। উক্ত আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত 'ফৌজদারি কার্যবিধি' শব্দগুলির পর ',মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন' কমা ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

২০০৯ সনের ১৬নং আইনের ধারা ৫ এর প্রতিস্থাপন	৪। উক্ত আইনের ধারা ৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ– ৫। অতিরাষ্ট্রিক প্রয়োগ। (১) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা বাংলাদেশের বাহির হইতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন অপরাধ সংঘটন করে যাহা উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা কর্তৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে সংঘটিত হইলে এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য হইত, তাহা হইলে উক্ত অপরাধ বাংলাদেশে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা ও অপরাধের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে। (২) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে বাংলাদেশের বাহিরে কোন অপরাধ সংঘটন করে, যাহা বাংলাদেশে সংঘটিত হইলে এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য হইত, তাহা হইলে উক্ত অপরাধ বাংলাদেশে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা ও অপরাধের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।''।
২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৬ এর প্রতিস্থাপন	৫। উক্ত আইনের ধারা ৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ ৬। সন্ত্রাসী কার্য। (১) (ক) কোন ব্যক্তি বা সত্তা বাংলাদেশের অখণ্ডতা, সংহতি, জননিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করিবার জন্য জনসাধারণ বা জনসাধারণের কোন অংশের মধ্যে আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার বা কোন সত্তা বা কোন ব্যক্তিকে কোন কার্য করিতে বা করা হইতে বিরত রাখিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে- (অ) কোন ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর আঘাত, আটক, অপহরণ করিলে বা এই কাজে সহায়তা করিলে, বা কোন ব্যক্তি বা সত্তা বা রাষ্ট্রের কোন সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করিলে বা ক্ষতিসাধন করিতে সহায়তা করিলে; (আ) কোন ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর আঘাত, আটক, অপহরণ করার জন্য প্ররোচিত করিলে, বা প্রচেষ্টা গ্রহণ করিলে, বা কোন ব্যক্তি বা সত্তা বা রাষ্ট্রের কোন সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করার কার্যে প্ররোচিত করিলে, বা প্রচেষ্টা গ্রহণ করিলে; অথবা (ই) উপ-দফা (অ) ও (আ) এর উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন বিস্ফোরক দ্রব্য, দাহ্য পদার্থ ও কোন অস্ত্র ব্যবহার করিলে বা নিজ দখলে রাখিলে; (খ) কোন ব্যক্তি বা সত্তা বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে অন্য কোন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করিবার লক্ষ্যে কোন অপরাধ সংঘটন করিলে বা অপরাধ সংঘটনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করিলে বা প্ররোচিত করিলে বা সহায়তা করিলে অথবা অন্য কোন রাষ্ট্রের কোন সম্পত্তির ক্ষতিসাধনকল্পে কোন ব্যক্তি বা সত্তার আর্থিক সংশ্লেষ থাকিলে বা উক্ত অপরাধ কার্যে লিপ্ত হইলে বা প্রচেষ্টা গ্রহণ করিলে বা প্ররোচিত করিলে বা সহায়তা প্রদান করিলে; (গ) কোন ব্যক্তি বা সত্তা জ্ঞাতসারে সন্ত্রাসী কার্য হইতে উদ্ভূত বা কোন সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কর্তৃক প্রদত্ত কোন অর্থ বা সম্পদ ভোগ করিলে বা দখলে রাখিলে; (ঘ) কোন বিদেশী নাগরিক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দফা (ক), (খ) ও (গ) এর অধীনে কোন অপরাধ করিলে; তিনি ''সন্ত্রাসী কার্য'' সংঘটনের অপরাধ করিবেন। (২) কোন ব্যক্তি বা সত্তা সন্ত্রাসী কার্য সংঘটন করিয়া থাকিলে, তিনি বা উক্ত সত্তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তিনি বা তাহারা যে নামেই পরিচিত হউক না কেন, মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব বিশ বৎসর এবং অন্যূন চার বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন, এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে।''।
২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৭ এর প্রতিস্থাপন	৬। উক্ত আইনের ধারা ৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ– ৭। সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত অপরাধ। (১) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা জ্ঞাতসারে অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তাকে অর্থ, সেবা, বস্তুগত সহায়তা (material support) , বা অন্য কোন সম্পত্তি সরবরাহ করেন বা সরবরাহের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যাহাতে ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, উহা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সত্তা বা গোষ্ঠী বা সংগঠন কর্তৃক যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি বা উক্ত সত্তা

Dhaka University Institutional Repository

	সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন। (২) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা জ্ঞাতসারে অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তার নিকট হইতে অর্থ, সেবা, বস্তুগত সহায়তা (material support) , বা অন্য কোন সম্পত্তি গ্রহণ করেন যাহাতে ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, উহা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সত্তা বা গোষ্টি বা সংগঠন কর্তৃক যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি বা উক্ত সত্তা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন। (৩) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা জ্ঞাতসারে অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তার জন্য অর্থ, সেবা, বস্তুগত সহায়তা (material support) , বা অন্য কোন সম্পত্তির ব্যবস্থা করেন যাহাতে ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, উহা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সত্তা বা গোষ্ঠি বা সংগঠন কর্তৃক যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি বা উক্ত সত্তা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন। (৪) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা জ্ঞাতসারে অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তাকে অর্থ, সেবা, বস্তুগত সহায়তা (material support) , বা অন্য কোন সম্পত্তি সরবরাহ বা গ্রহণ বা ব্যবস্থা করিবার ক্ষেত্রে এমনভাবে প্ররোচিত করেন যাহাতে ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, উহা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সত্তা বা গোষ্ঠী বা সংগঠন কর্তৃক যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি বা উক্ত সত্তা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন। (৫) উপ-ধারা (১) হইতে (৪) এ বর্ণিত অপরাধে কোন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইলে, উক্ত ব্যক্তি অনধিক বিশ বৎসর ও অন্যূন চার বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, এবং ইহার অতিরিক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুণ মূল্যের সমপরিমান বা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, সেই পরিমান অর্থদণ্ডও আরোপ করা যাইবে। (৬) (ক) উপ-ধারা (১) হইতে (৪) এ বর্ণিত অপরাধে কোন সত্তা দোষী সাব্যস্ত হইলে ধারা ১৮ এর বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে এবং ইহার অতিরিক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির তিনগুণ মূল্যের সমপরিমান বা ৫০(পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, সেই পরিমান অর্থদণ্ডও আরোপ করা যাইবে; এবং (৬) (খ) উক্ত সত্তার প্রধান, তাহাকে চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য যে কোন নামে ডাকা হউক না কেন, তিনি অনধিক বিশ বৎসর ও অন্যূন চার বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, এবং ইহার অতিরিক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুণ মূল্যের সমপরিমান বা ২০(বিশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, সেই পরিমান অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।''।
২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৩ এর সংশোধন	৭। উক্ত আইনের ধারা ১৩ এ উল্লিখিত 'স্বেচ্ছাধীন' শব্দটি বিলুপ্ত হইবে এবং 'কোন মুদ্রণ বা ইলেকট্রনিক' শব্দগুলির পর 'বা অন্য যে কোন' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।
২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৫ এর প্রতিস্থাপন	৮। উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ ১৫। বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা। (১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার মাধ্যমে লেনদেন প্রতিরোধ ও সনাক্ত করিতে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উহার নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকিবে, যথাঃ (ক) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত

	প্রতিবেদন তলব করা; (খ) উপ-দফা (ক) অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রদান করা বা ক্ষেত্রমত, বৈদেশিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অনুরোধের প্রেক্ষিতে উক্ত সংস্থাকে প্রদান করা বা উক্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে তথ্য বিনিময় করা; (গ) সকল পরিসংখ্যান ও রেকর্ড সংকলন ও সংরক্ষণ করা; (ঘ) সকল সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত রিপোর্টের ডাটা বেজ সৃষ্টি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা; (ঙ) সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করা; (চ) কোন লেনদেন সন্ত্রাসী কার্যের সহিত সম্পৃক্ত মর্মে সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিলে সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে উক্ত লেনদেনের হিসাব অনধিক ত্রিশ দিনের জন্য স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার উদ্দেশ্যে লিখিত আদেশ জারী করা এবং এইরূপে উক্ত হিসাবের লেনদেন সম্পর্কিত সঠিক তথ্য উদ্ঘাটনের প্রয়োজন দেখা দিলে লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার মেয়াদ অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিন করিয়া সর্বোচ্চ ৬(ছয়) মাস বর্ধিত করা; (ছ) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার কার্যাবলী পরিবীক্ষণ ও তদারক করা; (জ) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে নির্দেশ প্রদান করা; (ঝ) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের সহিত জড়িত সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তের উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহ পরিদর্শন করা; এবং (ঞ) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থযোগানের সহিত জড়িত সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্ত ও প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। (২) বাংলাদেশ ব্যাংক, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থযোগানের সহিত জড়িত সন্দেহজনক কোন লেনদেনের বিষয় কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বা ইহার গ্রাহককে সনাক্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গে, উহা যথাযথ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করিবে এবং অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যে উক্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করিবে। ৩) অন্য দেশে সংঘটিত বিচারাধীন অপরাধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকার কর্তৃক গৃহীত কোন আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক বা দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি, জাতিসংঘের কনভেনশন বা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহিত সংশ্লিষ্ট রেজুলেশনের আওতায় কোন ব্যক্তি বা সত্তার হিসাব জব্দ করার উদ্যোগ গ্রহণ করিবে। (৪) উপ-ধারা (৩) এর আওতায় জব্দকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট চুক্তি, কনভেনশন বা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহিত সংশ্লিষ্ট রেজুলেশনের আলোকে সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে। (৫) উপ-ধারা (১) হইতে (৩) এ বর্ণিত দায়িত্ব সম্পাদনের স্বার্থে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে তদ্‌কর্তৃক যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করিবে, বা ক্ষেত্রমত, স্বপ্রণোদিত হইয়া তথ্যাদি সরবরাহ করিবে। (৬) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট চাহিদা অনুযায়ী বা ক্ষেত্রমত, স্বপ্রণোদিতভাবে সন্ত্রাসী কার্য বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সম্পৃক্ত তথ্যাদি অন্য দেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে সরবরাহ করিতে পারিবে। (৭) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের বিষয়ে তদন্তের স্বার্থে কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক কোন

	ব্যাংকের দলিল বা কোন নথিতে নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রবেশাধিকার থাকিবে, যথাঃ– (ক) উপযুক্ত আদালত বা ট্রাইব্যুনালের আদেশক্রমে; অথবা (খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে।
২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৬ এর প্রতিস্থাপন	৯। উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ ১৬। রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার দায়িত্ব। (১) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার মাধ্যমে এই আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত জড়িত অর্থ লেনদেন প্রতিরোধ ও সনাক্ত করিবার লক্ষ্যে প্রত্যেক রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা যথাযথ সতর্কতা ও দায়িত্বশীলতার সহিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং কোন সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিত হইলে স্বপ্রনোদিত হইয়া কোন প্রকার বিলম্ব ব্যতিরেকে বাংলাদেশ ব্যাংককে রিপোর্ট করিবে। (২) প্রত্যেক রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার পরিচালনা পরিষদ (Board of Directors) বা পরিচালনা পরিষদের অনুপস্থিতিতে প্রধান নির্বাহী, বা অন্য যে নামে ডাকা হউক না কেন, উহার কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সম্পর্কিত নির্দেশনা অনুমোদন ও জারী করিবে, এবং ধারা ১৫ এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা, যাহা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহের জন্য প্রযোজ্য, প্রতিপালন করা হইতেছে কিনা উহা নিশ্চিত করিবে। (৩) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা ধারা ১৫ এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন নির্দেশনা পালন করিতে ব্যর্থ হইলে বা জ্ঞাতসারে কোন ভুল তথ্য সরবরাহ অথবা মিথ্যা তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ করিলে, উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত অনধিক দশ লক্ষ টাকা জরিমানা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ঐ সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে। (৪) উপ-ধারা (৩) মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত জরিমানা কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে বা পরিশোধ না করিলে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিজ নামে যে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালিত হিসাব বিকলনপূর্বক আদায় করিতে পারিবে এবং উক্ত জরিমানার কোন অংশ অনাদায়ী থাকিলে উহা আদায়ে, প্রয়োজনে, বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করিতে পারিবে।''।
২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৭ এর সংশোধন	১০। উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর দফা (ঘ) এর শেষাংশে উল্লিখিত 'অথবা' শব্দটি বিলুপ্ত হইবে এবং দফা (ঙ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঙ) ও (চ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ (ঙ) জাতিসংঘের রেজুলেশন নম্বর ১২৬৭ ও ১৩৭৩সহ বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত অন্যান্য রেজুলেশনসমূহের অন্তর্ভুক্ত সংগঠন হয়; অথবা (চ)অন্য কোন ভাবে সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত থাকে।
২০০৯ সনের ১৬নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন	১১।উক্ত আইনের ধারা ১৯ এ উল্লিখিত 'আবেদনকারীর শুনানী গ্রহণপূর্বক' শব্দগুলির পর 'এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি মোতাবেক' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।
২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২০ এর	১২। উক্ত আইনের ধারা ২০ এ উল্লিখিত 'এই আইনে বর্ণিত অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও,' শব্দগুলি ও কমার পর 'এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি মোতাবেক' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে এবং উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ

Dhaka University Institutional Repository

সংশোধন	(খ) উহার ব্যাংক ও অন্যান্য হিসাব, যদি থাকে, অবরুদ্ধ (freeze) করিবে এবং উহার সকল সম্পত্তি আটক করিবে;।
২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২২ এর সংশোধন	১৩। উক্ত আইনের ধারা ২২ এ উল্লিখিত 'প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট' শব্দগুলির পরিবর্তে 'জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।
২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৩ এর সংশোধন	১৪। উক্ত আইনের ধারা ২৩ এ উল্লিখিত 'প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট' শব্দগুলির পরিবর্তে 'জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।
২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৪ এর সংশোধন	১৫। উক্ত আইনের ধারা ২৪ এর (ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত 'ত্রিশ দিনের' শব্দগুলির পরিবর্তে 'ষাট দিনের' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; (খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত 'পনের দিন' শব্দগুলির পরিবর্তে 'ত্রিশ দিন' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; (গ) উপ-ধারা (৩) এ বাক্যের শেষে উল্লিখিত দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথাঃ ''তবে শর্ত থাকে যে, মামলার তদন্তের প্রয়োজনে বাংলাদেশের বাহিরে অন্য কোন দেশ হইতে সাক্ষ্য প্রমান সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন হইলে উপ-ধারা (১) হইতে (৩) এ বর্ণিত তদন্তের সময়সীমা প্রযোজ্য হইবে না।'' (ঘ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত 'তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে' শব্দগুলির পরিবর্তে 'তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগে অভিযুক্ত হইবেন' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।
২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৫ এর সংশোধন	১৬। উক্ত আইনের ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১) এ দুইবার উল্লিখিত 'ধারা ২৫' শব্দগুলি ও সংখ্যাগুলি এবং উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত 'ধারা ২৫' শব্দ ও সংখ্যার পরিবর্তে সকল স্থানে 'ধারা ২৪' শব্দ ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।
২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৯ এর সংশোধন	১৭। উক্ত আইনের ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত 'পুনঃতদন্তের' শব্দগুলির পরিবর্তে 'অধিকতর তদন্ত' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।
২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন	১৮।উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর দফা (খ) এ উল্লিখিত 'বিচারক' শব্দটির পরিবর্তে 'ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচারক' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।
২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন	১৯। উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত 'অভিযোগপত্র গঠনের' শব্দগুলির পরিবর্তে 'অভিযোগ গঠন (Charge frame) এর' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।
২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩৪ এর প্রতিস্থাপন	২০। উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ– ''৩৪। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড-লব্ধ সম্পদের দখল। (১) কোন সন্ত্রাসী বা অন্য কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠি, সত্তা, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হইতে উদ্ভূত, বা কোন সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসী গোষ্ঠি কর্তৃক প্রদত্ত কোন অর্থ বা সম্পদ ভোগ করিতে বা দখলে রাখিতে পারিবে না।

	(২) এই আইনের অধীন দণ্ডপ্রাপ্ত হউক বা না হউক, এইরূপ কোন সন্ত্রাসী বা অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের দখলে থাকা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড-লব্ধ সম্পদ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে। ব্যাখ্যা।– সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড-লব্ধ সম্পদ অর্থ এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে অর্জিত বা লব্ধ কোন অর্থ, সম্পত্তি বা সম্পদ। (৩) এই আইনের আওতায় কোন অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি বা সত্তার কোন সম্পত্তি, কোন বিদেশী রাষ্ট্র বা সংস্থার অনুরোধের প্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক জব্দযোগ্য হইবে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের সাথে পারস্পরিক আইনগত সহযোগিতার আওতায় বা ক্ষেত্রমত, সরকার কর্তৃক নিস্পত্তিযোগ্য হইবে। (৪) সরকার কর্তৃক গৃহীত কোন আর্ন্তজাতিক, আঞ্চলিক বা দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি, জাতিসংঘের কনভেনশন বা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহিত সংশ্লিষ্ট রেজুলেশনের আওতায় কোন ব্যক্তি বা সত্তার সম্পদ জব্দযোগ্য হইবে।''
২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩৫ এর প্রতিস্থাপন	২১।উক্ত আইনের ধারা ৩৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ ''৩৫। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড-লব্ধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত । (১) যেক্ষেত্রে বিচারক এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন সন্ত্রাসী কার্য হইতে উদ্ভূত হইবার কারণে কোন সম্পত্তি জব্দ বা ক্রোক করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে তিনি উক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোন সন্ত্রাসী কার্য হইতে উদ্ভূত কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইলে, যে সত্তার নিকট হইতে উক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে, সেই সত্তার বিরুদ্ধে এই আইনের ধারা ১৮ ও ২০ এ বর্ণিত আইনানুগ ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক গ্রহণ করা যাইবে। (৩) এই আইনের ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী জব্দকৃত সম্পদ সংশ্লিষ্ট চুক্তি, কনভেনশন বা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহিত সংশ্লিষ্ট রেজুলেশনের আলোকে সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক বাজেয়াপ্তযোগ্য ও নিস্পত্তিযোগ্য হইবে। (৪) বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদে দোষী ব্যক্তি বা সত্তা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তার স্বত্ব, স্বার্থ বা অধিকার থাকিলে উহা সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক ফেরতযোগ্য হইবে।''।
২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩৬ এর সংশোধন	২২। উক্ত আইনের ধারা ৩৬ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত 'লিখিত নোটিশ প্রদানপূর্বক বাজেয়াপ্ত করিবার কারণ অবহিত না করিয়া' শব্দগুলির পরিবর্তে 'ফৌজদারি কার্যবিধির বিধান অনুসরণপূর্বক কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করিতে হইবে' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।
২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩৮ এর সংশোধন	২৩। উক্ত আইনের ধারা ৩৮ এর– (ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত 'বহিঃসমর্পন সম্পর্কিত' শব্দগুলির পর 'চুক্তি মোতাবেক' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে; (খ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত 'এই আইনের অধীন' শব্দগুলির পরিবর্তে 'আন্তঃরাষ্ট্রিক পারস্পরিক সম্মতি ব্যতিরেকে' শব্দগুলি এবং বাক্যের শেষে উল্লিখিত দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথাঃ–''তবে বাংলাদেশের কোন আদালতে একই অপরাধের অভিযোগে বিচার চলমান থাকিলে বাংলাদেশের কোন নাগরিকের বহিঃসমর্পণ কার্যকর করা হইবে না ।" ।
রহিতকরণ ও হেফাজত	২৪। (১) সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১২ (২০১২ সনের ৩ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল । (২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এর অধীন কৃত কোন কাজকর্ম বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইন দ্বারা সংশোধিত উক্ত আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গন্য হইবে । (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিচারও সংসদীয় বিষয়ক– সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১২)

Dhaka University Institutional Repository

২০১২ সনের নং অধ্যাদেশ, ১৭ জানুয়ারী-২০১২

অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তার বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ:

যেহেতু অপরাধমূলক কার্যের মাধ্যমে অর্জিত বা সন্ত্রাসী কার্যের সহিত সম্পৃক্ত অথবা সন্ত্রাসী সম্পত্তি ফ্রিজ বা আটক সম্পর্কিত বিষয়সহ অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে অনুসন্ধান, প্রসিকিউশন এবং বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহায়তা প্রদান বা গ্রহণের জন্য বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং যেহেতু সংসদ অধিবেশনে নাই এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে: সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেনঃ

	অধ্যায়–১, প্রারম্ভিক
সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন	১। (১) এই অধ্যাদেশ অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা অধ্যাদেশ, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে। (২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখ হইতে ইহা কার্যকর হইবে।
সংজ্ঞা	২।বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে- (১) '' অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়'' অর্থ বাংলাদেশ এবং সহায়তার জন্য অনুরোধকারী রাষ্ট্রের আইনে অপরাধ সংঘটন করে এমন বিষয়ে `অনুসন্ধান, তদন্ত, বিচারিক বা অন্যান্য কার্যধারা এবং নিম্নলিখিত বিষয়ও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা– (ক) কোন সম্পত্তি সন্ত্রাসী কার্যের মাধ্যমে অর্জিত, সন্ত্রাসী কার্যের সহিত সম্পৃক্ত অথবা সন্ত্রাসী সম্পত্তি (Terrorist Property) বা মানি লন্ডারিং সম্পর্কিত অপরাধ কিনা উহা নির্ধারণ; (খ) ফৌজদারী অভিযোগ গঠনের ভিত্তিতে হউক বা না হউক, সম্ভাব্য বাজেয়াপ্তি আদেশ; (গ) সন্ত্রাসী কার্যের মাধ্যমে অর্জিত বা সন্ত্রাসী কার্যের সহিত সম্পৃক্ত অথবা সন্ত্রাসী সম্পত্তি ফ্রিজ করা বা আটক করা; (২) '' উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ'' অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন কোন বিদেশী রাষ্ট্র হইতে যাচিত সহায়তার অনুরোধের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত অনুরুদ্ধ সংস্থা যাহা সংশ্লিষ্ট সহায়তা প্রদানে কর্তৃত্ববান এবং কার্যক্রম গ্রহণে সক্ষম; (৩) ''এগ্রিমেন্ট'' অর্থ বলবৎ কোন ট্রিটি, কনভেনশন বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তি যাহাতে বাংলাদেশ পক্ষভুক্ত হইয়াছে এবং যাহাতে অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা প্রদানের বিষয়ে এক বা একাধিক বিধান রহিয়াছে; (৪) ''কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ'' অর্থ এই অধ্যাদেশের ধারা ৩ অনুযায়ী নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ; (৫) ''কম্পিউটার ড্যাটা'' অর্থ কম্পিউটার সিস্টেমে প্রক্রিয়াকরণের উপযুক্ত ফরমে কোন বিষয়বস্তু, তথ্য বা ধারণা উপস্থাপন এবং কোন কার্য সম্পাদনের জন্য কম্পিউটার সিস্টেমের উপযুক্ত কোন প্রোগ্রামও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; (৬) ''কম্পিউটার সিস্টেম ''অর্থ এক বা একাধিক পারস্পরিক সংযুক্ত ডিভাইস যাহা কোন প্রোগ্রাম তৈরি করে অথবা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ড্যাটা প্রক্রিয়াকরণ বা রেকর্ড করে; (৭) '' গ্রাহক তথ্য'' অর্থ কম্পিউটার ড্যাটার ফরম বা অন্য কোন ফরমে ধারণকৃত তথ্য যাহা সার্ভিস প্রোভাইডার কর্তৃক গ্রাহকের প্রেরণকৃত সার্ভিসের জন্য ধারণকৃত, তবে এইরূপ ট্রাফিক বা কন্টেন্ট ড্যাটা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না যাহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, যথা:– (ক) ব্যবহৃত কমিউনিকেশন সার্ভিসের ধরণ, ইহার সহিত সম্পর্কিত কারিগরি বিষয়াদি এবং

	সেবা প্রদানের সময়; (খ) গ্রাহকের পরিচিতি, পত্রযোগাযোগ বা অন্য কোন যোগাযোগের ঠিকানা, টেলিফোন এবং অন্যান্য একসেস নাম্বার; বিল পরিশোধের তথ্যসহ কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট স্থাপনের স্থান সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য যাহা সার্ভিসের মাধ্যমে বা সার্ভিস হইতে প্রকাশ করা হয়। (৮) ''ট্রাফিক ড্যাটা '' অর্থ কম্পিউটার সিস্টেমের মাধ্যমে যোগাযোগ সম্পর্কিত যে কোন কম্পিউটার ড্যাটা যাহা কম্পিউটার সিস্টেমের মাধ্যমে উৎপাদিত এবং যোগাযোগের উৎস, গন্তব্য, রুট, সময়, তারিখ, আকার, মেয়াদ বা ধরন সংক্রান্ত যোগাযোগের চেইনের কোন অংশ গঠন করে; (৯) ''ফ্রিজিং বা আটক'' অর্থ সাময়িকভাবে কোন সম্পদ হস্তান্তর, রূপান্তর, বিন্যাস বা স্থানান্তর নিষিদ্ধ করা অথবা সাময়িকভাবে হেফাজতে গ্রহণ করা অথবা আদালত বা অন্য কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশের ভিত্তিতে উক্ত সম্পদের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ এবং নিরোধমূলক আদেশও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; (১০) '' ফৌজদারী কার্যবিধি'' অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898); (১১) ''সহায়তা'' অর্থ অনুসন্ধান, প্রসিকিউশন, বাজেয়াপ্তকরণ এবং অপরাধ সম্পর্কিত বিচারিক ও অন্যান্য কার্যধারা; (১২) ''সন্ত্রাসী সম্পদ'' অর্থ কোন সম্পদ যাহা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সন্ত্রাসী কার্যে ব্যবহৃত হইয়াছে বা ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাপ্ত এবং বাংলাদেশ বা কোন বিদেশী রাষ্ট্র কর্তৃক সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা সত্ত্বার সম্পদ; (১৩) ''সার্ভিস প্রোভাইডার '' অর্থ (ক) কোন সরকারি বা বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যিনি বা যাহা কম্পিউটার সিস্টেমের মাধ্যমে কোন ব্যবহারকারীকে যোগাযোগের সামর্থ্য সরবরাহ করে; এবং (খ) অন্য কোন ব্যক্তি, সত্ত্বা বা সংস্থা যিনি বা যাহা উক্ত সার্ভিসের বা উক্ত সার্ভিসের ব্যবহারকারীর পক্ষে কম্পিউটার ড্যাটা প্রক্রিয়াকরণ বা সংরক্ষণ করেন।
	অধ্যায়-২, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ
কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ	৩। (১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করিবে। (২) কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ উহার সকল বা যে কোন দায়িত্ব যে কোন সরকারি কর্মকর্তার অনুকূলে অর্পণ করিতে পারিবে।
কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও দায়িত্ব	৪। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:– (ক) কোন বিদেশী রাষ্ট্র কর্তৃক যাচিত সহায়তার অনুরোধ গ্রহণ করা এবং উহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট কার্যব্যবস্থার জন্য প্রেরণ করা; (খ) কোন বিদেশী রাষ্ট্র হইতে সহায়তা প্রাপ্তির জন্য বাংলাদেশের অনুরোধ গ্রহণ করা এবং উহার প্রেক্ষিতে বিদেশী রাষ্ট্রকে সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা; (গ) সহায়তা প্রদান বা গ্রহণ করা হইবে কিনা, সে সম্পর্কিত বিষয় বিবেচনা ও নির্ধারণ করা; (ঘ) সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কার্য তৎপরতা অনুসরণ এবং উহা দ্রুত নিষ্পত্তির মাধ্যমে অনুরোধকারী রাষ্ট্রের কার্যব্যবস্থার পরিসমাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করা; (ঙ) এই অধ্যাদেশের অধীন কোন বিদেশী রাষ্ট্রকে সহায়তা প্রদান করিবার ক্ষেত্রে বা কোন বিদেশী রাষ্ট্র হইতে সহায়তা গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে সমন্বয়কারীর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগ; (চ) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সহায়তার অনুরোধে সাড়া প্রদানের নিমিত্ত শর্তাদি

Dhaka University Institutional Repository

	নির্ধারণ ও পদ্ধতিগত বিধান প্রণয়ন করা; এবং (ছ) এই অধ্যাদেশের অধীন যাচিত সহায়তা কার্যকরকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
উপদেষ্টা বোর্ড	৫। কোন বিদেশী রাষ্ট্র হইতে সহায়তা গ্রহণ বা কোন বিদেশী রাষ্ট্রকে সহায়তা প্রদানের বিষয়টিতে সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা, গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বা সামরিক অপরাধ জাতীয় প্রশ্ন জড়িত থাকিবার সম্ভাবনার ক্ষেত্রে মতামত প্রদানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে সাহায্যের জন্য একটি উপদেষ্টা বোর্ড থাকিবে এবং উক্ত উপদেষ্টা বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:– (ক) অ্যাটর্নি-জেনারেল কর্তৃক মনোনীত অতিরিক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন প্রতিনিধি, যিনি উপদেষ্টা বোর্ডের চেয়ারম্যানও হইবেন ; (খ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি যিনি যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন; (গ) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি যিনি যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন; (ঘ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি যিনি মহাপরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন; (ঙ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি যিনি যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন; (চ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি যিনি যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন; (ছ) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি যিনি যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন; (জ) সলিসিটর, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ; (ঝ) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি যিনি যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন; (ঞ) কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য যিনি উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করিবেন; এবং (ট) সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ০১ (এক)
উপদেষ্টা বোর্ডের কার্য-পদ্ধতি	৬। (১) কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরোধ করা হইলে উপদেষ্টা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে তৎকর্তৃক নির্ধারিত স্থান, সময় ও তারিখে সদস্য সচিব কর্তৃক উপদেষ্টা বোর্ডের সভা আহবান করা হইবে। (২) উপদেষ্টা বোর্ডকে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে। (৩) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, উপদেষ্টা বোর্ড উহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে। (৪) কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারণ করিয়া দেওয়া না হইলে, উপদেষ্টা বোর্ড সর্বসম্মতিক্রমে বোর্ডের মেয়াদকাল নির্ধারণ করিবেন। (৫) উপদেষ্টা বোর্ডের প্রথম সভা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আহবান করা যাইবে।
সিদ্ধান্তের চূড়ান্ততা	৭। এই অধ্যাদেশের অধীন সহায়তা গ্রহণ বা প্রদানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, উপদেষ্টা বোর্ডের মতামতের সহিত কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ একমত পোষণ না করিলে বিষয়টি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সমীপে উত্থাপিত হইবে এবং তৎকর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

	অধ্যায়-৩ **সহায়তা প্রদান এবং সহায়তার জন্য অনুরোধ** **অংশ-১, সাধারণ বিধানাবলী**
সহায়তার পরিধি	৮। (১) কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত বাংলাদেশের অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তার এগ্রিমেন্ট থাকুক বা না থাকুক, অপরাধ সংঘটনের বিষয়ে অনুসন্ধান, তদন্ত, বিচারিক বা অন্যান্য কার্যধারার বিষয়ে কোন বিদেশী রাষ্ট্র কর্তৃক সহায়তা যাচনা করা হইলে এবং উক্ত অপরাধ ঐ দেশের আইনে শাস্তিযোগ্য হইলে উক্ত বিষয়ে সর্বোত্তম পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদান করিতে হইবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ কর্তৃক অনুরূপ সহায়তা যাচনা করা হইলে উক্ত অনুরোধকারী রাষ্ট্র একইরূপে সহায়তা প্রদান করিবে মর্মে অনুরোধপত্রে প্রত্যয়ন করিতে হইবে। (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অনুরোধকারী রাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের মধ্যে অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তার এগ্রিমেন্ট না থাকিলে বা এগ্রিমেন্টে ভিন্নতর বিধান না থাকিলে, যে আইনের অধীন অপরাধ বিষয়ে সহায়তা যাচনা করা হইতেছে তাহা বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ হইতে হইবে। (৩) এই অধ্যাদেশে পারস্পরিক সহায়তার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথাঃ (ক) কোন ব্যক্তির সন্ধান করা বা সনাক্ত করা; (খ) কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ বা বক্তব্য গ্রহণ করা; (গ) বিদেশী আদালতের প্রসেস জারী করা; (ঘ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মূল বা সার্টিফাইড ডকুমেন্ট, রেকর্ড এবং তথ্য সরবরাহ করা যাহার মধ্যে ব্যাংক, আর্থিক, কর্পোরেট বা ব্যবসায়িক রেকর্ডও অন্তর্ভুক্ত হইবে; (ঙ) তদন্তে সহযোগিতা বা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আটককৃত বা অন্য কোন ব্যক্তিকে সহজে পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা; (চ) অনুসন্ধান এবং বাজেয়াপ্তিকরণ বা গ্রেফতার; এবং (ছ) এই অধ্যাদেশের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্য যে কোন ধরনের সহযোগিতা যা পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে রাষ্ট্রসমূহ প্রদান করিতে সম্মত হয়। (৪) এই অধ্যাদেশে পারস্পরিক সহায়তার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথাঃ (ক) বহিঃসমর্পনের (extradition) উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে আটক বা আটকবস্থায় রাখা; (খ) শাস্তি প্রদানের জন্য জেল হেফাজতে (custody) থাকা কোন ব্যক্তিকে হস্তান্তর করা; (গ) বাংলাদেশের আদালতে বিচারাধীন বিষয়ে হস্তান্তর; এবং (ঘ) মিলিটারী আইনের অধীনকৃত অপরাধ, যাহা সাধারণ ফৌজদারী আইনে কৃত অপরাধ নয়। (৫) আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল হইতে সহায়তার জন্য অনুরোধের ক্ষেত্রেও এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী প্রয়োগ করা যাইবে।
সহায়তার অনুরোধ প্রেরণ ও গ্রহণ	৯। (১) বাংলাদেশের সহিত যেইসকল দেশের সহায়তা বিষয়ে এগ্রিমেন্ট রহিয়াছে, সেই সকল দেশ সহায়তার জন্য সরকারের কার্যপ্রণালী বিধি (Rules of Business) অনুসরণক্রমে সরাসরি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতে পারিবে। (২) যেই সকল দেশের সহিত বাংলাদেশের সহায়তা বিষয়ে কোন এগ্রিমেন্ট নাই, সেইসকল দেশ কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে উহার অনুরোধ কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবে। (৩) কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরম, বিধান বা পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া যে কোন সহায়তার অনুরোধ পেশ করিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

	(৪) কোন বিদেশী রাষ্ট্র হইতে সহায়তার অনুরোধ প্রাপ্ত হইলে, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিবে যে, অনুরোধটি যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া এবং প্রয়োজনীয় দলিলাদি সন্নিবেশ করিয়া প্রেরণ করা হইয়াছে কিনা অর্থাৎ সহায়তার অনুরোধটি সহায়তা প্রদানের জন্য উপযুক্ত কিনা এবং উপযুক্ত বিবেচিত হইলে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।
সহায়তার অনুরোধ প্রত্যাখান বা স্থগিত রাখা	১০। (১) সহায়তার অনুরোধটি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত না হইলে, উহা অগ্রাহ্য করা যাইবে এবং অগ্রাহ্য করিবার কারণ বিবৃত করিয়া উহা অনুরোধকারী রাষ্ট্রকে অবহিত করিতে হইবে। (২) যদি নির্দিষ্ট কোন শর্ত পূরণের মাধ্যমে অনুরোধ কার্যকর করা যায়, তবে অনুরোধকারী রাষ্ট্রকে উক্ত শর্ত পূরণের জন্য অনুরোধ করা যাইবে এবং শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কার্যকরকরণ স্থগিত রাখা যাইবে। (৩) যদি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কোন নির্দিষ্ট অনুরোধ কার্যকর করিলে উহা বাংলাদেশে বিবেচনাধীন কোন অনুসন্ধান, তদন্ত, প্রসিকিউশন বা ফৌজদারী কার্যধারায় বিরূপ প্রভাব ফেলিতে পারে, সেইক্ষেত্রে সহায়তার অনুরোধ স্থগিত রাখিতে বা শর্তযুক্ত করিতে পারিবে এবং উহা অনুরোধকারী রাষ্ট্রকে জানাইতে হইবে। (৪) সহায়তার অনুরোধটি প্রত্যাখান করা যাইবে, যদি সহায়তার বিষয়বস্তু এমন প্রকৃতির হয় যে, উক্ত বিষয়ে বাংলাদেশে প্রচলিত আইনে বিচার কার্য সম্পন্ন হইয়াছে । (৫) সহায়তার অনুরোধ কার্যকরকরণে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, জাতীয় নিরাপত্তা, গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থ ও জনশৃঙ্খলা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বা অন্য কোন স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা থাকিলে অনুরোধটি প্রত্যাখান করা যাইবে। (৬) সহায়তার অনুরোধ কার্যকরকরণের বিষয়বস্তু বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের পরিপন্থী হইলে উহা প্রত্যাখান করা যাইবে। (৭) জব্দ, ফ্রিজিং বা আটক, বাজেয়াপ্ত ইত্যাদি কার্যকরকরণের ক্ষেত্রে উহা বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে জব্দ, ফ্রিজিং বা আটক বা বাজেয়াপ্তযোগ্য না হইলে অনুরোধটি প্রত্যাখান করা যাইবে। (৮) সহায়তার অনুরোধ প্রত্যাখান করা যাইবে, যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, সহায়তার অনুরোধটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, জাতীয়তা বা রাজনৈতিক বিবেচনায় করা হইয়াছে অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন করিবার অভিপ্রায় করা হইয়াছে। (৯) কোন সামরিক অপরাধের ক্ষেত্রে সহায়তার অনুরোধ প্রত্যাখান করা যাইবে।
অনুরোধ কার্যকরকরণ	১১। (১) এই অধ্যাদেশের অধীন সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা ক্ষেত্রমত, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং অনুরূপ কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ সহায়তার অনুরোধ কার্যকরকরণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করিতে পারিবে। (২) কোন ব্যক্তির বিবৃতি লিপিবদ্ধকরণ, দলিলাদি, বস্তু ও আদালতের বাহিরে সংগৃহীত সাক্ষ্য, দলিল বা পরওয়ানা জারী, তল্লাশী, দলিলাদি বা বস্তু আটক এবং কোন ব্যক্তিকে সনাক্তকরণের জন্য অনুরোধ মহা-পুলিশ পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করা যাইবে এবং তিনি এই ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিবেচিত হইবেন । (৩) আদালত কর্তৃক কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ এবং বাজেয়াপ্ত বা জব্দ করিবার জন্য প্রাপ্ত অনুরোধ সংশ্লিষ্ট পাবলিক প্রসিকিউটর বরাবর প্রেরণ করিতে হইবে এবং তিনি এইক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিবেচিত হইবেন। (৪) কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সহায়তার অনুরোধ প্রাপ্ত হইলে সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উক্ত অনুরোধ দ্রুততার সহিত কার্যকর করিবে এবং কার্যকরকরণ সংক্রান্ত সকল দলিল ও উপকরণসহ একটি রিপোর্ট কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।

	(৫) কোন সহায়তার অনুরোধ কার্যকরকরণ অসম্ভব প্রকৃতির হইলে, বিলম্ব না করিয়া উহা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে। (৬) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন অনুরোধ কার্যকর করিয়া উহার ফলাফল বিষয়ে রিপোর্ট প্রদান করিলে, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ উহার সংশ্লিষ্ট সকল দলিল ও উপকরণসহ অনুরোধকারী রাষ্ট্রের যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।
অন্য আইনে সহায়তা প্রদান	১২।কোন বিদেশী রাষ্ট্র হইতে এই অধ্যায়ে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু বাংলাদেশে অপরাধ বিষয়ে বিদ্যমান আইনে তৎসংশ্লিষ্ট বিধান রহিয়াছে এইরূপ কোন সহায়তার জন্য অনুরোধ প্রাপ্ত হইলে, অনুরোধকৃত বিষয়ে বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন অনুসারে সহায়তা প্রদান করা যাইবে।
গোপনীয়তা প্রকাশ না করা	১৩। আইন দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইলে, কোন ব্যক্তি তাহার পদাধিকারবলে বা দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের কারণে অনুরোধের বিষয়বস্তু যদি গোপনীয় প্রকৃতির হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ অনুরোধ মঞ্জুর বা প্রত্যাখানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কাহারো নিকট উহা প্রকাশ করিতে পারিবেন না।
	অংশ-২ **সহায়তার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি সংক্রান্ত**
অনুসন্ধানের জন্য বিবৃতি ও সাক্ষ্য উপস্থাপন	১৪। (১) কোন বিদেশী রাষ্ট্র কর্তৃক অনুসন্ধানের নিমিত্ত বাংলাদেশে কোন ব্যক্তির বিবৃতি লিপিবদ্ধ বা সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া উহা কার্যকরকরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিবে। (২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী নির্দেশিত তদন্তকারী কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির বিধান অনুসরণে উক্ত ব্যক্তির বিবৃতি লিপিবদ্ধ বা সাক্ষ্য গ্রহণে ক্ষমতাবান হইবেন এবং প্রয়োজনে এতদুদ্দেশ্যে দলিল বা বস্তু তল্লাশী ও জব্দ করিতে পারিবেন। (৩) তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহার কার্য সমাপ্ত করিয়া একটি রিপোর্টসহ উহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন। (৪) যদি অনুরোধকারী রাষ্ট্রের সহিত বাংলাদেশের কোন এগ্রিমেন্ট না থাকিয়া থাকে বা উহাতে দলিলপত্র প্রত্যয়নের বিধান না থাকিয়া থাকে, এবং কোন দলিলাদি প্রত্যয়ন করিবার প্রয়োজন হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিধি-বিধান অনুযায়ী প্রত্যয়ন করিবার জন্য দলিলের হেফাজতকারীকে নির্দেশ দিতে পারিবে অথবা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি বা বিধান অনুযায়ী কার্য করিবে।
বাংলাদেশের আদালত কর্তৃক সাক্ষ্য (testimony) গ্রহণ	১৫। (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেই ক্ষেত্রে ধারা ১৪ এর অধীন একজন সাক্ষী বা ক্ষেত্রমত, বিশেষজ্ঞ বা বিবাদীর নিকট হইতে সাক্ষ্য বা বিবৃতি চাওয়া হয়, সেই ক্ষেত্রে আদালত বা বাংলাদেশের কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (ক) তদন্ত, অভিযোগ গঠন বা বিচার কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা উহার বৈধ প্রতিনিধিকে; বা (খ) বিদেশী রাষ্ট্রের বৈধ প্রতিনিধিকে; বিচারিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং সাক্ষীকে প্রশ্ন করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে। (২) কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সহায়তার অনুরোধ কার্যকরকরণের জন্য বাংলাদেশের আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ উহা কার্যকরকরণের ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট পাবলিক প্রসিকিউটরকে নির্দেশনা প্রদান করিবে। (৩) উপ-ধারা (২) অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত পাবলিক প্রসিকিউটর সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করিলে আদালত উহা ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যবস্থা করিবে।

Dhaka University Institutional Repository

	(৪) উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী গৃহীত সাক্ষ্য কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট সরাসরি প্রেরণের লক্ষ্যে উহার কপি পাবলিক প্রসিকিউটরকে প্রদান করিতে হইবে। (৫) পাবলিক প্রসিকিউটর তৎকর্তৃক প্রাপ্ত কপি বিলম্ব না করিয়া কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।
সাক্ষ্য বা বিবৃতি গ্রহণ সম্পর্কিত বিশেষ বিধানাবলী	১৬। (১) যেইক্ষেত্রে ধারা ১৫ এর অধীন কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য বা বিবৃতি চাওয়া হয়, সেইক্ষেত্রে আদালত যে ব্যক্তির কারণে তদন্ত বা বিচার কার্যক্রম গৃহীত হইয়াছে উক্ত ব্যক্তি অথবা তাহার আইনানুগ প্রতিনিধিকে বা বিদেশী রাষ্ট্রের আইনানুগ প্রতিনিধিকে উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ বা বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিবার সময় প্রশ্ন করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে। (২) বাংলাদেশের কোন বিচারিক কার্যক্রমে কোন সাক্ষীকে যেই পরিমাণ ব্যয় নির্বাহ করিতে হইত, ধারা ১৫ এর অধীন জারিকৃত আদেশে উল্লিখিত ব্যক্তি সেই একই পরিমাণ ব্যয়িত অর্থ পাইবার অধিকারী হইবেন। (৩) সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আদিষ্ট ব্যক্তি কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে নিম্নবর্ণিত কারণে অস্বীকার করিতে পারিবে, বা অন্য কোন সাক্ষ্য-উপকরণ উপস্থাপন করিতে পারিবে, যথা: (ক) বর্তমানে বাংলাদেশে বলবৎ রহিয়াছে এইরূপ কোন আইনের ভিত্তিতে, যদি না এই অধ্যাদেশে ভিন্নরূপ কোন বিধান থাকে; (খ) অনুরোধকারী রাষ্ট্রে বলবৎ রহিয়াছে এইরূপ কোন আইন দ্বারা স্বীকৃত কোন প্রাধিকার; এবং (গ) নির্দিষ্ট কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদান অথবা কোন সাক্ষ্য বা দলিলাদি উপস্থাপন করা হইলে, উহা একটি অপরাধ হইবে এমন বিধান অনুরোধকারী রাষ্ট্রে বিদ্যমান কোন আইনে থাকিলে। (৪) যদি উপ-ধারা (৩) (গ) অনুসারে কোন ব্যক্তির উত্তর-প্রদান অনুরোধকারী রাষ্ট্রে আইনের লংঘন হয় অথবা উপ-ধারা (৩) (খ) অনুসারে অনুরোধকারী রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত প্রাধিকার ক্ষুণ্ন করে, তাহা হইলে আদালত বা অন্য কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা তদন্তকারী কর্মকর্তা সাময়িকভাবে উত্তর-প্রদান অস্বীকারের বিষয়টি গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এতদ্‌সম্পর্কিত একটি নোট রাখিয়া পরীক্ষাকার্য অব্যাহত রাখিতে পারিবে। (৫) উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে কাহারও আপত্তি অনুরোধকারী রাষ্ট্রের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ভিত্তিহীন বিবেচনা করিয়া বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে কার্যক্রম পুনরায় শুরু করিবার জন্য অনুরোধ করিলে, সংশ্লিষ্ট সাক্ষীকে উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদানে বাধ্য করা
কোন ব্যক্তি, সত্তা (entity) বা বস্তু সনাক্তকরণ	১৭। কোন বিদেশী রাষ্ট্র যদি এই মর্মে বিশ্বাস করে যে, কোন ব্যক্তি, সত্তা বা বস্তু বাংলাদেশে রহিয়াছে এবং অনুরোধকারী রাষ্ট্রে অনুসন্ধান, প্রসিকিউশন বা অন্য কোন ফৌজদারী কার্য ধারার জন্য উহা নির্ধারণ করা প্রয়োজন, সেইক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তি, সত্তা বা বস্তু সনাক্তকরণে অগ্রসর হইবে এবং ফলাফল কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে।
	অংশ-১ **সাধারণ বিধানাবলী**
ভিডিও কনফারেন্সিং প্রযুক্তির ব্যবহার	১৮।(১) আদালত বা কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এই মর্মে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, সাক্ষ্য বা বিবৃতি, কোন ব্যক্তি বা বস্তু সনাক্তকরণ বা অন্য যে কোন সহায়তা ভিডিও বা অডিও ট্রান্সমিশন প্রযুক্তির মাধ্যমে সরবরাহ করা যাইবে। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারিকৃত আদেশ দ্বারা উক্ত ব্যক্তি বা সত্তার প্রধানকে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করা যাইবে, যথা:– (ক) আদালত বা কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময় এবং স্থানে বিবৃতি, সাক্ষ্য বা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বা অন্য কোনভাবে সহায়তা প্রদানের জন্য হাজির হওয়া এবং অব্যাহতি প্রদান না করা পর্যন্ত উপস্থিত থাকা;

	(খ) সংশ্লিষ্ট বিদেশী রাষ্ট্রের বিদ্যমান আইন অনুসারে উক্ত রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ বা উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির যে-কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদান। (৩) এই ধারার অধীন ভিডিও কনফারেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সাক্ষ্য প্রদানের পদ্ধতি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করিতে পারিবে। (৪) ধারা ৩৫ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশে ভিডিও বা টেলিফোন সংযোগ স্থাপনের ব্যয় অনুরোধকারী রাষ্ট্র বহন করিবে, যদি না এগ্রিমেন্টে ভিন্নরূপ বিধান থাকে।
	অংশ-২ **সহায়তার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি সংক্রান্ত**
তল্লাশি এবং আটক	১৯।(১) যেইক্ষেত্রে বাংলাদেশে কোন তল্লাশি এবং আটক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন বিদেশী রাষ্ট্র অনুরোধ করে, সেইক্ষেত্রে আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, তদন্ত, অভিযোগ বা বিচারিক কার্যক্রমের প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য পাইবার যুক্তিসঙ্গত কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা হইলে উক্ত আদালত ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসরণে তল্লাশি পরোয়ানা জারি করিতে পারিবে। (২) উপ-ধারা (১) অনুসারে তল্লাশি পরোয়ানা জারি করিবার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আদালত উহা কার্যকরকরণের শর্তাবলী আরোপ করিতে পারিবে এবং তল্লাশিতে বিদেশী রাষ্ট্রের কর্মকর্তাগণের উপস্থিতি এবং অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে। (৩) তল্লাশি এবং আটককারী তৎকর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম বিষয়ে একটি প্রত্যয়নপত্র জারী প্রতিবেদনের সহিত সংযুক্ত করিবেন।
বাংলাদেশে আটক রহিয়াছে এমন ব্যক্তিকে হস্তান্তর	২০। (১) বাংলাদেশে আটকাবস্থায় রহিয়াছে এমন ব্যক্তিকে, কোন বিদেশী রাষ্ট্র কর্তৃক সেই দেশে সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষার নিমিত্ত হস্তান্তরের জন্য অনুরোধ করা হইলে, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট উক্তরূপ হস্তান্তর প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইলে এবং উক্ত ব্যক্তি উহাতে সম্মত থাকিলে, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে এই মর্মে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে। (২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী হস্তান্তরকৃত ব্যক্তি বিদেশী রাষ্ট্রের হেফাজতে থাকার মেয়াদকাল বাংলাদেশে আটকাবস্থায় থাকেন বলিয়া গণ্য হইবে। (৩) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ শর্ত প্রযোজ্য হইবে, যথাঃ– (ক) উক্ত ব্যক্তিকে আটক, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন বা শাস্তি প্রদান, অথবা তাহার ব্যক্তি স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করা যাইবে না অথবা উক্ত ব্যক্তির বাংলাদেশ ত্যাগের পূর্বে সংঘটিত কোন কার্য বা ত্রুটির জন্য তাহার বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না; (খ) উক্ত ব্যক্তিকে তাহার এবং বাংলাদেশের সম্মতি ব্যতীত, অনুরোধের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন তদন্ত বা বিচারিক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান ব্যতীত অন্য কোন সহায়তার জন্য বাধ্য করা যাইবে না; (গ) বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত বা প্রবর্তিত ব্যবস্থা অনুসারে উক্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।
ট্রানজিটকালীন কোন ব্যক্তির হেফাজত	২১। (১) যেইক্ষেত্রে সনাক্তকরণ, সাক্ষ্য প্রদান বা অন্য কোনভাবে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে হেফাজতে থাকা কোন ব্যক্তিকে বাংলাদেশের মাধ্যমে কোন বিদেশী রাষ্ট্র (হস্তান্তরকারী রাষ্ট্র) হইতে অন্য কোন বিদেশী রাষ্ট্রে (গ্রহণকারী রাষ্ট্র) স্থানান্তর করা হয়, সেইক্ষেত্রে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশের মাধ্যমে স্থানান্তরের জন্য হস্তান্তরকারী রাষ্ট্রের যথাযথ কর্তৃপক্ষকে তাহার ট্রানজিটকালীন হেফাজতের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে। (২) যেইক্ষেত্রে বাংলাদেশে, সিডিউল ব্যতীত, কোন অনির্ধারিত (unscheduled) ট্রানজিট সংঘটিত হয়, সেইক্ষেত্রে এসকর্টিং অফিসারের অনুরোধে বাংলাদেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় সময়কাল হেফাজতে রাখিতে পারিবে।

Dhaka University Institutional Repository

	অংশ-৩ **ফ্রিজিং ও আটক** **এবং বাজেয়াপ্তকরণের অনুরোধ**
ফ্রিজিং বা আটকের আদেশ	২২। যেইক্ষেত্রে অপরাধমূলক কার্যের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ বা অপরাধ কার্যে ব্যবহৃত উপকরণ বা সন্ত্রাসী কার্যের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ ফ্রিজ বা আটক করিবার জন্য বিদেশী রাষ্ট্র কর্তৃক অনুরোধ করা হয়, সেইক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ, যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, বাংলাদেশের আইনের অধীন এইরূপ আদেশ প্রদানের পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে ফ্রিজ বা আটক আদেশ প্রদানের জন্য আদালতে আবেদন করিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারিবে।
বিদেশী আদালতের রায় বলবৎকরণ	২৩। (১) কোন বিদেশী আদালত কর্তৃক বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রদান করা হইলে এবং উহা চূড়ান্ত প্রকৃতির হইলে এবং বাংলাদেশের আইনেও উহা বাজেয়াপ্তযোগ্য হইলে, বিদেশী আদালতের রায় বলবৎকরণের জন্য কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ উপদেষ্টা বোর্ডের সহিত আলোচনাক্রমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সেই মর্মে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে। (২) যদি বিদেশী আদালত বিচারপূর্ব জব্দের (Attachment before judgment) আদেশ প্রদান করিয়া থাকে বা বাজেয়াপ্তির আদেশটি চূড়ান্তকরণের পর্যায়ে বা আপীল নিস্পত্তির পর্যায়ে থাকে, সেইক্ষেত্রে বাংলাদেশের আইনে উহা জব্দযোগ্য বা বাজেয়াপ্তযোগ্য হইলে, আদালতে বিচারপূর্ব জব্দের জন্য আবেদন করা যাইবে। (৩) তবে আদালত বা কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে ফ্রিজিং বা আটক বা বাজেয়াপ্তির আদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিবে, যথাঃ– (ক) যদি আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, বিদেশী ফ্রিজিং বা আটক আদেশ উহার কার্যকরতা হারাইয়াছে; অথবা (খ) যদি আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, বিদেশী বাজেয়াপ্তি আদেশ পালিত হইয়াছে বা উহার কার্যকরতা হারাইয়াছে।
তৃতীয় পক্ষের অধিকার	২৪। (১) ফ্রিজিং বা আটক বা বাজেয়াপ্তির আদেশ কার্যকরকরণের পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল তৃতীয় ব্যক্তির বা সত্তার প্রধানের নিকট উহার কপিসহ নোটিশ প্রেরণ করিতে হইবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে এই বিষয়ে পত্রিকা বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে প্রচার করা যাইবে। (২) যে সম্পত্তি সম্পর্কে আদেশ কার্যকর করা হইবে উক্ত সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা সত্তার প্রধান নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত সম্পত্তিতে তাহার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অংশটুকু বাদ রাখিবার জন্য আবেদন করিতে পারিবে। (৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত বা অন্য কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আদেশের দ্বারা উক্ত সময়সীমা বর্ধিত করিতে পারিবে। (৪) অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ, সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অর্থায়ন, ইত্যাদি সংক্রান্ত বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট তৃতীয় পক্ষের অধিকার সম্পর্কিত বিধানাবলী প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে (mutatis mutandis) উপ-ধারা (২) এর অধীন নিস্পত্তিকৃত আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। (৫) কোন ব্যক্তি বা সত্তার প্রধান অনুরোধকারী রাষ্ট্রে বাজেয়াপ্তি কার্যক্রমের নোটিশপ্রাপ্ত হইয়া থাকিলে তিনি উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন আবেদন করিতে পারিবেন না। (৬) এই ধারার কোন কিছু ন্যায় বিচারের স্বার্থে আদালত বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদানের ক্ষমতাকে ক্ষুন্ন করিবে না।

অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তির বিলি-বন্দেজ	২৫। কোন বিদেশী রাষ্ট্রের অনুরোধের প্রেক্ষিতে অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ বা অপরাধ কার্যে ব্যবহৃত উপকরণের সমগ্র বা অংশবিশেষ বাংলাদেশে বাজেয়াপ্তকৃত হইলে, উহা অনুরোধকারী রাষ্ট্রের আদালতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে বাংলাদেশের এখতিয়ারবান আদালতের আদেশবলে বিলি-বন্দেজ নির্ধারিত হইবে।
	অংশ-৪ **সরকারি দপ্তরের দলিল বা তথ্যাদি সরবরাহ**
সরকারি দপ্তরের দলিল বা তথ্যাদি সরবরাহ	২৬।(১) কোন বিদেশী রাষ্ট্র কর্তৃক বাংলাদেশের কোন সরকারি দপ্তরে রক্ষিত দলিল বা তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হইলে, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে উহা প্রেরণ করিবে। (২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী প্রাপ্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর দলিলপত্র বা তথ্যাদি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করিবে। (৩) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী চাহিত দলিল বা তথ্য যদি অপ্রকাশিত প্রকৃতির হয় এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা যদি মনে করে যে, প্রচলিত আইন অনুসারে উক্ত দলিল বা তথ্য প্রকাশ করা অসম্ভব বা সমীচীন নয় অথবা উহা নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত, সেইক্ষেত্রে বিলম্ব না করিয়া সরবরাহ না করিবার কারণ অথবা শর্তসমূহ কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে। (৪) সহায়তার জন্য অনুরোধকারী রাষ্ট্রের সহিত বাংলাদেশের এগ্রিমেন্ট থাকিলে এবং উহাতে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, সংশ্লিষ্ট দলিলের হেফাজতকারী উক্ত দলিল কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি বা বিধান অনুযায়ী সত্যায়ন করিবেন।
ফৌজদারী কার্যধারার সূচনা	২৭। কোন বিদেশী রাষ্ট্র ফৌজদারী কার্যধারা সূচনা করিতে সক্ষম হইলেও অনুরূপ কার্যব্যবস্থা বাংলাদেশে সূচনা করিবার জন্য অনুরোধ করিলে, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে যে, উহা বাংলাদেশের আদালতের এখতিয়ারাধীন এবং অনুরোধ অনুযায়ী ফৌজদারী কার্যধারার সূচনা করা যথোপযুক্ত, সেইক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এবং গৃহীত ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারিবে।
	অংশ-৫ **কম্পিউটার সিস্টেম এবং কম্পিউটার ড্যাটা সংক্রান্ত সহযোগিতা**
কম্পিউটার ড্যাটা সংরক্ষণ	২৮। কোন বিদেশী রাষ্ট্র কম্পিউটার ড্যাটা ও ট্রাফিক ড্যাটার বিষয়ে তথ্য সরবরাহের জন্য অনুরোধ করিলে এবং এতদ্‌সম্পর্কিত বিষয়াদি বাংলাদেশে বিদ্যমান থাকিলে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উক্তরূপ ড্যাটা সংরক্ষণ এবং উহার নিরাপত্তা বিধানের জন্য আদেশ জারী করিতে পারিবে।
সংরক্ষিত কম্পিউটার ড্যাটা উপস্থাপন	২৯। কোন বিদেশী রাষ্ট্রের অনুরোধের প্রেক্ষিতে, আদালত বা কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উপস্থাপনের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা:– (ক) কোন ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের অধিকারে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা সুনির্দিষ্ট কম্পিউটার ড্যাটা যাহা কোন কম্পিউটার সিস্টেম এবং কম্পিউটার ড্যাটা স্টোরেজ মিডিয়ামে সংরক্ষিত ছিল; এবং (খ) কোন সার্ভিস প্রোভাইডারের অধিকার বা নিয়ন্ত্রণে থাকা গ্রাহক তথ্য যেই ক্ষেত্রে উক্ত ড্যাটা বা তথ্য অনুরোধকারী রাষ্ট্রের ফৌজদারী কার্যক্রমের সহিত সম্পৃক্ত।
কম্পিউটার ড্যাটা তল্লাশি এবং আটক	৩০। (১) কোন বিদেশী রাষ্ট্রের অনুরোধের প্রেক্ষিতে, আদালত বা কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে কোন কম্পিউটার সিস্টেম বা উহার কোন অংশসহ কম্পিউটার ড্যাটা সংরক্ষণ করিতে পারে এইরূপ কোন কম্পিউটার স্টোরেজ মিডিয়াম তল্লাশি বা উহাতে প্রবেশ করিবার জন্য তল্লাশি পরোয়ানা বা অন্য কোন আদেশ জারি করিতে পারিবে। (২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জারিকৃত তল্লাশি পরোয়ানা বা অন্য কোন আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে ক্ষমতা থাকিবে, যথা:–

Dhaka University Institutional Repository

	(ক) কোন কম্পিউটার সিস্টেম বা উহার কোন অংশ বা কম্পিউটার ড্যাটা স্টোরেজ মিডিয়াম আটক করিতে বা অন্যভাবে হেফাজতে গ্রহণ; (খ) উক্ত কম্পিউটার ড্যাটার অনুলিপি প্রস্তুত করা; (গ) সংরক্ষিত কম্পিউটার ড্যাটাকে অবিকৃত অবস্থায় রাখা; এবং (ঘ) কম্পিউটার ড্যাটাকে অগম্য (ইনএক্সেসিবল) করা বা কোন এ্যাক্সেস কম্পিউটার সিস্টেমে উক্ত কম্পিউটার ড্যাটা প্রেরণ
	অধ্যায়-৪ **বাংলাদেশ কর্তৃক সহায়তার অনুরোধ**
বাংলাদেশ কর্তৃক সহায়তার অনুরোধ	৩১। (১) বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক কোন বিদেশী রাষ্ট্র হইতে সহায়তা প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট করিতে হইবে। (২) কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি বা বিধান এবং শর্তাদি যথাযথভাবে অনুসরণ করিয়া এবং প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্রসহ উক্ত অনুরোধ যাচনা করিতে হইবে। (৩) কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ সহায়তার অনুরোধটি বিচার বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত বিবেচনা করিলে সংশ্লিষ্ট বিদেশী রাষ্ট্রের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট সহায়তার জন্য অনুরোধটি প্রেরণ করিবে।
নিরাপত্তা হেফাজতে স্থানান্তরিত ব্যক্তি সম্পর্কিত বিশেষ বিধান	৩২। (১) যেইক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের অধীন সহায়তার উদ্দেশ্যে, অনুরোধ অনুসারে কোন বিদেশী রাষ্ট্রে নিরাপত্তা হেফাজতে থাকা কোন ব্যক্তিকে বাংলাদেশে আনা হয় সেইক্ষেত্রে– (ক) উক্ত ব্যক্তিকে অনুরোধের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, বাংলাদেশে প্রবেশ করিবার ও অবস্থান করিবার অনুমতি প্রদান করিতে হইবে; (খ) উক্ত ব্যক্তিকে যেই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ আনা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে আর প্রয়োজন না হইলে, বাংলাদেশ ত্যাগের নির্দেশ প্রদান করা হইবে; (গ) উক্ত ব্যক্তিকে অনুরোধের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় বাংলাদেশে নিরাপত্তা হেফাজতে রাখা হইলে উহা বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে। (২) বিদেশী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা হেফাজতে থাকা ব্যক্তিকে বাংলাদেশে আনয়নের ক্ষেত্রে, যদি উক্ত ব্যক্তির বাংলাদেশে অবস্থানের প্রয়োজন না হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে নিরাপত্তা হেফাজতে রাখা ও উক্ত রাষ্ট্রে ফেরত পাঠাইবার ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিবেন। (৩) যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার অধীন অনুরোধ অনুসারে বাংলাদেশের নিরাপত্তা হেফাজত হইতে পলায়ন করে, তাহা হইলে তাহাকে এই ধারা অনুসারে নিরাপত্তা হেফাজতে আনিবার উদ্দেশ্যে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করা যাইবে।
সহায়তার অনুরোধ অনুসারে বাংলাদেশে অবস্থানকারী ব্যক্তির প্রতি নিরাপদ আচরণ	৩৩। (১) এই অধ্যাদেশের অধীন সহায়তা লাভের অনুরোধ অনুসারে কোন ব্যক্তির উপস্থিতি যাচনা করা হইলে, (ক) আটক, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন বা শাস্তি প্রদান করা হইবে না, অথবা তাহার ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করা হইবে না, অথবা উক্ত ব্যক্তির বিদেশী রাষ্ট্র ত্যাগের পূর্বে সংঘটিত কোন কার্য বা বিচ্যুতির জন্য তাহার বিরুদ্ধে অনুরোধের প্রেক্ষিতে কোন দেওয়ানী কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে না; (খ) তাহার বা বিদেশী রাষ্ট্রের সম্মতি গ্রহণ না করিয়া, সংশ্লিষ্ট তদন্ত বা কার্যক্রম ব্যতিরেকে অন্য কোন তদন্ত বা কার্যক্রমে সহায়তার জন্য বাধ্য করা যাইবে না। (২) উপ-ধারা (১) অনুসারে নিরাপদ আচরণের বিধান প্রযোজ্য হইবে না, যখন উক্ত ব্যক্তির বাংলাদেশ ত্যাগের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে-তারিখে তাহাকে অনুরোধের প্রেক্ষিতে দেশ ত্যাগ করিবার বিষয়টি অবহিত করিবার তারিখ হইতে ১৫ (পনের) দিবসের মধ্যে দেশ ত্যাগ না করেন অথবা যখন উক্ত ব্যক্তি দেশ ত্যাগের পর বাংলাদেশে ফেরত আসেন।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়তার অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত সাক্ষ্য ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা	৩৪। এই অধ্যাদেশের অধীন কোন সহায়তার জন্য বাংলাদেশে কোন সাক্ষ্য-উপকরণ সরবরাহ করা হইলে, উহা নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে না, যথাঃ– (ক) ফৌজদারী তদন্ত এবং কার্যক্রম (খ) জন-নিরাপত্তার জন্য আসন্ন গুরুতর হুমকি প্রতিরোধ; (গ) উপ-অনুচ্ছেদ (ক) এ উল্লিখিত তদন্ত বা কার্যক্রমের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত কোন দেওয়ানী বিচারিক বা প্রশাসনিক কার্যক্রম; (ঘ) অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে, যদি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের কাঠামোর আওতায় অথবা উপ-দফা (ক), (খ) এবং (গ) এ উল্লিখিত অবস্থায় কোন তথ্য বা সাক্ষ্য জনসম্মুখে প্রকাশ করা; এবং (ঙ) তথ্য প্রদানকারী বিদেশী রাষ্ট্রের পূর্ব অনুমতিসহ অন্য কোন উদ্দেশ্যে।
	অধ্যায়-৫; বিবিধ
ব্যয়	৩৫।অনুরোধকারী রাষ্ট্রের সহিত বাংলাদেশের এগ্রিমেন্ট থাকিলে এবং উহাতে ভিন্নরূপ ব্যবস্থার উল্লেখ না থাকিলে অথবা অন্য কোনভাবে সম্মত না হইলে, নিম্নরূপ ক্ষেত্র ব্যতিত বাংলাদেশে কোন সহায়তার অনুরোধ কার্যকর করিতে বিদেশী রাষ্ট্রের উপর কোন চার্জ ধার্য না করিয়া পরিচালিত হইবে, যথা:– (ক) বাংলাদেশের স্থানীয় সীমানার মধ্যে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির উপস্থিতি সম্পর্কিত ব্যয়; অথবা (খ) বাংলাদেশ হইতে কোন ব্যক্তিকে কোন অনুরোধকারী রাষ্ট্রের হেফাজতে হস্তান্তর এবং অনুরোধকারী রাষ্ট্র হইতে উক্ত ব্যক্তিকে ফেরত আনয়ন সংক্রান্তে ব্যয়িত অর্থ; অথবা (গ) বাংলাদেশে ভিডিও বা টেলিফোন সংযোগ স্থাপন সংক্রান্ত ব্যয়, অনুবাদককে প্রদত্ত পারিশ্রমিক এবং সাক্ষীকে প্রদত্ত ভাতা; অথবা (ঘ) প্রকৃত বা অবশ্যম্ভাবী কোন ব্যয়।
সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা	৩৬। এই অধ্যাদেশের অধীন গৃহীত সকল সাক্ষ্য, দলিলাদি ও তথ্য আইনানুযায়ী আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।
অনুরোধের ভাষা	৩৭। (১) বিদেশী রাষ্ট্র হইতে সহায়তা গ্রহণের ক্ষেত্রে সকল সহায়তার অনুরোধ ইংরেজীতে করিতে হইবে এবং সংযুক্ত দলিলাদি এবং অন্য কাগজপত্র যদি ইংরেজীতে না হইয়া থাকে, তবে উহার ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কপি প্রদান করিতে হইবে। (২) বিদেশী রাষ্ট্র কর্তৃক প্রেরিত অনুরোধ ইংরেজী অথবা বাংলায় করা যাইবে এবং সংযুক্ত দলিলাদি ও অন্যান্য কাগজপত্র প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাংলায় অনুবাদ করিয়া দিতে হইবে। (৩) বাংলাদেশে সংগৃহীত কোন সাক্ষ্য বাংলায় গৃহীত হইলে এবং দলিলাদি বা অন্য কোন কাগজপত্র বাংলায় সংগৃহীত হইলে, অনুরোধকারী রাষ্ট্রের অনুরোধের প্রেক্ষিতে উহার ইংরেজী অনুবাদ প্রত্যয়ন করিয়া প্রদান করা যাইতে পারে।
বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	৩৮। সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।
জটিলতা নিরসনে সরকারের ক্ষমতা	৩৯। এই অধ্যাদেশের কোন বিধানের অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর কবিরার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে, সরকার এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধানের সহি সামঞ্জস্য রাখিয়া, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।
ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ	৪০। এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

(আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়)

Dhaka University Institutional Repository

আইনের পর্যালোচনা:

রাষ্ট্রের হাতে সন্ত্রাস দমনের জন্য উপযুক্ত ও কার্যকর আইন থাকুক সে প্রশ্নে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না, থাকা উচিতও নয়। কিন্তু আইনটি যদি রাষ্ট্রের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হরণ করে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের হাতিয়ার হয় তবে সেটা সমর্থনযোগ্য নয়। সন্ত্রাসবিরোধী আইন মানবাধিকার পরিপন্থী হতে পারবে না। ২০০৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি 'সন্ত্রাস দমন আইন ২০০৯' পাস হয়। আইনটি পাসের পর তখনই বলা হয়, আইনটি যুগোপযোগী হয়নি। বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের ধরনও দ্রুত বদলে যেতে থাকে যুক্তি দেখিয়ে এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থা এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ (এপিজি) ও ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্সের (এফটিএফ) মানদন্ড অনুসরণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাসবিরোধী আইন সংশোধনের কথা বলা হয়। ২০১২ সালে আইনটির একদফা সংশোধন করে এতে মৃত্যুদন্ডের বিধান যোগ করা হয়। আন্তর্জাতিক মহলের পক্ষ থেকে আইনে আরও সংশোধনী আনার অনুরোধ করা হলে সরকার সংসদে আইনটির সর্বশেষ সংশোধনী পাস করিয়ে নেয়। সংশোধিত সন্ত্রাস বিরোধী আইনের কঠোর সমালোচনা করেছেন দেশের শীর্ষ আইনজীবী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞরা। তারা বলেছেন, এই আইন সংবিধান ও মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। যেসব অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য এ সংশোধনী আনা হয়েছে এসব অপরাধ দমনের জন্য যথেষ্ট আইন দেশে বিদ্যমান আছে। তারা বলেন, জনগণের নিরাপত্তার জন্য অতীতে জননিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করা হয়েছিলো; কিন্তু তখন সেই আইনের মাধ্যমে ঢালাওভাবে বিরোধী দলের নেতাদের গ্রেফতার করেছিলো সরকার। এই সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অপব্যবহারের ফলে অতীতের মতো ব্যক্তির নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা লংঘনের যথেষ্ট আশংকা রয়েছে। এছাড়া আইনটিতে পুলিশকে দেয়া হয়েছে অবাধ ক্ষমতা।

সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা ও সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ব্যারিস্টার এম আমীর-উল ইসলাম বলেন, ২০০৯ সালে এ আইনটি প্রথম প্রণয়ন করা হয়। এটা ছিলো অত্যন্ত আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এ আইনটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়নি। তিনি বলেন, রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলা শহরে সাম্প্রতিক সময়ে সন্ত্রাস সংঘটিত হয়েছে। তখন সেখানে এ আইন প্রয়োগ করা হয়নি। অথচ তড়িঘড়ি করে এই আইনের সংশোধনী আনা হয়েছে যাতে ফেসবুক-টুইটারে আলাপ-আলোচনার বিষয় সাক্ষ্য হিসেবে আদালতে উপস্থাপন করা যাবে। সংশোধিত আইনে এটার কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল না। তিনি বলেন, আইনমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যরাই জানেন, কেন তারা এই আইনে সংশোধনী আনলেন?

সিনিয়র আইনজীবী ড. এম জহীর বলেন, যে কোনো জিনিসের (শাঁখের করাত) দুইটি ধার আছে। যেতেও কাটে, আসতেও কাটে। যে আইনটা প্রণয়ন করা হয়েছে সেটা পুলিশের সুবিধার জন্য। এখন এটার অপব্যবহারও হতে পারে। তিনি বলেন, আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, পুলিশ ধরে নিয়ে গেলো। তারপর চালান করে দিলো। এরপর ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিত করবে। তার মানে পুলিশের ওপর ক্ষমতা ছেড়ে দিলো। 'ইট মে বি ইউজড আরবিট্রারি'। ফেসবুক-টুইটারের আলাপ-আলোচনা সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে আদালতে উপস্থাপন প্রসঙ্গে ড. জহীর বলেন, ইন্টারনেটে আপনি তো কোন প্রেসিডেন্টকে গালি দিতে পারেন না। আমেরিকা-ইউরোপের বিরুদ্ধে কিছু লিখে ভিসা নিতে যান তখন দেখুন আপনি ভিসা পাবেন কি না? ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ল'র পরিচালক ড. শাহদীন মালিক বলেন, কেউ যদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকে, ইন্টারনেট মাধ্যমের এ সংক্রান্ত কথাবার্তা, ছবি ও ভিডিও আদালতের জন্য আমলযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ হওয়াটা দোষের নয়; কিন্তু তার আগেই অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সেই সব কথাবার্তা, ছবি ও ভিডিও সংগ্রহ করতে হবে এবং সেটা তিনি সংগ্রহ করবেন অন্যায়ভাবে। কারণ, সংবিধানের মৌলিক অধ্যায়ের মাধ্যমে ব্যক্তির গোপনীয়তাকে সুরক্ষা দেয়া আছে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এ

আইনের ২১ ধারা নাগরিকের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। এতে সংবিধানের ৪৩ অনুচ্ছেদের লংঘন হবে। মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার ক্ষুন্ন হবে। ঢালাওভাবে এ অধিকারকে ক্ষুন্ন করা ঠিক হবে না।

তিনি বলেন, এ আইন ২০০০ সালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক করা কুখ্যাত জননিরাপত্তা আইনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ওই সময় ঢালাওভাবে বিরোধী দলের নেতাদের গ্রেফতার ও হয়রানি করা হয়েছিলো। ড. শাহদীন মালিক বলেন, এই সরকার অতীতের ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয়নি। ওই জননিরাপত্তা আইনের অপব্যবহারের ফলে পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তারা মাত্র ৬২টি আসন পেয়েছিলো। এখনো সেই পথে যাচ্ছে সরকার। এবারও ফেসবুক-টুইটারসহ সব যোগাযোগ মাধ্যমের কথা বলার কারণে ঢালাওভাবে এই আইনের অপব্যবহার হবে। এখানে কোনো সেফগার্ড নেই।

পুলিশ মামলা করার বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিতকরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এর মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেট পোস্ট বক্স হয়ে যাচ্ছে। সংবিধানে ম্যজিস্ট্রেটের ক্ষমতার কথা রয়েছে। সেখানে বলা আছে, ম্যাজিস্ট্রেট বিচার বিবেচনা করে আদেশ দিবেন; কিন্তু এখন পুলিশ শুধু একটা চিঠি পাঠিয়ে দিলে হয়ে যাবে। এটাতো আইন সংগত নয়।সংশোধিত সন্ত্রাসবিরোধী আইনের কড়া সমালোচনা করে প্যারিসভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন দ্য ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস (এফআইডিএইচ) এবং বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন অধিকার বলেছে, ভিন্নমত দমনের জন্য আইনটির অপপ্রয়োগ করার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। বিরোধী দলের জোরাল বিরোধিতার মুখেই গত ১১ জুন সংসদে বিতর্কিত আইনটির সংশোধনী পাস হয়। গতকাল এক বিবৃতিতে এফআইডিএইচ এবং অধিকার বলেছে, সংশোধিত সন্ত্রাসবিরোধী আইনে বলা হয়েছে, ফেসবুক, টুইটার, স্কাইপ এবং অন্যান্য সামাজিক গণমাধ্যমে ব্যবহৃত ভিডিও, স্থিরচিত্র এবং অডিও ক্লিপের ভিত্তিতে আদালত বিচার করতে পারবে। এর আগে ২০১২ সালে আরেকটি সংশোধনীর মাধ্যমে সন্ত্রাসী কাজে অর্থায়নের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করা হয়েছে। উক্ত আইনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার করে দেশের অভ্যন্তরে কিংবা অন্য দেশের বিরুদ্ধে কোনো সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালানো যাবে না। এছাড়া সব ধরনের অবৈধ অস্ত্র ও বিস্ফোরক এবং জনগণকে আতঙ্কিত করাকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারও বিরুদ্ধে এসব অপরাধ প্রমাণিত হলে তার মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। বিবৃতিতে বলা হয়, কার্যত নাগরিক সমাজের সঙ্গে কোনো পরামর্শ না করেই এবং সংসদে বিরোধী দলের তীব্র বিরোধিতার মধ্যেই ২০১২ সালেও একবার সংশোধনী পাস হয়।

সেনা সমর্থিত সরকারের সময় ২০০৯ সালে সন্ত্রাসবিরোধী আইনটি পাস হয়। ২০১০ সালে এফআইডিএইচ এবং অধিকার এক রিপোর্টে বলেছিল, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ-এর অস্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে আইনটিকে অপপ্রয়োগের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। ফৌজদারি আইনে যেরকম সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট বিধান দরকার তা এ আইনে নেই। ইন্টারন্যাশনাল কভন্যান্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটসের ১৫ ধারা অনুসারেও এটি করা দরকার। কারণ, বাংলাদেশ এই চুক্তি অনুমোদন করেছে।

এফআইডিএইচ এবং অধিকার বলেছে, সংশোধনীর পরও অস্পষ্ট বিধান বহাল রাখায় এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করায় এ আইনটির সবচেয়ে বেশি অপপ্রয়োগ হতে পারে। বাংলাদেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় আইনের অপপ্রয়োগ এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করার বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরেই দেখে আসছে এফআইডিএইচ ও অধিকার। কিন্তু এক্ষেত্রে অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করার কারণে অবিচারের ভয়াবহ ঝুঁকি রয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, ২০০৯ সালের পর থেকেই সন্ত্রাসবিরোধী আইনটি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, সাংবাদিক এবং অন্যান্য ভিন্নমত দমনে ব্যবহার করছে সরকার। এফআইডিএইচের প্রেসিডেন্ট করিম লাহিদজি বলেন, বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সামাজিক গণমাধ্যম ও ব্লগে মতামত প্রকাশকে অপরাধ সাব্যস্ত করাটা শুধু মত

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশের স্বাধীনতারই লঙ্ঘন নয়, ভিন্নমত এবং মানবাধিকার কর্মীদের নিপীড়নের ক্ষেত্রেও এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। তিনি বলেন,সন্ত্রাসবিরোধী আইনের নতুন সংশোধনীতে সন্ত্রাসের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তাতে আন্তর্জাতিক মান রক্ষা করা হয়নি। এর ফলে এ আইনটির স্বৈরাচারী ব্যবহারের আরও একটি নতুন দরজা উন্মুক্ত হলো।

সংশোধিত সন্ত্রাসবিরোধী আইনের ধারা ২ অনুসারে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অর্থ পাচারের জন্য শুধু নগদ টাকা পাচারই নয়, চেক, মানি অর্ডার, পে-অর্ডার, ডিডি, টিটি, ক্রেডিট কার্ড এবং ই-মেইল বার্তায় প্রমাণ পাওয়া গেলে তা এ আইনের আওতায় অর্থ পাচারের অভিযোগে সাক্ষ্য হিসেবে আমলে নেয়া হবে। ই-মেইল বার্তা এমনকি ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের বিষয়টিও যে কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে এই আইনের 'শিকার' বানাতে পারে। কারণ, ই-মেইল 'হ্যাক' করা কোন কঠিন কাজ নয়। রাষ্ট্রের যে কোন গোয়েন্দা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা সহজেই ই-মেইল হ্যাক করে একজন নাগরিককে আইনের আওতায় ফেলতে পারে এবং সেটা আদালতও আমলে নেবে এই আইনের আওতায়। এই আইনে উচ্চ আদালতে যাওয়ার সুযোগ অভিযুক্তদের অবশ্যই থাকতে হবে। বাংলাদেশের বাস্তবতায় প্রচলিত আইনই নিপীড়ন এবং নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবে ক্ষমতাসীনদের ব্যবহার করতে দেখা যায়। এছাড়াও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর যথাযথ জবাবদিহিতার অভাব, র‍্যাবের মতো এলিট ফোর্সের প্রায় অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা থাকার ফলে নাগরিক-নিরাপত্তা এমনিতেই প্রশ্নের সম্মুখীন। ক্রসফায়ার, এনকাউন্টার, বিচারহীন হত্যা ও গুমের ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত। এ বাস্তবতায় সংশোধিত সন্ত্রাস দমন আইনটি যে নিশ্চিত অপপ্রয়োগের ফলে একটি দানবীয় আইনে পরিণত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর মৌলিক ও মানবাধিকার পরিপন্থী ধারাগুলো বিলুপ্ত করে, অভিযুক্তদের যথাযথ আইনি সুরক্ষার বিধিগুলো অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান সিনিয়র আইনজীবীরা (১৪-১৫-১৬ দৈনিক ইত্তেফাক, যুগান্তর ও আমার দেশ)।

দক্ষিণ এশীয়ায় জঙ্গীবাদ পরিস্থিতিঃ

সাদিয়া নাসিরের লেখা 'Rise of Extremism in South Asia' গ্রন্থে দক্ষিণ এশিয়ার উগ্রবাদ বা জঙ্গী মৌলবাদ বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণালব্ধ তথ্য সন্নিবেশ করেছেন। বিশ্বের এক পঞ্চমাংশ লোক দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশে বাস করে। যেখানকার ৪৩ভাগ মানুষ বর্তমানে দারিদ্রসীমার নীচে বাস করছেন । গড়ে এসব দেশের মানুষ ৪৪০ ডলার করে আয় করছেন, যা বিশ্বআয়ের মাত্র ২ ভাগেরও নীচে। সম্পদে পরিপূর্ণ হলেও মানব উন্নয়ন খাত নিম্নমুখী। এক জরিপে বলা হয়, বিশ্বের অশিক্ষিত জনগণের ৪৬ ভাগের বাস দক্ষিণ এশিয়ায়। মানব উন্নয়ন সুচকে এটি একটি বিস্ফোরনোন্মুখ অবস্থায় রয়েছে ।

বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়া নানা রকমের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। আভ্যন্তরীণ এবং আন্ত:রাষ্ট্রীয় নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে এ দেশগুলোকে। ইন্দো-পাক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক, আঞ্চলিক সংকট, সন্ত্রাসবাদ, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক সংকট এবং নানা খাতওয়ারী বিভেদ তো রয়েছেই। তার উপর দ্বিপক্ষীয় সীমানা বিভেদ, যৌথ নদীর পানি বন্টনে সমস্যা, শরণার্থী সমস্যা, অভিবাসন, গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শক্তিশালী না হওয়া, বেকারত্ব, সামাজিক ন্যায়বিচারের অভাব, দারিদ্রসহ স্বার্থের রাজনীতি এসব দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও উন্নয়নের গতি শ্লথ হওয়ায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রাধান্য পাচ্ছে।

এ অঞ্চলে নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ পারস্পরিক জটিল ক্রিয়া ও আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক ফ্যাক্টর। এসব কারণ সংকটগুলোকে আরো গভীর করেছে। যেখানে গোত্র, ভাষা, আঞ্চলিকতা ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতার অজুহাতে সমাজ খন্ডিত রুপ নিয়েছে। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সংকট, আন্ত:দেশ যাতায়াত ব্যবস্থা নিরাপত্তার হুমকী বহুগণে বাড়িয়ে দিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে এশিয়ার দেশগুলোতে উগ্রবাদ বা চরমপন্থার

Dhaka University Institutional Repository

মতো সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা তৈরি হয়েছে। এ চরমপন্থীরা সন্ত্রাসবাদ ঘটানো, সন্ত্রাসী কার্যক্রম করা অথবা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশের মতো প্রভাব বিস্তার করছে। দক্ষিণ এশিয়ায় চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদ সরকার ও বিদ্রোহীদের নানা অত্যাচার নীপিড়ন ও নির্যাতনের ফলে বিস্তার লাভ করে। সামাজিক অবিচার, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, আদর্শগত বিরোধ, ক্ষুধা, পশ্চাৎমুখিতা ও বেকারত্ব এ পরিস্থিতি তৈরি করছে। রাজনীতির নিপুণ হাতের প্রক্রিয়ার মধ্যে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধির কারণ হয়ে উঠেছে।

১৯৯০ এর দশকের শুরুতে আদর্শের উপর ভিত্তি করে এ অঞ্চলে বেড়ে সন্ত্রাসবাদ উঠে। এস আর এসের হিন্দুত্ব আদর্শ এবং ভারতে সংঘ পরিবার এবং নেপালে মাওবাদী তৎপরতা শুরু হয়। ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদ একে ধর্মীয় মৌলবাদ উল্লেখ করে এর সুবিধা নিতে শুরু করে রাজনৈতিক দলগুলো। ধর্মীয় সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় সমাজসেবক সংঘ ভারতের রাজনীতিতে বিতর্ক তৈরির মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার শুরু করে। ধর্মভিত্তিক সংগঠন ভারতীয় জনতা পার্টি হিন্দুদের একচেটিয়া সমর্থন লাভ করে। বিজেপি এবং এর পিতৃপ্রতীম সংগঠন আরএসএস পরবর্তিতে নিজেদের স্বার্থেই রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার আরো বাড়িয়ে দেয়। হিন্দুত্ব আদর্শ বেড়ে যাওয়ার ফলে ক্ষমতায় এসে তারা শুধু হিন্দুত্ব প্রচার ছাড়াও মুসলমান ও খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের লোকদের হিন্দুধর্মে দীক্ষা দেয়ার একটি এজেন্ডা হাতে নেয়।

পাকিস্তানে, জেনারেল জিয়াউল হকের শাসনামলে ইসলামী মৌলবাদের ভিত্তি তৈরি হয়। যখন যাকাতের অর্থ দিয়ে মাদ্রাসা তৈরির প্রকল্প হাতে নেয়া হয়, এতে দ্রুত ধর্মীয় জঙ্গীবাদ সংগঠন বেড়ে যায়। একই সময়ে মাদ্রাসা শিক্ষা বিস্তারে আমেরিকার সাহায্য এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আফগানিস্তান যুদ্ধে যেতে উৎসাহিত করেন জেনারেল জিয়া। সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাহার করলে আমেরিকা পাকিস্তানে জঙ্গীবাদ বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেয় *(নাসির সাদিয়া, দ্য রাইজ অফ এক্সট্রিমিজম ইন সাউথ এশিয়া)*।

বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ পরিস্থিতিঃ

বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের উত্থান পর্যালোচনা করতে গেলে এর গোড়ার দিকের ঘটনাগুলো উল্লেখ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে জঙ্গীবাদী সংগঠনের গোড়াপত্তন প্রায় দুই যুগের। সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের হয়ে যুদ্ধে অংশ নেয়া কিছু লোক দেশে ফিরে হরকতুল জিহাদ বাংলাদেশ গঠন করে। এরপর বিভিন্ন সময়ে ছোট পরিসর বা এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন সংগঠন পরিচালিত হয়। এগুলোই পরবর্তিতে ব্যাপক আকার নেয় সারাদেশে। বাংলাদেশে ৯৯ সাল থেকে জঙ্গীবাদী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশ সরকার ১২ টি সংগঠনকে কালো তালিকাভূক্ত করেছে ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে। বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার চারটি সংগঠনকে জঙ্গীবাদী কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগে নিষিদ্ধ করে। এরমধ্যে জমিয়াতুল মুজাহিদিনের শায়খ আব্দুর রহমান ও বাংলাভাই সহ অন্তত ১০ জনকে বিভিন্ন অপরাধে আদালত মৃত্যুদন্ড প্রদান করে।

বাংলাদেশের উগ্রবাদী সংগঠনগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলোঃ

হরকত-উল জিহাদ (হুজি):

হরকত-উল জিহাদ বাংলাদেশের পরিচিত একটি পরিচিত সংগঠন। ১৯৯২ সালে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আফগান ফেরত কয়েকজন যোদ্ধার নেতৃত্বে এ সংগঠন গঠিত হয়। ওসামা বিন লাদেনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এটি গঠিত হয়। এর নেতৃত্বে রয়েছেন শওকত ওসমান ওরফে শেখ ফরিদ। জিহাদের মাধ্যমে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠা করাই এর লক্ষ্য। সারাদেশে এ সংগঠনগুলোর পনের হাজার সদস্য রয়েছে। এদের বেশিরভাগ মাদ্রাসা শিক্ষিত। ওসামা বিন লাদেনের ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্ট এদের অর্থ যুগিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এ

সংগঠনের সাথে রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন, উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সন্ত্রাসী সংগঠন, পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এবং আল কায়েদার সাথে যোগাযোগ রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ২০০৮ সালের মার্চে হুজি যুক্তরাষ্ট্রের তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী সংগঠনের স্বীকৃতি পায়। ২০০৫ সালের অক্টোবরে বিএনপি সরকার এ সংগঠনকে নিষিদ্ধ করে। এ সংগঠনের অন্যতম নেতা মুফতি হান্নান ২০০৭ সালে গ্রেফতার হয়ে এখনো বিচারের মুখোমুখি।

জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশঃ (জেএমবি)ঃ

১৯৯৮ সালে প্রথম দৃশ্যপটে আসে জেএমবি। এর প্রতিষ্ঠার দিন তারিখ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এটি প্রথম আলোচনায় আসে এর ৮ জন সদস্য ২০০২ সালের মে মাসে গ্রেফতার হওয়ার পর। ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি আওয়ামীমুজাহিদীনের যুবক শাখা বলেও ধারণা করা হয়ে থাকে। ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাসিত হয়। এদের লক্ষ্য অস্ত্র দিয়ে শরীয়াহ আইন প্রতিষ্ঠা। গণতন্ত্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিপক্ষে এর অবস্থান। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় এরা বাংলাদেশে অনেক নাশকতামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করেছে। বিচারবিভাগ ও সংখ্যালঘুরাও এদের হামলার লক্ষ্যবস্তু। হবিগঞ্জের সাইদুর রহমান এখন এ সংগঠনের নেতা। ২০০৭ সালের মার্চে জেএমবির শীর্ষ নেতা শায়খ আব্দুর রহমান ও সিদ্দিকুর রহমান ওরফে বাংলা ভাই এবং মজলিশ-ই-সুরার অপর চার সদস্যকে ঝালকাঠির দুই বিচারক হত্যার দায়ে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। সাত সদস্যের একটি দল এর অভিযানগুলো পরিচালনা করতো। জেএমবির জনশক্তির সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে কিছু প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ সংখ্যা সার্বক্ষণিক ১০ হাজার সদস্য এবং খন্ডকালীন এক লাখ । বাংলাভাইয়ের অবস্থান উত্তরাঞ্চলে হলেও পুরো দেশজুড়েই এর নেটওয়ার্ক রয়েছে। ২০০৫ সালের আগস্টে ৬৩ জেলার ৫'শ টি স্থানে একযোগে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এর শক্তি জানান দেয় জেএমবি। কুয়েত,সৌদিআরবসহ বাইরের বেশ কিছু এনজিওর কাছ থেকে সমাজকল্যাণমূলক কাজের কথা বলে অর্থ সহায়তা নেয় জেএমবি। জাগ্রত মুসলিম জনতা, হিযবুত তাওহিদ, রোহিঙ্গা সলিডারিটি সংগঠনসহ বাইরের কিছু শক্তির সাথে এদের যোগসাজশ রয়েছে।

জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি)ঃ

জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ ও জেএমবি একই সংগঠন। ২০০৪ সালে এরা আলোচনায় আসে। এর নেতা বাংলা ভাইর ২০০৭ সালে মৃত্যুদন্ড হয়। ২০০৪ এ সংগঠনটি নিষিদ্ধ হয়। সেই থেকে এটিকে খুব সক্রিয় দেখা যায়নি।

শাহাদাত-ই আল হিকমাঃ

৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ সালে এ সংগঠনটি রাজশাহীতে যাত্রা শুরু করে। এর নেতৃত্বে রয়েছেন কাওসার হোসেন সিদ্দিক। মাফিয়া ডন দাউদ ইব্রাহিম এ সংগঠনকে অর্থ যোগাতো বলে অভিযোগ রয়েছে। সহিংসতার মাধ্যমে সংবিধান পরিবর্তনসহ ৭ দফা ঘোষণা করায় বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার সে মাসেই এ সংগঠনকে নিষিদ্ধ করে। সে সময় সংগঠনটির নেতা কাওসার হোসেন জানিয়েছেন, ১০ হাজার কমান্ডো এবং ২৫ হাজার যোদ্ধা ইসলামিক বিপ্লবে কাজ করবে। আল কায়েদার সাথেও তাদের যোগাযোগ আছে বলে তারা দাবি করেছিল। যদিও কয়েক বছর থেকে এ সংগঠনের কথা আর শোনা যায়নি।

হিযবুত তাওহিদঃ

১৯৯৪ সালে টাঙ্গাইলের করোটিয়া গ্রামে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। নেতৃত্বে বায়েজিদ খান পন্নী ওরফে সেলিম পন্নী যিনি নিজেকে স্বঘোষিত ইমাম-উজ-জামান বলে দাবি করেছেন। হিযবুত তাওহিদের আদর্শ যারা মেনে চলবে না তারা প্রকৃত মুসলিম নয় বলে মনে করে এর সদস্যরা। "দাজ্জাল" এবং "এই ইসলাম প্রকৃত ইসলাম নয়" নামে বেশ কিছু

বই লিখেন তিনি। সারাদেশে এর ১২'শ প্রশিক্ষিত সদস্য রয়েছে। এর একটি নারী শাখাও রয়েছে। অনেক রিপোর্টে এর একটি আত্মঘাতী শাখা রয়েছে বলেও জানা যায়। এর সদস্যরা মরিচের গুড়া, হাতুড়ি, গুল দিয়ে আক্রমণ করে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা কুস্টিয়া, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, মাগুরা এবং চুয়াডাঙ্গায় এদের সক্রিয় দেখা যায়।

ইসলামী সমাজঃ

জামায়াত-ই-ইসলামীর খন্ডিত একটি অংশ এ সংগঠন ১৯৯৩ সালের ৬ই মে মুফতি আব্দুল জাব্বারের নেতৃত্বে গঠিত হয়। সাবেক ছাত্রশিবির নেতা সৈয়দ হুমায়ূন কবীর বর্তমানে এ সংগঠনের নেতৃত্বে। দেশে ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠা এর মূল লক্ষ্য। গনতন্ত্রকে মানুষের সৃষ্ট আখ্যা দিয়ে এটা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বলে মনে করে সংগঠনটি। বান্দরবানে সংগঠনটি সক্রিয়। কুমিল্লার কশিয়ারা গ্রামে এর প্রধান কার্যালয়। জেএমবিসহ বিভিন্ন সংগঠনের সাথে এর সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

উলেমা আনজুমান আল বাইয়্যিনাতঃ

ঢাকাভিত্তিক রাজারবাগ দরগাহ শরীফের অনুসারীদের নিয়ে সংগঠনটি গঠিত হয়। ইসলামের সুফি প্রথায় বিশ্বাসী এ সংগঠনের নেতৃত্বে রয়েছে সৈয়দ মুহাম্মদ মুখলেসুর রহমান। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধী এরা। তাদের বিশ্বাস এ দলগুলো ধর্মের নামে ব্যবসা করছে। আওয়ামীলীগ এবং বিএনপি তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেনা বলে মনে করে এ সংগঠন। এরা মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের পক্ষে। আওয়ামীলীগের বিজয় চায়। সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদে বিশ্বাসীনয়। কিন্তু তাদের মূখপাত্র দৈনিক আল ইহসান এবং মাসিক আনজুমান আল বাইয়্যিনাতে জিহাদের স্বপক্ষে লেখা হয়েছে। তারা ভাস্কর্য শিল্পের ঘোর বিরোধী। সারাদেশে তাদের ত্রিশ লাখ অনুসারী রয়েছে বলে দাবি করে তারা।

হিযবুত তাহরীরঃ খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে এ সংগঠনটির যাত্রা। ইসলামী আইন, সমমনা সমাজ প্রতিষ্ঠা, সমাজ পরিবর্তনে কাজ করা। সম্প্রতি তারা তাদের ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেছে । খিলাফত, শরীয়াহ আইন এবং বাংলাদেশের সম্পদের উপর বিদেশী অধিকার রহিত করার দাবি সম্বলিত। তারা নির্বাচনেরও বিপক্ষে। এ সংগঠনের নেতৃত্বে রয়েছেন মহিউদ্দিন আহমেদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এর সদস্য। ২০০৯ এর বিডিআর বিদ্রোহে ভারতের ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে বিশ্বাস করে এ সংগঠন। বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের সাথে এদের সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টিঃ

২০০৮ সালের মে মাসে আত্মপ্রকাশ ঘটে। এ সংগঠনের বেশিরভাগই নেতাই আফগান ফেরত। শরীয়াহ আইন প্রতিষ্ঠা এর মূল লক্ষ্য। হুজি নেতা শেখ আব্দুস সালাম এ সংগঠনের প্রধান নেতা। এরা হুজির সাথে সম্পর্ককে অস্বীকার করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় এরা রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন পেলেও নবম জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণে নিষিদ্ধ করা হয়।

তৌহিদ ট্রাস্টঃ

আহলে হাদীস আন্দোলনের নেতা ড.গালিব এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। উত্তরাঞ্চলে এ সংগঠন সক্রিয়।কুয়েত ভিত্তিক বেসরকারী সংস্থা রিভাইভাল অফ ইসলামিক হেরিটেজ থেকে অর্থসহায়তা পেয়ে থাকে।ব্যবস্থাপনা ত্রুটির কারণে যদিও ২০০৫ সাল থেকে অর্থ প্রাপ্তি বন্ধ রয়েছে। বর্তমানে এর কার্যক্রম বন্ধ।

তমির উদ দীনঃ

হুজি নেতা মুফতি আব্দুর রউফ এর প্রতিষ্ঠাতা। ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্র ১৯৯৯ সালে ইসলামী দাওয়াতি কাফেলা থেকে বহিস্কৃত হয়ে এটি প্রতিষ্ঠা করে। ২০০৬ সালের আগস্টে মুফতি রউফের গ্রেফতারের পর এর নাম হয় হিযবে আবু ওমর। এরা অস্ত্রের মাধ্যমে বিদ্রোহে বিশ্বাসী। শিক্ষক ও কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা এর সদস্য। ঢাকা, ময়মনসিংহ, শেরপুর, বরিশাল, ভোলা, ফরিদপুর, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, সিলেট, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুরও পঞ্চগড়ে এদের কার্যক্রম রয়েছে। যাকাত ফিতরা ও ধর্মানুরাগীদের দান ও অনুদান দিয়ে এরা চলে।

আল্লার দলঃ

এর সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায়না। প্রোব ম্যাগাজিনের তথ্য অনুযায়ী ছাত্রশিবিরের সাবেক দুই নেতা মতিনুল ইসলাম মতিন ও বাবুল আনসারী এর প্রতিষ্ঠাতা। আহলে হাদীস আন্দোলন এবং জেএমবির সাথে এদের যোগাযোগ আছে। জিহাদের মাধ্যমে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করা এদের মূল লক্ষ্য। বিভিন্ন সময় এরা প্রচারণামূলক লিফলেট, বই, পুস্তিকা বিলি করে থাকে। এর প্রতিষ্ঠাতা বাবুল আনসারী ২০০৫ সালের অক্টোবরে গ্রেফতার হয় এবং ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে তার মৃত্যুদন্ড কার্যকর হয়। মতিন এখন কারাগারে রয়েছে (*ভট্টাচার্য, জয়িতা;* ২০০৯)।

সন্ত্রাসবাদ ও ধর্মীয় জঙ্গীবাদঃ

কাউন্সিল ফর এশিয়ান ট্রান্সন্যাশনাল থ্রেট রিসার্চ এর এশিয়া কনফ্লিক্ট রিপোর্টের ট্রান্সন্যাশনাল সিকিউরিটি থ্রেটস ফেসিং বাংলাদেশ শীর্ষক প্রবন্ধে নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মুনিরুজ্জামান লিখেছেন, একুশ শতক বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকি, এমন অনেক বিষয় তাকে সামলাতে হবে। দুই পরাশক্তি ভারত ও চীনের প্রতিবেশি এবং মিয়ানমার ও পাকিস্তানের কাছাকাছি অবস্থান হওয়ায় বাংলাদেশ বিভিন্ন অবৈধ ব্যবসার একটি জমজমাট রুট। সন্ত্রাস ও ধর্মীয় জঙ্গীবাদ বাংলাদেশের জন্য একটি গভীর উদ্বেগের বিষয়। কারণ একটি উদার, গণতান্ত্রিক মুসলিম দেশের যে ভাবমূর্তি বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের রয়েছে তা একদশকে কিছুটা হলেও ম্লান হয়েছে। সন্ত্রাস মানুষের জীবনের জন্য, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য এবং ধর্মীয় উদারপন্থার জন্য হুমকি। সন্ত্রাস, রাষ্ট্র ও সমাজে নিরাপত্তাহীনতা ও অস্থিতিশীলতা তৈরি করে। গত দুই যুগে বাংলাদেশে উগ্রপন্থী হরকতুল জিহাদ বাংলাদেশ, জমিয়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ, জেএমবি এবং শাহাদাত-ই আল হিকমা, হিযবুত তাহরীর, হিযবুত তাওহীদ, ইসলামী সমাজ ও আল্লার দল অন্যতম। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংগঠনের সাথে এদের যোগসূত্র রয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মতে, দেশে এখনো এসব সংগঠন সক্রিয়। দেশের সীমানার মধ্যে থেকেই এসব সংগঠন এখনো সাহায্য সহযোগিতা, প্রশিক্ষণ এবং অর্থসহায়তা ঠিক পাচ্ছে। আল কায়েদার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হরকতুল জিহাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের আসাম পুলিশের ধারণা জেএমবি ভারতের সীমানায় তাদের কার্যক্রম বৃদ্ধিতে সক্রিয়।

আন্তঃদেশীয় অপরাধী সংগঠনঃ বিশ্বায়ন, বাণিজ্য উদারীকরণ এবং যোগাযোগের দ্রুততর উন্নতির ফলে আন্তঃদেশীয় অপরাধী সংগঠনের বিকাশ দ্রুত হচ্ছে। বৈধ বা অবৈধ ব্যবসার বিকাশে এসব গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আন্তদেশীয় অপরাধী সংগঠনগুলোকে এসব ব্যাপক সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। মাদক, অস্ত্র, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ, মানুষ, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাচারসহ অনেক অবৈধ ব্যবসার নিরাপদ রুট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া নারী ও শিশুদের স্থান হচ্ছে ভারত, পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে গৃহকর্মী বা পতিতালয়ে। শিশুদের উটের জকির কাজও করতে হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে।

অস্ত্র, মাদক ও মানবপাচারঃ

অবৈধ অস্ত্র ব্যবহার ও ব্যবহার বাংলাদেশের একটি আন্ত:দেশীয় সমস্যা। আন্ত:দেশীয় জঙ্গী ও বিপ্লবী সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর অস্ত্র পাচারের নিরাপদ স্থান বাংলাদেশ। গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী উত্তর, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বিশেষ করে চট্টগ্রাম, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, সন্দ্বীপ, হালুয়াঘাট, এবং চরাঞ্চলের অনেক অঞ্চলকে গোপন অস্ত্রের রুট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলসহ অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা জমজমাট। অবৈধ ব্যবসার জন্য ছয়টি সীমান্ত এলাকায় ২৯টি পয়েন্ট রয়েছে। কুস্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, যশোহর ও সাতক্ষীরা। এর মধ্যে কুস্টিয়ার ৪টি পয়েন্ট, ঝিনাইদহের ৫টি, চুয়াডাঙ্গার ৪টি, মেহেরপুরের ৩টি, সাতক্ষীরা ৬ এবং যশোরের ৭টি স্থানে এসব অবৈধ অস্ত্র কেনা-বেচা হয়ে থাকে।

মাদকঃ বাংলাদেশ মাদক পাচারের একটি নিরাপদ রুট। বিশেষ করে হেরোইন, হাসিস, আফিম, ফেনসিডিল, প্যাথেডিন, অথবা নেশাদ্রব্য বেশি পাচার হয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী ভারত ও মিয়ানমার যখন মাদক পাচারের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ রুট হিসেবে পরিগণিত হয় তখন বাংলাদেশ হয় পাচারকারীদের নিরাপদ রুট।

নারী ও শিশু পাচারঃ মানব পাচার সমগ্র বিশ্বের জন্যই একটি ভয়াবহ সমস্যা। বাংলাদেশ এর জঘন্য শিকার। গত তিন দশকে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ১০লাখ নারী ও শিশু পাচার হয়েছে। ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে প্রতি মাসে ৪০০ জন নারী শিশু পাচার হয়ে যাচ্ছে। আরেকটি রিপোর্টের তথ্যমতে, গত ১০ বছরে শুধু ভারতেই ১২ থেকে ৩০ বছর বয়সী নারী ও শিশু পাচারের সংখ্যা তিনলাখ। আইনজীবীদের একটি মানবাধিকার সংগঠন জানায়, একই সময়ে পাকিস্তানে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লাখ।

জলবায়ু পবির্তন ও পানির নিরাপত্তাঃ বাংলাদেশ তার জনসংখ্যা, ভৌগলিক আয়তন, আর্থ-সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী বাংলাদেশ বিশ্বের ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। জলাবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব, সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধি, আবহাওয়ায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বরফ গলে যাওয়া, ভূমিকম্প প্রবণতা ও ঋতু পরিবর্তন এ হুমকির কারণ (মুনিরুজ্জামান মেজর জেনারেল অব. ; ট্রান্সন্যাশনাল সিকিউরিটি থ্রেটস ফেসিং বাংলাদেশ)।

মাদ্রাসা শিক্ষা ও অর্থায়ন : বিশ্বব্যাংকের প্রশ্ন:

দেশে প্রথমবারের মতো বিশ্বব্যাংক মাদরাসার ওপর গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তাঁদের মতে, এর আগে মাদরাসা শিক্ষা খাত নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোন গবেষণা হয়নি। সম্প্রতি ঢাকার একটি হোটেলে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আয়োজিত "Secondary School- Madrasah in Bangladesh: Incidence, Quality and Implication for Reform শীর্ষক রিপোর্টে বলা হয়, "অনিয়ন্ত্রিত এ মাদরাসার সঙ্গে বাংলাদেশে জঙ্গী নাশকতার সম্পর্ক রয়েছে। প্রচলিত শিক্ষানীতি এবং কোন ধরনের তদারকের বাইরে কওমী মাদরাসাগুলো আসলেই ধর্মীয় শিক্ষার নামে কি করছে তা জরুরী ভিত্তিতে খতিয়ে দেখার পরামর্শ দিয়েছে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা বিশ্বব্যাংক। শিক্ষার ধরন, অর্থায়নের উৎস, শ্রেণীকক্ষের চিত্র, সাংগঠনিক বিন্যাস সব ক্ষেত্রেই কওমী মাদরাসার রয়েছে আলাদা বৈশিষ্ট্য। যদিও তাদের এসব কার্যক্রম সম্পর্কে কারও কোন স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাচ্ছে না। সবচেয়ে রহস্যজনক বিষয়টি হচ্ছে ছাত্রদের পরিচিতি গোপন রাখা। মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রদের ২ দশমিক ২ ভাগ ছাত্র কওমী মাদরাসায় নিবন্ধিত রয়েছে বলে। কিন্তু বাস্তব চিত্রটি হচ্ছে, কওমী মাদরাসায় নিবন্ধিত ছাত্রসংখ্যার চেয়ে বাস্তবে অনেক বেশি ছাত্রের উপস্থিতি দেখা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ের কওমী মাদরাসায় নিবন্ধন দেখানো হয়েছে ১ দশমিক ৯ ভাগ। শ্রেণী কক্ষে বাস্তব উপস্থিতির হার আরও অনেক বেশি। এসব কারণে কওমী মাদরাসাকে সরকারের নজরদারিতে আনা উচিত।"

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বব্যাংকের ভাষ্য মতে, সরাসরি পরিচালিত এ গবেষণায় ৪০০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদরাসার শিক্ষার ওপর জরিপ করা হয়। সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে ৯ হাজার ছাত্রছাত্রীর। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য যাওয়া হয়েছে ছাত্র ও শিক্ষকদের বাড়ি বাড়ি। গবেষণায় বিশ্বব্যাংক বর্তমান মাদরাসা শিক্ষার মান, পরিবেশ এবং ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন সুপারিশ করেছে। সমগ্র মাদরাসা শিক্ষা খাতকে সংস্কার করে মূলধারার শিক্ষানীতি এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনার তাগিদ দেয়া হয়েছে এ রিপোর্টে। এ অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, ঢাকায় বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডাইরেক্টর এলেন গোল্ডস্টেন, সাবেক অতিরিক্ত সচিব আশাবুর রহমান, বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র শিক্ষা বিশেষজ্ঞ মিস হেলেন জে. ক্রেগ এবং দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের সেক্টর ম্যানেজার অমিত ধর উপস্থিত ছিলেন। মাদরাসা শিক্ষা খাতের ওপর পরিচালিত গবেষণার রিপোর্টের উল্লেখযোগ্য দিক বর্ণনা করেন অক্সফোর্ড এ্যান্ড রিডিং ইউনিভার্সিটির ডক্টর এম নিয়াজ আসাদুল্লাহ।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয় কওমী মাদ্রাসায় গণিত ও ইংরেজিতে ৮২ ও ৮০ শতাংশ শিক্ষকের কোনো প্রশিক্ষণ নেই। আলিয়া মাদরাসায় ৪২ এবং মাধ্যমিক স্কুলে ১৬ শতাংশ শিক্ষকের গণিত বিষয়ে কোনো প্রশিক্ষণ নেই। একইসঙ্গে ইংরেজিতে আলিয়া মাদরাসায় ৪৪ ও মাধ্যমিক স্কুলে ১৯ শতাংশ শিক্ষকের কোনো প্রশিক্ষণ নেই। ৪শ মাধ্যমিক স্কুল ও মাদরাসার ৯ হাজার শিক্ষার্থীর ওপর এক জরিপ চালিয়ে বিশ্বব্যংক এ প্রতিবেদন তৈরি করে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মাদরাসা শিক্ষায় মেয়েরা অংক এবং ইংরেজিতে ছেলেদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। এজন্য কওমী মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার সুপারিশ করেছে বিশ্বব্যাংক। প্রতিবেদনে বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং মূল ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে এ ধারার গুণগত পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে।' ডক্টর আসাদুল্লাহ জানান, 'দেশের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কওমী মাদরাসার ভূমিকা মাত্র এক দশমিক নয় শতাংশ। মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে তা দুই দশমিক দুই শতাংশ। তবে প্রাথমিক শিক্ষায় আলিয়া মাদরাসা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রাথমিক শিক্ষার ৮ দশমিক ৪ শতাংশ জুড়ে রয়েছে এ মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ১৯ শতাংশ জুড়ে রয়েছে এ মাদরাসা শিক্ষা। পুরো শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। এখানে মেয়েদের অংশগ্রহণের সংখ্যাও খুব দ্রুত হারে বাড়ছে।' পুরো শিক্ষা ব্যবস্থায় কওমী মাদরাসা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিভাগের ৪ দশমিক ১ শতাংশকে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার সুপারিশ করেছে বিশ্ব ব্যাংক। প্রতিবেদনে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে আলিয়া মাদরাসার গুণগত মানের পার্থক্য দূরীকরণ এবং কওমী মাদরাসাকেও আলিয়া মাদরাসার মতো একটি নির্দিষ্ট কারিকুলামের আওতায় নিয়ে আসার সুপারিশ করা হয়।

মাদরাসা শিক্ষার বিকাশে দরিদ্রতা:

মাদরাসা শিক্ষা খাতের বিস্তারের পেছনে দেশের অর্থনীতি একটি বড় কারণ বলেও উল্লেখ করেছে বিশ্বব্যাংক। গবেষণায় বলা হয়েছে "দেশের দরিদ্রতম এলাকা ও গ্রামগঞ্জেই মাদরাসার প্রসার ঘটেছে। দরিদ্র পরিবারগুলো তাদের ছেলেমেয়েকে মাদরাসাতেই পাঠাতে আগ্রহী হয়। আয়ের সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষার কিছু সম্পৃক্ততা রয়েছে। মাদরাসাগুলোতে ভর্তির হার বিশেষ করে মেয়েদের ভর্তির হার দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতি ৫টি শিশুর একজন যায় মাদরাসায়। এ পর্যায়ের ১৯ ভাগ ছাত্র আলীয়া মাদরাসায় নিবন্ধিত হয়, অন্যদিকে মাত্র ২ দশমিক ২ ভাগ ছাত্র কওমী মাদরাসায় নিবন্ধিত রয়েছে।" "কওমী মাদরাসার প্রকৃত সংখ্যা কত তা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। কোথায় কিভাবে এগুলো পরিচালিত হচ্ছে তা খতিয়ে দেখা উচিত। বিভিন্ন সময়ে জনপ্রিয় সংবাদ মাধ্যমগুলোয় গ্রামগঞ্জে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের যত কওমী মাদরাসার সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। আসলে বাংলাদেশে বাস্তবে সে হারে কওমী মাদরাসা নেই। অর্থাৎ এদের সংখ্যা বেশি নয়।"

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় মৌলবাদ ও মাদরাসা শিক্ষার ব্যাপ্তি:

বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, "দক্ষিণ এশিয়ায় ধর্মীয় মৌলবাদ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাদরাসারও দ্রুত ব্যাপ্তি ঘটেছে। বাংলাদেশেরই কিছু মাদরাসার ডিগ্রীধারী ছাত্র সঙ্গীত উৎসবে সন্ত্রাসী বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত ছিল বলা হয়েছে। এমনকি কিছু বিচারককেও হত্যা করেছে মাদরাসা ছাত্ররা। এরপরও মাদরাসার সংখ্যা বাড়ছে। দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে এবং সরকারের দুর্বল নজরদারির কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশে দ্রুত হারে মাদরাসার সংখ্যা বেড়েছে। পাকিস্তানেও একই চিত্র দেখা যায়। তারপরও উপমহাদেশের মধ্যে বাংলাদেশেই সর্বোচ্চ সংখ্যক ধর্মীয় সভাকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বিশ্বের মধ্যে ধর্মীয় সভা করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দ্বিতীয় এবং ইন্দোনেশিয়ার পর অবস্থান।" বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত পয়েন্টগুলো সামনে এসেছে।

- ⇒ কওমী মাদরাসায় কী হচ্ছে সকলের অজানা;
- ⇒ অর্থের উৎস জানা যায় না;
- ⇒ নিবন্ধিত ছাত্রের থেকে বাস্তবে ছাত্র বেশি;
- ⇒ মাদরাসা ছাত্ররা গানের অনুষ্ঠানে বোমা হামলা ও বিচারক হত্যা করেছে;
- ⇒ ধর্মীয় সভার (ওয়ায, যিকির, সীরাতুন্নবী ও তাফসীর মাহফিল) অনুমোদন নিয়ে প্রশ্ন;
- ⇒ দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে এবং সরকারের দুর্বল নজরদারির কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশে দ্রুত হারে মাদরাসার সংখ্যা বেড়েছে।

প্রতিবেদন মূল্যায়ন:

বিশ্বব্যাংক মাঝে মধ্যে ঢাকায় মাদরাসা শিক্ষা নিয়ে সেমিনার ও মত বিনিময়ের আয়োজন করে থাকে। তাদের এ সব কর্মকান্ড কতটুকু নিরপেক্ষ ও বাস্তবধর্মী এ প্রসঙ্গ সঙ্গতভাবে উঠতে পারে। তাদের জরিপে জনমতের প্রতিফলন ঘটে বলে মনে হয় না। জরিপ পরিচালিত মাদরাসাগুলো কোন ক্যাটাগরির তাও অস্পষ্ট। তাঁদের বক্তব্য ও মন্তব্য অনেক সময় স্ববিরোধী হওয়ায় সততা নিয়ে প্রশ্ন উঠে। কোন সেমিনারে কওমী মাদরাসার সাথে সম্পৃক্ত প্রতিনিধিত্বশীল কোন ব্যাক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয় না। ফলে বিশ্ব ব্যাংকের মত হয়ে উঠে একপক্ষীয়। বিশ্বব্যাংক কর্তৃপক্ষ যদি কওমী মাদরাসায় পাঠদানে নিয়োজিত বাংলা, ইংরেজী, গণিত ও কম্পিউটারের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন তাহলে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তাঁদের এ উদ্যোগকে নিশ্চয় স্বাগত জানাবেন। আরব বিশ্ব থেকে ভাষা বিশেষজ্ঞ এনে কওমী মাদরাসার শিক্ষার্থীদের আধুনিক আরবী ভাষার কথোপকথন ও রচনার উপর স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে বিশ্ব ব্যাংকের আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।

মাদ্রাসা শিক্ষার স্বরূপ:

১৮৬৬ সালের ২১ মে (১২৮৩ হি.) ভারতের উত্তর প্রদেশের দেওবন্দ শহরে আল্লামা কাছেম নানুতুভী রহ. ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির পুনুরুজ্জীবনে 'দারুল উলুম' নামক যে শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন, এটাই গোটা দুনিয়ায় কওমী মাদরাসার সূতিকাগার হিসেবে স্বীকৃত। বৈরী পরিবেশে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি, বিশুদ্ধ আকীদা, তাহযিব-তামাদ্দুনের বিকাশে দারুল উলূম দেওবন্দের অবদান ঐতিহাসিক। সুপ্রাচীন কাল থেকে ধর্মপ্রাণ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা, উদ্যোগ ও অর্থায়নে কওমী মাদরাসা সমুহ স্বতন্ত্র শিক্ষাধারায় দ্বীন ইসলামের মশাল প্রজ্জলিত রেখেছে। শতবছর ধরে হাজার হাজার কওমী মাদ্রাসা এতদঞ্চলে পবিত্র কুরআন ও হাদীস শিক্ষাদানের মাধ্যমে দেশপ্রেমিক, চরিত্রবান, যোগ্য ও আদর্শবান জনগোষ্ঠী তৈরীর মহৎ কাজ আঞ্জাম দিয়ে আসছে। এক্ষেত্রে কওমী মাদ্রাসার সফলতা বলতে গেলে ঈর্ষণীয়। কওমী মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ মাতৃভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, ধর্মীয় মূল্যবোধ, জাতীয় নিরাপত্তা ও অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অঙ্গিকারাবদ্ধ। ধর্ম প্রচার,

Dhaka University Institutional Repository

নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সমাজসেবা ও নৈতিক আবহ সৃষ্টিতে কওমী মাদ্রাসার অবদান সর্বজন স্বীকৃত।সন্ত্রাস বোমা ও জঙ্গীপ্রশিক্ষণের সাথে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্টতা এতো সহজেই সামাধানে আসার বিষয় নয়, এ জন্য আরো নিবিড় গবেষণার প্রয়োজন।আর বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রপরিচালনায় আসা সরকারগুলো কখনোই কওমী মাদ্রাসার জন্য আলাদাভাবে কিছু করতে বিশেষ করে মাদ্রাসা পরিচালনাকারী শিক্ষক বা ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে আস্থায় নিয়ে একে আরো আধুনিক করার উদ্যোগ নেয়নি,অথবা নিলেও তা বাস্তবায়নে সফলতা পায়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য **ড. এমাজ উদ্দীন আহমদ** জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তা এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য: "মাদরাসা শিক্ষার একটা গৌরবজনক অধ্যায় রয়েছে। উপমহাদেশে যখন মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তখন মক্তব মাদ্রাসা নামে পরিচিত ছিল। ১৮৩৫ সালে লর্ড মেকলে কমিশনের পর স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এসব শব্দগুলো মানুষ জানতে পেরেছে। মাদরাসায় লেখাপড়ার মান উন্নত ছিল। কুর'আন-হাদীসের পাশাপাশি ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক পড়ানো হতো। মাদরাসা থেকে বেরিয়েছেন এ উপমহাদেশের বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি। তাঁরা রাজনীতির ক্ষেত্রে, সমাজ সেবার ক্ষেত্রে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অথবা কবি সাহিত্যিক হিসেবে স্বনামধন্য। তাঁদের নাম বলে শেষ করা যাবে না। দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কওমী মাদরাসার প্রচলন হয়। এ মাদরাসার ছাত্রদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করে গড়ে তোলার ঐতিহ্য রয়েছে। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম অথবা বিভিন্ন পর্যায়ে জনস্বার্থ রক্ষার আন্দোলনে কওমী মাদরাসার বড় ভূমিকা ছিল। দেশের একটি বিশাল শিক্ষার্থীর অংশ এখনো কওমী মাদরাসা হতে আলো পায়" (*নয়া দিগন্ত, ২০০৯*)।

মাদ্রাসা শিক্ষা এ দেশের বাস্তবতা:

বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় ছড়িয়ে আছে শত শত মাদ্রাসা। বর্তমান সরকার ও মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি ও সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য তৃতীয় একটি শক্তি সক্রিয়। তৃতীয় শক্তিটি সরকারের বন্ধু বেশে শত্রু কওমী মাদ্রাসার উপর সরকারের কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ ধর্মপ্রাণ জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। এটা ঐতিহ্যসমৃদ্ধ একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষায়িত শিক্ষাধারা (Specialized Education) (ড.খালিদ হোসেন; ৫ সেপ্টেম্বর-২০১১)। রাজনৈতিক বা অন্য কারণেও সাম্প্রতিক সময়ে কওমী মাদ্রাসাকে সরকার একটি কাঠামোয় আনার চেষ্টার ঘোষণা দিলে ধর্মীয় নেতারা সরকারকে এ থেকে সরকারকে সরে আসার আহবান জানায়।পরবর্তিতে অবশ্য সরকার এ বিষয়ে আর কোন উদ্যোগ নেয়নি। সরকারী শিক্ষা পাঠ্যক্রম থেকে এটি সম্পূর্ণ আলাদা। কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা পরিচালনার জন্য আলাদা বোর্ড রয়েছে। সেখানে মূলত:কুরআন ও হাদীস বিষয়েই শিক্ষা দেয়া হয়।

বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য বোমা হামলার ঘটনা:

গত ১৪ বছরে সারাদেশে প্রায় ৬৩ টির বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। এসব বোমা হামলার ঘটনায় কয়েকশ নিহত ও আহত হন কয়েক হাজার মানুষ। বর্তমান সরকারের সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ১৪ টি বোমা হামলার ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানটের পহেলা বৈশাখের বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠানে রমনা বটমূলে সিরিজ বোমা হামলা হয়। ১৪ই এপ্রিল ২০০১ সালে এ বোমা হামলা হয়। বোমা হামলার আট বছর পর ঢাকার একটি আদালত মুফতি হান্নানসহ ১৩ জনকে অভিযুক্ত করে চার্জ গঠন করে।

১৯৯৯ সালে তিনটি ভয়াবহ বোমা হামলার ঘটনা ঘটে। এতে ১৮ জন নিহত হলেও আহত হন দু শতাধিক মানুষ। এই বছর সবচেয়ে শক্তিশালী বোমা হামলার ঘটনা ঘটে যশোরের টাউন হল ময়দানের বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর সম্মেলনে।

এছাড়াও এ বছর ৮ অক্টোবর খুলনার আহমদিয়া মসজিদে বোমা হামলায় আট জন নিহত ও আহত হয় ৫০ জন। ২০০০ সালে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় শেখ হাসিনার জনসভায় ৭৬ কেজি ওজনের পুঁতে রাখা বোমা উদ্ধার করা হয়। জনসভা শুরুর আগেই এই শক্তিশালী বোমাটি উদ্ধার হওয়ায় বড় ধরনের হতাহতের ঘটনা থেকে বেঁচে যায় দেশ।

২০০১ সালে ঢাকার রমনা বটমূলসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ৫ পাঁচটি বোমা হামলার ঘটনা ঘটে। এসব বোমা হামলায় ৫৮ জনের প্রাণহানী ঘটে। রমনা বটমূলে সকাল ৮ টার দিকে আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীর বহন করা প্রথম বোমাটি বিস্ফোরিত হয়। এরকিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় বোমাটি বিস্ফোরিত হয়। এক পুলিশ সদস্য বোমা হামলায় আহত হয়। পুলিশ অবিস্ফোরিত অবস্থায় আরো একটি বোমা উদ্ধার করে । রমনা বটমূলের এ অনুষ্ঠানটি রাষ্ট্রীয় টিভি চ্যানেল বিটিভি সরাসরি সম্প্রচার করছিল। সারাদেশের মানুষ এ বোমা হামলার ঘটনা সরাসরি প্রত্যক্ষ করে। এতে ১১ জন নিহত হয়। বোমা হামলার পর সারাদেশের বর্ষবরণের সব অনুষ্ঠান বাতিল করা হয় । এছাড়া, ঢাকার পল্টনে কমিউনিস্ট পার্টির সমাবেশে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় ৭ জন, গোপালগঞ্জের বানিয়ারচরের গির্জায় ১০ জন নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী লীগের অফিসে ২১ জন, বাগেরহাট জনসভায় ৯ জন, সুনামগঞ্জে আওয়ামী লীগের নেতা সুরঞ্জিত সেনের জনসভায় বোমা হামলায় চার জন নিহত হয়। আহত হয় কয়েক শতাধিক।

২০০২ সালে সিরাজগঞ্জ ও সাতক্ষীরায় বোমা হামলার ঘটনায় ১৫ নিহত হয়। ওই বছরের ২৬ সেপ্টেম্বর সিরাজগঞ্জে আওয়ামী লীগের জনসভায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় চার জন মারা যায়। এর দুদিন পর সাতক্ষীরায় বোমা হামলায় তিন জন নিহত হয়। এর দু মাস পরে ৭ নভেম্বর দেড় ঘন্টার ব্যবধানে চারটি সিনেমা হলে হামলা হয়। এতে আরও আট জন নিহত হয়। আর এসব হামলার ঘটনায় আহত হয় কয়েক শ মানুষ।

এরপরের বছর ঘটে আরো পাঁচটি বোমা হামলার ঘটনা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বোমা হামলাটি হয় ২০০৪ সালের ১২ জানুয়ারি হযরত শাহজালাল (র) মাজার প্রাঙ্গণে। এতে সাত জন নিহত হয়। এরপর মে মাসে বোমা হামলায় দুজন মারা যায়। এ হামলার ঘটনায় দুজন আহত হয়। আর অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পায় বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত আনোয়ার চৌধুরি ও সিলেটের জেলা প্রশাসক (উইকিপিডিয়া)।

২০০৪ সালের গ্রেনেড আক্রমণঃ

২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, এতে ঘটনাস্থলেই ২৩ জন ও পরে ১ জন সহ ২৪ জন নিহত হয়। আহত হয় অনেকেই।

ঘটনা এবং হতাহত : সিলেটে দলীয় জনসভায় বোমা বিস্ফোরণের প্রতিবাদে ঢাকায় আওয়ামীলীগ প্রধান শেখ হাসিনা যখন দলীয় প্রধান কার্যালয়ের সামনের জনসভায় বক্তব্য দিচ্ছিলেন তখনই একে এক ১৩টি গ্রেনেড বিস্ফোরিত হয়। ১৫হাজার লোকের এ সমাবেশে আশপাশের ছাদের উপর থেকে এ গ্রেনেডগুলো ছোড়া হয়,ঘটনাস্থলে শেখ হাসিনা দেহরক্ষীসহ ২৩জন মারা যায়। পরে হাসপাতালে চিকিতসাধীন আওয়ামীলীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা আইভি রহমান মারা যান। এ সময় অন্তত ২০০ লোক আহত হয় স্প্লিন্টারের আঘাতে।

২০০৫ সালের বোমা হামলাঃ

১৭ আগস্ট ২০০৫, সারাদেশের ৩০০ টি স্থানে একযোগে ৫'শ বোমা বিস্ফোরিত হয় । ৬৪ জেলার ৬৩টি তে মুন্সিগঞ্জ বাদে একযোগে এ বিস্ফোরণ ঘটে। বেলা সাড়ে ১১টা থেকে পরবর্তী আধা ঘন্টার মধ্যেই এ বিস্ফোরণগুলো ঘটে। সন্ত্রাসী সংগঠন জমিয়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ এ বোমা হামলার দায়িত্ব স্বীকার করে। শায়খ আব্দুর রহমান ও সিদ্দিকুর রহমান (বাংলা ভাই) এর নেতৃত্বে এ সংগঠনটি আল কায়েদার অনুসারী যদিও এটি প্রমাণিত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

সারাদেশে বোমা হামলার সময় আরেকটি সন্ত্রাসী সংগঠন হরকাতুল জিহাদ বাংলাদেশ তাদের সহযোগিতা করে বোমা বিস্ফোরণে। বিস্ফোরণের পর সরকার এ দুটি সংগঠনকে নিষিদ্ধ করে। এ বিস্ফোরণে সাভারে এক শিশু, ও চাপাইনবাবগঞ্জে এক রিকশাচালক নিহত ও ৫০ জন মানুষ আহত হয়। বোমা হামলার প্রধান অভিযুক্ত দুজন শায়খ আব্দুর রহমান ও সিদ্দিকুর রহমান বাংলা ভাইকে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র‍্যাব ২০০৬ সালের মার্চের প্রথম দিকে আটক করে। হত্যা এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের অভিযোগে তাদের ২০০৭ সালের ৩০ মার্চ মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়। এ দুজনের সাথে আরো ৪ জনকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয় । ২০০৯ সালে গাজীপুরের পুলিশ সম্মেলনে গ্রেনেড হামলায় ১২ জন মারা যায় (উইকিপিডিয়া)।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

জঙ্গীবাদ নির্মূলে বাংলাদেশে গণমাধ্যমের ভূমিকার মূল্যায়ন

বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ নির্মূলে গবেষণালব্ধ সংবাদ, নিবন্ধ, প্রবন্ধ প্রকাশের সংখ্যা খুব কম। যেটি দেখা যায়, তাহলো বোমা হামলার বর্ষপূর্তি সংক্রান্ত সংবাদ, এ সংক্রান্ত ফলোআপ সংবাদ, অথবা যখন রাজনীতিতে জঙ্গীবাদ ইস্যুটি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে, তখন সমমানসিকতার গণমাধ্যমগুলো সে রাজনৈতিক বক্তব্যকে সঠিক অথবা খন্ডনের চেষ্টা করে। আরেকটি হচ্ছে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দেয়া তথ্য উপস্থাপন।সে তথ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না কি সঠিক, তার বাছ-বিচার খুব কমই হয়। জঙ্গীবাদ সম্পর্কিত লেখার সাথে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের এজেন্ডা স্পষ্টত: লক্ষ্যণীয়। প্রকৃত অর্থে জনসচেতনতা এবং জঙ্গীবাদ দমনে গণমাধ্যমের কার্যকর ভূমিকা তেমনভাবে দৃশ্যমান নয়।

গণমাধ্যম কি?

গণমাধ্যম হচ্ছে এমন একটি মাধ্যম যা একসঙ্গে অনেক লোকের কাছে যোগাযোগের একটি পন্থা। এ প্রযুক্তি আবার ভিন্ন ধরনের হয়। যেমন রেডিও, ধারণকৃত গান, সিনেমা এবং টেলিভিশন এগুলো বৈদ্যুতিক উপায়ে ছড়িয়ে যায়। ছাপার মাধ্যম হচ্ছে বস্তুগত যেমন সংবাদপত্র, বই, পুস্তিকা, ইত্যাদি যা বিতরণ করতে হয়। বহির্মাধ্যম হচ্ছে গণমাধ্যমের আরেকটি রুপ যা বিলবোর্ড, সাইনবোর্ড, প্ল্যাকার্ড বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত ভবন, দোকানপাঠ, বাসে ব্যবহার হয়। আরেকটি বহির্মাধ্যম হচ্ছে উড়ন্ত বিলবোর্ড, ব্লিম্পস, এবং আকাশে লিখন। মানুষের সামনে কথা বলা এবং কোন আয়োজক মাধ্যমকেও গণমাধ্যম বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির গণমাধ্যম ইন্টারনেট আর মোবাইল যোগাযোগের সমন্বয়ে চালিত। ইন্টারনেট মাধ্যম একসাথে অনেককে মেইল, ওয়েবসাইট, ব্লগ ইন্টারনেট ভিত্তিক রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে একসাথে অনেককে এ সেবা দিতে পারে। এসেবা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন টিভি স্টেশন অথবা প্রকাশনা কোম্পানীও গণমাধ্যম হিসেবে পরিচিত। ২০ শতকের শেষের দিকে গণমাধ্যমকে আটটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। বই, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, রেকর্ডেড, রেডিও, মুভি, টেলিভিশন, এবং ইন্টারনেট। ২১ শতকের শুরু ও ২০ শতকের শেষের দিকে যোগাযোগ প্রযুক্তির বিস্ফোরণের ফলে গণমাধ্যম কাকে বলা হবে সে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, মোবাইল ফোন, ভিডিও গেমস এবং কম্পিউটার গেমসকে গণমাধ্যমের সংজ্ঞায় অন্তর্ভূক্ত করা হলে এ নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়। ২০০০ সালে এক শ্রেণীবিন্যাসে সাতটি জনপ্রিয় গণমাধ্যমের কথা বলা হয়। শুরু থেকে সেগুলো হচ্ছে:

১. মুদ্রণ : বই, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ইত্যাদি ১৫ শতকের শেষে
২. রেকর্ডিংস : গ্রামোফোন রেকর্ড, ম্যাগনেটিক টেপ, ক্যাসেট, সিডি, ডিভিডি ১৯শতকের শেষে
৩. সিনেমা : ১৯০০ সাল থেকে
৪. রেডিও : ১৯১০ সাল থেকে
৫. টেলিভিশন : ১৯৫০ সাল থেকে
৬. ইন্টারনেট : ১৯৯০ সাল থেকে

৭. মোবাইল ফোন ২০০০ সাল থেকে প্রত্যেকটি গণমাধ্যমেরই আলাদা উপাদান ও বৈশিষ্ট্য হয়েছে। ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোনকে একত্রে ডিজিটাল মিডিয়া বলা হয়। রেডিও টেলিভিশনকে সম্প্রচার মাধ্যম। টেলিফোন হচ্ছে একটি দ্বিমুখী যোগাযোগ মাধ্যম। গণমাধ্যম বলতে একটি বড় সংখ্যক গোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ স্থাপনকে বোঝায়। যদিও বর্তমানে আধুনিক মোবাইল ফোনে শুধুমাত্র একপাক্ষিক ব্যবহার হয়না, বরং আধুনিক ফোনে ইন্টারনেট প্রযুক্তি থাকায় এটা গণমাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যদিও এ রকম একটি কথা উঠছে মোবাইল ফোন নিজে

গণমাধ্যম না ইন্টারনেট ব্যবহারের একটি মাধ্যম মাত্র। বৈশিষ্ট্য: ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন থমসন গণযোগাযোগের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করেছে।

১. উৎপাদন ও বিতরণের প্রযুক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি নিয়ে গঠিত। মিডিয়ার ইতিহাসে মুদ্রণ থেকে ইন্টারনেট প্রত্যেকটির বাণিজ্যিক উপযোগিতা রয়েছে।

২. রুপক অর্থে পণ্যবিক্রি, যেমন রেডিও স্টেশন যেভাবে এর সময় বিক্রি করে, সংবাদপত্র যেমন একই কারণে এর জায়গা বিক্রি করে।

৩. উৎপাদন এবং তথ্য গ্রহণের আলাদা প্রসঙ্গ।

৪. সময় এবং স্থান অনেকের কাছে দেরীতে হলেও যেন পৌঁছানো যায়।

৫. তথ্য বিতরণ: একজন থেকে অনেকের কাছে তথ্য প্রদান, যেখানে উৎপাদিত পণ্য অনেকের কাছে পৌঁছাবে (উইকিপিডিয়া)।

বাংলাদেশে গণমাধ্যম পরিস্থিতিঃ

গত এক দশকে বাংলাদেশে গণমাধ্যমের সংখ্যা অনেক বেড়েছে, সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও,অনলাইন বার্তাসংস্থাসহ সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম অনেক বেড়েছে। কিন্তু গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, বস্তুনিষ্ঠতা, নিরপেক্ষতা ও দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে কাঙ্খিত মান এখনো অর্জিত হয়নি বলে গণমাধ্যম সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনা ও সভা সেমিনারে বিষয়গুলো যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে এসেছে।

৪০ বছরে বাংলাদেশে গণমাধ্যমের অভিজ্ঞতা: একটি সাধারণ সমালোচনা:

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশের সাংবাদিকতাও তিনধাপের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। প্রথম ধাপটি রাজনীতিবিদদের, গণমাধ্যম দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর এজেন্ডা বাস্তবায়ন বা তাদের মতবাদ প্রচার করা। ১৯৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় সরকার আজকের বাংলাদেশ তথা পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সে সময় থেকেই পক্ষপাতমূলক ও সাংবাদিকতা নৈতিকতার প্রশ্নটি চলে আসে। বিশ্বব্যাপী বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সাংবাদিকতার বিদ্যালয়গুলো অবদান রাখে। বর্তমান যুগ হচ্ছে কর্পোরেট নির্ভর সাংবাদিকতা। কি দেশে কি বাইরে এটিই বাস্তবতা। বস্তুনিষ্ঠতা ও ধরনের দিক থেকে তিন ধরনের সাংবাদিকতা লক্ষ্যণীয়।

জাতি হিসেবে বাংলাদেশ ২০১১ এ ৪০ বছরে পা দিলো। সংবাদপত্রশিল্প আসছে বছরে বাংলাদেশ ৫০ বছরের একটি পুরনো জাতি হবে। দৈনিক ইত্তেফাক এবং সংবাদ, দুটি বাংলা দৈনিক পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠিত। এদুটি দৈনিক রাজনৈতিক সংবাদপত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যদিও এগুলো বর্তমানে দ্বিতীয় পর্যায়ের বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার চর্চা করছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে এ দুটি দৈনিক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন জাতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের স্বাক্ষী। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। এছাড়া দু,একটি গণমাধ্যম বাদে বাকী সব গুলো গত ২ যুগে দৃশ্যমান হয়। বলা বাহুল্য সমাজতন্ত্রের পতনের পর বিশ্বব্যাপী মুক্ত বাজার অর্থনীতি গত ২যুগের। যার ফলে পুজিঁবাদী বিশ্বায়নের একটি প্রভাব গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে থেকে যাচ্ছে। অন্যদিকে, পুজিঁবাদী ব্যবস্থার সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে গণমাধ্যমও বিবেচিত হচ্ছে। বিশ্বায়নের প্রভাব বাংলাদেশ তথা বিশ্বের সব গণমাধ্যমের উপরও পড়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পর্যায় **(বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা)** এর দৈর্ঘ্য বাংলাদেশে কম সময়ের। এবং অন্য দেশের তুলনায় একটি লক্ষ্যণীয় পার্থক্য। স্বাধীনতার পর, রাজনৈতিক সাংবাদিকতার সময় শেষ হয়ে আসে। ১৯৮০ এর শেষ পর্যন্ত এ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আজকের কাগজ সে সময়ের স্বনামধন্য বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার উদাহরণ। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার সে শিক্ষা সাংবাদিকতার বিদ্যালয়ে দেয়া হয়,তা আজকের কাগজের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। বস্তুনিষ্ঠ ও নৈতিক সাংবাদিকতায় বাংলাদেশী সংস্কৃতিতে একটি মার্জিত রুপ উপহার দেয়। পরবর্তিতে এ রুপটি ভোরের কাগজে প্রতিফলিত হয়। ১৯৯৮ সালে প্রথম আলো বের হওয়ার পর বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার রুপটি আর পুরোপুরি দৃশ্যমান হয়নি।

কর্পোরেট সাংবাদিকতা শুরু হয় প্রথম আলো পত্রিকার মাধ্যমে যারা ভোরের কাগজের সাংবাদিকদের দিয়ে যাত্রা শুরু করে। মালিকানার ধরণ বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকদের কর্পোরেট সাংবাদিকতার দিকে নিয়ে যায়। এস এম আলী প্রতিষ্ঠিত দেশের স্বনামধন্য ইংরেজি দৈনিক দি ডেইলী স্টার ট্রান্সকম গ্রুপের অধীনে চলে যায়। কয়েক বছরের মধ্যেই প্রথম আলো-ডেইলী স্টার পত্রিকা দুটিই দেশের প্রভাবশালী গণমাধ্যমে পরিণত হয়। এর আগে জনকণ্ঠ এবং মুক্তকণ্ঠ কর্পোরেট সংস্থার অধীনে ছিল। কিন্তু সেগুলো সংবাদপত্রশিল্পে প্রভাবশালী ভূমিকা রাখতে পারেনি। সাম্প্রতিক সময়ে প্রথম আলো-ডেইলী স্টারের ধরণ অন্য সংবাদপত্রগুলো কিছুটা হলেও অনুসরণ করে। প্রশ্ন হচ্ছে ধরণটি কি?

এ প্রশ্নের উত্তরের আগে বাংলাদেশের গত ২ যুগের আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র কিছুটা আলোচনা প্রয়োজন। বিশ্বায়ন এবং মুক্ত বাজার অর্থনীতির পর ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ গণতন্ত্রেও পথে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে নির্বাচন কেন্দ্রিক, অপরিপক্ক গণতন্ত্র কোনভাবেই মুক্তবাজার অর্থনীতির বিপক্ষে অবস্থান নিতে পারছেনা। সাম্রাজ্যবাদী দেশ আমেরিকা অথবা নাফটার (নর্থ আটলান্টিক ট্রিয়েটি অর্গানাইজেশন) প্রভাবে সংসদীয় গণতন্ত্র মুক্তবাজার অর্থনীতিকে স্বাগত জানায়। বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাংলাদেশ ছিল গ্রহীতা দেশের তালিকার শেষদিকে। তৃতীয় বিশ্বের দেশ বাংলাদেশ বিশ্বায়নের বাজারে পরিণত হয় পুজিবাদী দেশের প্রভাবে। ১৯৯০ সালে সস্তা শ্রমমূল্যে ও টেলিযোগাযোগ খাতে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ হওয়ায় একটি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে যারা শুধু বিদেশী পণ্য আমদানি করে। এ তিনটি সেক্টরই গতিশীল কর্পোরেট শ্রেণীর সদস্য। ১৬ কোটি জনসংখ্যার এ দেশ একটি বড় আকর্ষনীয় বাজারে পরিণত হয়। ব্যবসায়ীদের দৃষ্টিতে একটি ভোক্তা শ্রেণী তৈরি তাদের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার জরুরী বিষয় ছিল। ভোক্তা শ্রেণী তৈরিতে গণমাধ্যমে নেমে পড়ে ব্যবসায়ীরা।

ট্রান্সকম গ্রুপের এ দুটি পত্রিকা ১৯৯০ সাল থেকে তাদের প্রধান দায়িত্বের সঙ্গে আরেকটি যুক্ত হয়, তা হচ্ছে মালিকপক্ষের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখা। বিজ্ঞাপনে সংলাপ করে দেয়া, ব্যক্তিগত বা ব্যবসার ক্ষেত্রে তাদের প্রধান্য দেয়া। কর্পোরেট কোম্পানীগুলোর সংবাদ পরিবেশন, সংবাদকে উপেক্ষা করে পণ্যের গুণাগুণ প্রচার করা, পণ্য কেনার অভ্যাস তৈরি করা। ব্যবসা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বাধা হয়, এমন রাজনৈতিক কর্মসুচির বিরুদ্ধে তারা জনমত গড়ে তোলেন। এজন্য তারা সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন যারা সবসময় গণতন্ত্র ও সুশাসন এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিয়ে কথা বলেন । এজন্য কিছু গনমাধ্যম ২০০৭-২০০৮ সালের সামরিক বাহিনীর সমর্থনে থাকা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও সমর্থন করেন। সব সংস্থাকে রাজনীতিমুক্ত করে একট নির্ঝঞ্জাট ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরি করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। প্রথম যুগের চ্যানেল একুশে টেলিভিশন আজকের সংবাদ ও অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এখনো অনুসরণীয়। বিশেষ করে সংবাদ উপস্থাপনা, অনুষ্ঠান পরিকল্পনা, ও গ্রাফিক্সের ব্যবহার অর্থপূর্ণ। বর্তমানে ২৬টির বেশি চ্যানেল প্রচারিত হচ্ছে। এটিএন বাংলা, চ্যানেল আই, এনটিভি, বাংলাভিশনসহ বেশিরভাগ চ্যানেলই কর্পোরেট সাংবাদিকতা করছেন। প্রতিযোগিতামূলক বাজার নিজেদের দখলে রাখতে তারা তাদের সংবাদের সময় বিক্রি করে দিচ্ছে সস্তায়। সরকার নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যম নিজেদের দখলে রাখায় গত এক যুগে মধ্যবিত্ত জনগণের মধ্যে সংবাদের ক্ষুধা তৈরি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রিন্ট মিডিয়াকে মুক্ত করে দিলে ও সম্প্রচার মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করতে ইতোপূর্বে ইটিভি, সিএসবি, চ্যানের ওয়ান, আমার দেশ সর্বশেষ দিগন্ত ও ইসলামিক টিভি রাজনৈতিক বিবেচনায় বন্ধ করে দেয় সরকার। সহস্রাব্দের প্রথম যুগে এফ এম চ্যানেল একটি নতুন ধারা সংযোজন করে। বর্তমানে বেশ কটি এফএম রেডিও সংবাদ ও মিউজিক সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান পরিচালনা করছে। এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে কিশোর ও তরুণ প্রজন্ম। ইংরেজি প্রভাবিত উচ্চারণে বাংলা সংবাদ পরিবেশন করছে রেডিওগুলো। ঘন্টায় ঘন্টায় সংবাদ, ট্রাফিক আপডেট, পরিবেশন করছে। কর্পোরেট প্রবণতার কারণে কম্যুউনিটি রেডিও চালু হচ্ছে। স্থানীয় উন্নয়নের সংবাদ এনজি্ওর সংস্থাকে দেয়া লাইসন্সের আওতায় কম্যুউনিটি রেডিও পরিচালিত হচ্ছে। তথ্য পাওয়ার অধিকার সহস্রাব্দের প্রথম যুগের এনজিওদের উদ্যোগে এবং প্রদান সংবাদপত্রগুলোর সহায়তায় পাওয়া। ভারতে জনগণের দাবির প্রেক্ষিতে এটা হলেও বাংলাদেশে বিদেশী দাতা সংস্থার দেয়া অর্থে পরিচালিত এনজিওর এজেন্ডা বাস্তবায়নে এ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়িত হয়েছে *(হক ফাহমিদুল; অসম্মতি উৎপাদন)*

বর্তমানে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ্যনীয়। অন্যান্য দেশে যেখানে সংবাদপত্র বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেখানে বাংলাদেশে নিত্য নতুন সংবাদপত্র প্রকাশনায় আসছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিস্তৃতি ঘটলেও উন্নত দেশের চেয়ে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা কম। ফলে নতুন নতুন সংবাদপত্র এলেও তা আর্থ-সামাজিক অবস্থা সংহত করার কাজে আসছে। যার ফলে শুধু টেলিভিশন অথবা এফ এম নয়, প্রিন্ট মিডিয়া এখানে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ ঘটছে। এখানে বলা বাহুল্য যে, বাংলাদেশে প্রিন্ট মিডিয়া এখনো অনেক বেশি প্রভাবশালী।

আগামী এক দশকের মধ্যেই বাংলাদেশ তার জন্মের অর্ধশতক পূর্ণ করবে। এক থেকে দেড় দশকের মধ্যে গণমাধ্যম খাতে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। তবে কি পরিবর্তন আসবে সেটা বলা কিছুটা কঠিন। নতুন কিছু টেলিভিশন চ্যানেল আসবে। ফলে কিছু চ্যানেল আসতে পারবে না অথবা কিছু চ্যানেল তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে নিবে। আরো কিছু এফএম রেডিও আসবে, নতুন কিছু সংবাদপত্র হয়তো চালু হবে কিন্তু বিজ্ঞাপনের বাজার সহযোগিতা করতে না পারায় গনমাধ্যমের বিকাশ বন্ধ হয়ে যাবে। প্রধান ধারার ঐতিহ্যবাহী গনমাধ্যমগুলো নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। অনেক বেশি লোক ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত হবে। দশ লাখের মতো লোক এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সক্রিয়। গত ৫ বছরে ২ লাখ লোক ব্লগের সাথে যুক্ত। আগামী দিনগুলোতে এ সাইবার কম্যুউনিটি নাগরিক সংবাদিকতায় ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। ঐতিহ্যগত গণমাধ্যম গুলো ইন্টারনেটে তাদের অবস্থান ধরে রাখতে চাইবে। পেশাগত ও অপেশাদার সাংবাদিকদের মধ্যে দ্বান্দ্বিক একটা অবস্থা তৈরি হবে এমনটা বলাই যায়।(হক,অসম্মতি উতপাদন)

নীচে গণমাধ্যমে প্রকাশিত বেশ কিছু সংবাদের নমুনা দেয়া হলো:

কুষ্টিয়ায় জনসভায় প্রধানমন্ত্রী; বিএনপি এলে জঙ্গী দুর্নীতি ফিরবে

(প্রথম আলো: অক্টোবর ০৬, ২০১৩)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে আবারও আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, বিএনপি যদি ক্ষমতায় আসে, তাহলে দেশে আবার সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও দুর্নীতি ফিরে আসবে। গতকাল শনিবার বিকেলে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ মাঠে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশ আবার জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও দুর্নীতিগ্রস্ত দেশে পরিণত হবে এবং সব উন্নয়নকাজ বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, 'বিএনপি নেত্রী মিথ্যা বলায় পারদর্শী, যাকে বলে মিথ্যা বলায় ওস্তাদ।' কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগ এ জনসভার আয়োজন করে। জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি

জুলফিকার আলীর সভাপতিত্বে জনসভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনি, তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক, আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ, খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বি এম মোজাম্মেল হক প্রমুখ। প্রধানমন্ত্রীর ১৮ মিনিটের বক্তৃতায় বেশির ভাগ জুড়েই ছিল বিরোধীদলীয় নেত্রী ও বিএনপি-জামায়াতের সমালোচনা। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে সন্ত্রাসের রাজত্ব কুষ্টিয়ায় মানুষ শান্তিতে বসবাস করছে। (সংক্ষিপ্ত)

ব্যাখ্যাঃ কুস্টিয়ার কিছু উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ২০১৩ সালের ৬ অক্টোবর তার বক্তৃতায় এসব কথা বলেছেন। এটি তার রাজনৈতিক বক্তৃতা।

দেশে নতুন জঙ্গী সংগঠন গজাচ্ছেঃ সুরঞ্জিতঃ

(সুনামগঞ্জ, ১৭ আগস্ট; ২০১৩)

বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ নিয়ে গত একযুগ ধরে রাজনীতি চলছে । প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের জঙ্গীবাদ বিরোধী প্রমাণে মরিয়া হয়ে উঠেছে । বিশেষ করে নির্বাচনের প্রাক্কালে এ ইস্যুটি অন্যতম একটি বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

দপ্তরবিহীন মন্ত্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেছেন, আল কায়েদা, জেএমবি বা আন্তর্জাতিক কোন জঙ্গী সংস্থা নয় বাংলাদেশে এখন নতুন করে জঙ্গী সংগঠন গজাচ্ছে। তারা তাকে সাবেক ও বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে। বিএনপি তথা ১৮দলীয় জোটের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, নতুন এই জঙ্গী সংগঠনকে আগে যারা দাঁড়াতে সাহায্য করেছিল এখনো তারা সাহায্য করে যাচ্ছে। শনিবার দুপুরে সুনামগেঞ্জর দিরাই উপজেলা শহরে দিরাই উচ্চ বিদ্যালয়ের নব নির্মিত একটি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ব্যাখ্যা: দপ্তরবিহীন মন্ত্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত দেশে নতুন জঙ্গী সংগঠন গজিয়ে উঠছে বলে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। তিনি জঙ্গী সংগঠন গজিয়ে উঠার পেছনে বিএনপি জামায়াতকে দায়ী করেন। এটি একটি রাজনৈতিক বক্তৃতা।

জঙ্গী তৎপরতা বেড়েছে : প্রতিমন্ত্রী:

(বিবিসি বাংলা, ২০১৩; ২৪ মে)

বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে জঙ্গী তৎপরতা বেড়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক টুকু । তিনি বলেন যে বিরোধীদলের ডাকা হরতালকে সামনে রেখে জঙ্গী কার্যক্রম বাড়ছে।

রাজধানী ঢাকার জুরাইনে পুলিশের ওপর বোমা হামলার ঘটনা তুলে ধরে তিনি সোমবার বলেছেন যে এসব ঘটনা থেকে জঙ্গী গোষ্ঠীগুলোর তৎপরতা জোরদার করার আলামত দেখা যাচ্ছে। ঢাকার জুরাইন এলাকায় সন্দেহভাজন জঙ্গীদের একটি আস্তানায় অভিযান চালানোর সময় রোববার রাতে পুলিশের সাতজন সদস্য আহত হন। সোমবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পুলিশের ঐ সদস্যদের দেখতে গিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্র প্রতি মন্ত্রী শামসুল হক টুকু । সে সময় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন, দেশে জঙ্গী তৎপরতা বাড়ছে । সেজন্য তিনি মূলত বিরোধী দলের ডাকা হরতাল বা রাজনৈতিক কর্মসূচিকে কারন হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক পরিবেশ অস্থিতিশীল করতে জঙ্গীদের ব্যবহার করার একটা চেষ্টা থাকে। এছাড়া জঙ্গীদের পুরোপুরি নির্মুল করা যায়নি বলেও তিনি মন্তব্য করেন। তবে জঙ্গি তৎপরতার বিষয়ে গবেষনা করেন, তাদের অনেকেই মনে করেন, দেশে জঙ্গী তৎপরতা বাড়ছে । কিন্তু সেজন্য হরতাল বা অভ্যন্তরীন রাজনৈতিক কোন কর্মসূচিকে তারা কারন হিসেবে মানতে রাজি নন। অন্যতম একজন গবেষক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মনিরুজ্জামান বলেছেন, আঞ্চলিক ভিত্তিতে জঙ্গীদের নেটওয়ার্ক বা যোগাযোগ তৈরির সুযোগ পাওয়ার কারনে বাংলাদেশে জঙ্গী তৎপরতা বাড়ছে। তার মতে, ভারত এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন জঙ্গী সংগঠনের সাথে বাংলাদেশের জঙ্গীদের যোগাযোগ বাড়ছে বা নেটওয়ার্ক তৈরি হচ্ছে।

ব্যাখ্যা : এ সংবাদটি ২৪ মে বিবিসি বাংলায় প্রচারিত হয়। মূলত: দেশে জঙ্গীবাদ বেড়েছে স্বরাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রীর এমন মন্তব্য কে ঘিরে বিবিসি সংবাদটি উপস্থাপন করে। সেখানে তিনি হরতাল ও অবরোধকে জঙ্গীবাদের কারণ বলেছেন। যদিও বিবিসি তার করা মন্তব্যকে আমলে নিয়ে নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মনিরুজ্জামানের মতামতও এখানে তুলে ধরেছে। সংবাদটি শুরুর দিকে প্রচার করায় এর শ্রোতাও বেড়েছে। তবে জঙ্গীবাদ বৃদ্ধির কথা বললেও জেনারেল মুনির রাজনৈতিক কর্মসূচিকে এজন্য দায়ী করেননি।

আওয়ামীলীগের আমলেই জঙ্গীবাদের উত্থান হয়েছে: মির্জা ফখরুল:

(আমাদের সময়, ১ সেপ্টেম্বর; ২০১৩)

বিএনপি ক্ষমতায় এলে আবার জঙ্গীবাদের উত্থান হবে' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এমন বক্তব্যের জবাবে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, বিএনপি কখনোই জঙ্গীবাদে বিশ্বাসী নয়। আওয়ামী লীগ আমলেই প্রথম জঙ্গীবাদের উত্থান হয়েছিল। গতকাল শনিবার বিকেলে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে দলের ৩৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় সভাপতির ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন। বিএনপি মহাসচিব বলেন, যশোরের উদীচী, রমনা বটমূল, কুষ্টিয়া এবং গোপালগঞ্জের কোটালী পাড়ায় ৭০ কেজি ওজনের বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল আওয়ামী লীগের আমলেই। এসব ঘটনা বিএনপির আমলে ঘটেনি। বিএনপি সব সময়ই জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে ছিলো, আছে এবং থাকবে। আওয়ামী লীগ সবসময় 'উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপাতে চায়। আওয়ামী লীগই বরাবরই জঙ্গীবাদের ধারা অব্যাহত রেখেছে। প্রধানমন্ত্রী পুত্র জয়ই জঙ্গীবাদের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি সেই প্রবন্ধে বলেছেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ৩৫ ভাগ জঙ্গীবাদ রয়েছে (১ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ দৈনিক করতোয়া)।

ব্যাখ্যা: এ সংবাদটি ১লা সেপ্টেম্বর সবগুলো জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে।এ সংবাদটি আওয়ামীলীগের শীর্ষ নেতারা বিএনপিকে জঙ্গীবাদের পৃষ্ঠপোষক বলায় এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ মন্তব্য করেন।

দমন-পীড়নের শিকার হচ্ছে বাংলাদেশের মিডিয়া:

(বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর.কম ২৮ মে, ২০১৩)

সরকার দু'টি টেলিভিশন স্টেশন বন্ধ করে দিয়েছে। দৃশ্যত গণমাধ্যমের ওপর কড়াকড়ি আরোপের জন্যই সাংবাদিকদের আটক করা হয়েছে। ২৮শে মে অনলাইন আল জাজিরা একথা বলেছে।

'বাংলাদেশ মিডিয়া সাফারস *ক্র্যাকডাউন*' শীর্ষক প্রতিবেদনে এসব কথা বলা হয়। এর সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া হয় ২ মিনিট ৩৯ সেকেন্ডের একটি ভিডিও। তাতে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সহিংসতা ও গণমাধ্যমের অবস্থা তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়েছে, দেশে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা সরকারের হুমকির মুখে রয়েছে। বাংলাদেশের সাংবাদিকরা এমনটি বলছেন। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বন্ধ করে দিয়েছে দু'টি টেলিভিশন চ্যানেল। দৃশ্যত মিডিয়ার ওপর কড়াকড়ি আরোপের জন্য গত দু'-এক মাস ধরে প্রথম সারির একটি সংবাদপত্রের সম্পাদককে সরকার আটক করে রেখেছে।

বিরোধীরা বলছে, আগামী বছরের শুরুর দিকে জাতীয় নির্বাচন। সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে এটি সরকারের রাজনৈতিক খেলা। কিন্তু সরকার বলছে, কয়েক মাস ধরে চলা সহিংস প্রতিবাদের কারণে এ ব্যবস্থা নেয়া জরুরি ছিল। বাংলাদেশ থেকে জোনা হল এ বিষয়ে যে ভিডিও রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে বলা হয়, এ মাসের শুরুর দিকে রক্ষণশীল ইসলামী গোষ্ঠীর প্রতিবাদ বিক্ষোভের সরাসরি সমপ্রচার করায় সরকার বাংলাদেশের দুটি জনপ্রিয় চ্যানেল দিগন্ত ও ইসলামী টেলিভিশন বন্ধ করে দিয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় বিরোধী মতাবলম্বী দৈনিক আমার দেশ। এর সম্পাদককে নেয়া হয়েছে জেলে। জোনা হল ডেইলি স্টার পত্রিকা অফিসে গিয়ে রিপোর্ট করেন। বলেন, আমি এখন সুপরিচিত ডেইলি স্টার পত্রিকা অফিসে।

বাংলাদেশের প্রায় ৩০টি ব্রডশিট পত্রিকার মধ্যে এটি একটি। কিন্তু এখানে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যতই সহিংস হয়ে উঠছে ততই এখানকার প্রিন্ট, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, মিডিয়ার স্বাধীনতা সংকুচিত করা হচ্ছে। এ বিষয়ে সাংবাদিক মাহফুজ আনাম বলেন, সমস্যা হলো আমাদের দু'টি বড় রাজনৈতিক দল। প্রায় ২২টি বছর তারাই এ দেশকে পর্যায়ক্রমে শাসন করছে। গণতান্ত্রিক উপায়ে তারা নির্বাচিত হন। একবার যখন নির্বাচিত হন তখন তাদের আচরণ বদলে যায়। তারা কর্তৃত্ববাদী আচরণ করেন। এ প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেন, এখানে মিডিয়া মুক্ত। তারা স্বাধীনতা ভোগ করছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেছে বাংলাদেশে।

জঙ্গীবাদ নির্মূলে গণমাধ্যমঃ ২০০৯ সালের ৩০ মার্চ, দেশের প্রধান অর্থনীতি বিষয়ক ইংরেজি দৈনিক 'দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস' এ শামসুল হক জাহিদ লিখেছেন, জঙ্গীবাদ নিয়ে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে নিয়মিত জঙ্গীবাদ সংক্রান্ত রিপোর্ট, টকশো, জঙ্গীবাদে অর্থায়ন এবং বহি:শত্রুর সাথে যোগাযোগ বিষয়ে লিখতে হবে। সরকার ও সুশীল সমাজকে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, দেশের নিরাপত্তা এবং ষড়যন্ত্র বিষয়ে নিয়মিত টকশো করতে হবে। স্থানীয় জঙ্গীগোষ্ঠী এবং আন্তর্জাতিক জঙ্গীগোষ্ঠীর মধ্যে আল কায়েদার সাথে যোগাযোগের বিষয়টি এখনো অনুসন্ধানের পর্যায়ে রয়েছে। ধর্মীয় জঙ্গীবাদ সাম্প্রতিক সময়গুলোতে বেড়েছে। রমনা বটমূল, উদীচি, একুশে আগস্ট ও ১৭ আগস্টের সিরিজ বোমা হামলার ঘটনায় দেশের সচেতন মানুষ উদ্বিগ্ন।

র‍্যাব জঙ্গীসংশ্লিষ্ট অনেককে আটক করছে। ইরাক, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের জঙ্গীদের মতো বাংলাদেশের জঙ্গীরা এখন আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছে।ব্যবসায়ী নেতাদের গণমাধ্যমে এসে বলতে হবে, জঙ্গীবাদ দেশের অর্থনীতিতে কি ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বিদেশী বিনিয়োগ, বাণিজ্য বৃদ্ধি, বৈদেশিক সাহায্য, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও অর্থনীতির জন্য হুমকির বিষয় নিয়ে তাদের কথা বলতে হবে।

জঙ্গীবাদ নিয়ে লুকোচুরি খেলার কিছু নেই। উদার মুসলিম প্রধান দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করা সবার কর্তব্য। একটি গোষ্ঠী এবং গণমাধ্যম বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশকে ইসলামী মৌলবাদ বা ব্যর্থ রাষ্ট্র প্রমাণে তারা সক্রিয় রয়েছে। বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ বা জঙ্গী প্রবণতা আছে, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শুধুমাত্র নেতিবাচক ধারণা ছাড়া বাংলাদেশে কোন সরকারই মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি যথাযথ দৃষ্টিপাত করেনি। মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান, এবং কম্পিউটার শিক্ষা প্রবর্তন করা জরুরি বলে মনে করেন তিনি।

তার মতে, ধর্মীয় নেতা হলে গেলে তাকে বাস্তব জ্ঞান সম্মত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। জঙ্গীবাদের মূল কারণগুলো চিহ্নিত করে সরকারকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ সবার মানসিকতার মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে। সবাইকে জঙ্গীবাদের কুফল সম্পর্কে বোঝাতে হবে। ধর্মীয়শিক্ষায় শিক্ষিতরাও এদেশের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ, এ সত্যটি তাদের উপলব্ধি করাতে হবে *(জাহিদ, শামসুল:২০০৯)*।

ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির ঐক্য দরকার:

(প্রথমআলো, ০৫ অক্টোবর; ২০১৩)

শুধু বাংলাদেশে নয়, পুরো দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিটি দেশে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার বাড়ছে। এই ব্যবহার কেবল সাম্প্রদায়িকতাকে উসকেই দিচ্ছে না, বাধাগ্রস্ত করছে অগ্রগতিকে।

গতকাল শুক্রবার সকালে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে "ধর্ম ও রাজনীতি: দক্ষিণ এশিয়া" শীর্ষক আন্তর্জাতিক গণবক্তৃতা ও সম্মেলনে উপমহাদেশের বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ, রাজনীতিক ও মানবাধিকারকর্মীরা এসব কথা বলেন। ধর্মীয় উগ্রবাদ রুখতে দেশগুলোর ভেতর কেবল অসাম্প্রদায়িক শক্তির একতা নয়, আন্ত:দেশীয় ঐক্যেরও তাগিদ দেন তারা। বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলনের আয়োজন করে।

দিনের প্রতিটি অধিবেশনে বক্তারা এই উপমহাদেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বহুত্ববাদী সংস্কৃতি ধরে রাখতে উগ্র ধর্মান্ধ শক্তিকে রুখে দেয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। উদ্বোধনী অধিবেশনে মূল আলোচক দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ইতিহাসবিদ মশিরুল হাসান বলেন, এই বহুত্ববাদী সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো বিকল্প নেই। তিনি বলেন, ভারত ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান প্রণয়ন করেছে, কিন্তু সমাজ এখনো ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি। তিনি আরও বলেন, সাম্প্রদায়িক শক্তি অনেক ক্ষেত্রে সেখানে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাও পাচ্ছে।
ধর্মীয় উগ্রবাদিতার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার কারণ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, রাষ্ট্র অসাম্য বজায় রাখতে চায় বলেই এখানে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়। দিনের একটি অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা গরীব মানুষের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র। এ দেশের ধনীরা সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন না করে মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এই বিনিয়োগ সস্তা ও জনপ্রিয়। তবে ধনীরা নিজের সন্তানদের শিক্ষা দেন আধুনিক শিক্ষাকেন্দ্রে ..(সংক্ষিপ্ত) ।

ব্যাখ্যাঃ সম্প্রতি ঢাকার সিরডাপে দু'দিনব্যাপী ইতিহাসে সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।এতে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীগণ উপস্থিত ছিলেন। এতে ধর্মীয় উগ্রতা প্রতিরোধে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গঠনের পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। দৈনিক প্রথম আলো শিরোনাম করেছে, ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির ঐক্য দরকার পত্রিকাটি প্রথম পৃষ্ঠায় এ সংবাদটি গুরুত্ব সহকারে স্থান দিয়েছে।

জঙ্গীবাদ দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতির অন্যতম সমস্যাঃ

(যুগান্তর, ০৫ অক্টোবর; ২০১৩)

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, ধর্মীয় উগ্রবাদ, সাম্প্রদায়িকতা এবং জঙ্গীবাদ দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতির অন্যতম সমস্যা। ধর্মীয় উগ্রবাদ দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিকে কব্জা করে ফেলেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর দু'বার চারদলীয় জোটের নামে বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় এসে ধর্মীয় মৌলবাদ তথা বাংলা ভাই এবং জেএমবির মতো সন্ত্রাসী বাহিনী গঠন করে দেশকে সন্ত্রাসের দিকে ধাবিত করে, সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দেয়। এরই জের ধরে রামুর বৌদ্ধমন্দিরে হামলাসহ সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়ন হয়েছে। একটি অসাম্প্রদায়িক শান্তিপূর্ণ দক্ষিণ এশিয়া গড়তে সব ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, এই যুদ্ধে জয়ের কোনো বিকল্প নেই। শুক্রবার সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত"ধর্ম ও রাজনীতি : দক্ষিণ এশিয়া শীর্ষক" এক আন্তর্জাতিক গণবক্তৃতা ও সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী নামে একটি সংস্থা দুদিনব্যাপী এই সম্মেলনের আয়োজন করে (সংক্ষিপ্ত) ।

ব্যাখ্যাঃ ইতিহাস সম্মিলনীর সংবাদটি দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে। তারা শিরোনাম করেছে, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রধান সমস্যা জঙ্গীবাদ। তবে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য দিয়ে সংবাদের শিরোনাম না করে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের দিয়ে করলে আরো ভালো হতো।

ধর্মীয় উগ্রবাদ বাধাগ্রস্ত করছে অগ্রগতিকেঃ

(সমকাল, ০৫ অক্টোবর; ২০১৩)

ধর্মীয় উগ্রবাদ শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় নয়, সমগ্র বিশ্বের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এখানে বহু মত ও ধর্মের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করেছে। আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য হলো ধর্মীয় সহাবস্থান। ধর্মের নামে যারা উগ্রবাদী রাজনীতি করে জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করে। তাই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হলে অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে সমুন্নত রাখতে হবে। গতকাল রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে 'ধর্ম ও রাজনীতি: দক্ষিণ এশিয়া আন্তর্জাতিক গণবক্তৃতা ও সম্মিলন' শীর্ষক দু'দিনব্যাপী সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তারা এসব কথা বলেন.....(সংক্ষিপ্ত) ।

ব্যাখ্যা : ইতিহাস সম্মিলনীর সংবাদটি দৈনিক সমকাল পত্রিকায় শিরোনাম করেছে, ধর্মীয় উগ্রবাদ বাধাগ্রস্ত করছে অগ্রগতিকে। হাজার বছরের ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি উগ্রবাদিতার কারণে ধর্মীয় সহাবস্থান ও সংহতি বিনষ্ট হচ্ছে। দেশকে এগিয়ে নিতে অসাম্প্রদায়িক চেতনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দক্ষিণএশিয়ায় ধর্মীয় উগ্রতার উদ্ভব:

আন্তর্জাতিক সম্মিলনে দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া ভার্সিটির ভিসি
(ইত্তেফাক, ০৫ অক্টোবর; ২০১৩)

ধর্ম ও রাজনীতি: দক্ষিণ এশিয়া' শীর্ষক আন্তর্জাতিক গণবক্তৃতা ও সম্মিলনে দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ইতিহাসবিদ মশিউল হাসান বলেছেন, ভারত ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান প্রণয়ন করেছে, কিন্তু সমাজ এখনো ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি। তিনি বলেন, পুরো দক্ষিণ এশিয়ায় ধর্মীয় উগ্রতার উদ্ভব ঘটেছে এবং অনেক জায়গায় সেটি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাও পাচ্ছে। গতকাল শুক্রবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলনে মূল প্রবন্ধে তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী এই সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনীর আহ্বায়ক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন। .....(সংক্ষিপ্ত)।

ব্যাখ্যা : ৫ অক্টোবর এ রিপোর্টটি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়। এখানে ইত্তেফাক জঙ্গীবাদ বৃদ্ধির কারণ হিসেবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়টি শিরোনামে এনেছে। প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হলেও জঙ্গীবাদ বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রের নিশ্চুপ থাকা বা কোন ব্যবস্থা গ্রহন না করাকেই পৃষ্ঠপোষকতার হিসেবে বলা হয়েছে।

উপরে স্থান পাওয়া সংবাদটি দেশের চারটি প্রধান জাতীয় দৈনিকের একই দিনে প্রকাশিত। প্রথমআলো ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা শিরোনামে এনেছে। যুগান্তর জঙ্গীবাদ দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা বলে শিরোনামে উল্লেখ করেছে। সমকাল উন্নয়নে বাধার ক্ষেত্রে ধর্মীয় উগ্রবাদকে তুলে ধরেছে। আবার ইত্তেফাক জঙ্গীবাদ বিস্তারে দক্ষিণ এশিয়ায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার কথা উল্লেখ করেছে। মূলত: সবগুলো বিষয়ই ঐ সম্মেলনে আলোচকরা তুলে ধরেছেন। একেকটি পত্রিকা তাদের সম্পাদকীয় বিষয় মাথায় রেখে সংবাদপত্রের গুরুত্ব নির্ধারণ ও সে অনুযায়ী স্থান দিয়েছে। এক্ষেত্রে সংবাদটিকে সব সংবাদপত্র প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান দিয়েছে ,কিন্তু গুরুত্ব নির্ধারণে বা শিরোনামে আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিলে ভালো হতো।

বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ উত্থানের আশঙ্কায় উদ্বেগ জাতিসংঘেরঃ

(বাংলানিউজটোয়েন্টিফোরডটকম, ৩০আগষ্ট; ২০১৩)

বাংলাদেশে ধর্মীয় উগ্রবাদ, জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের উত্থানের আশংকায় উদ্বিগ্ন জাতিসংঘ। জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে চলমান রাজনৈতিক সঙ্কটের সুযোগে এর উত্থান ঘটছে বলেই মনে করছে সংস্থাটি। আর এরই মধ্যে বিষয়টিতে গভীর উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন সংস্থাটির মহাসচিব বান কি মুন। সূত্র জানিয়েছে, উদ্বেগের পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের ও বিরোধী দলের যে যার পক্ষে কঠোর অবস্থান নেওয়ায় বেশ উষ্মাও প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘ মহাসচিব। বাংলাদেশের দুই শীর্ষ নেত্রীর সঙ্গে সাম্প্রতিক টেলিফোনালাপের আগে জাতিসংঘে স্থায়ী প্রতিনিধি ড. একে আবদুল মোমেনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই তিনি এ উদ্বেগ ও উষ্মা প্রকাশ করেন বলে সূত্রটি জানিয়েছে। সূত্রমতে, ওই সময় বান কি মুন রাষ্ট্রদূতকে বলেন, আপনার প্রধানমন্ত্রী ড. ইউনূসের বিষয়টিই সমাধান করতে পারছেন না, কিভাবে তিনি হেফাজত ও আল-কায়দা জঙ্গীদের সামলাবেন। (ইওর প্রাইম মিনিস্টার ক্যান নট হ্যান্ডেল ওয়ান ড. ইউনুস ইস্যু, হাউ শি উইল হ্যান্ডেল হেফাজত এন্ড আল কায়েদা?) সূত্রটি আরো জানায়, রাত চারটায় ড. মোমেনকে ঘুম থেকে তুলে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তিনি তার ব্যবস্থা করেন।

পরে শেখ হাসিনার সঙ্গে টেলিফোনে কথোপকথনে জাতিসংঘ মহাসচিব বাংলাদেশে হেফাজত আর আলকায়েদার উত্থানের আশংকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশে প্রধান দুই দলের মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সুযোগ নিয়েই জঙ্গীবাদ মাথাচাড়া দিচ্ছে। এটা গোটা দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে, যার প্রভাব যুক্তরাষ্ট্রের উপর পড়বে । ফলে যুক্তরাষ্ট্র স্বাভাবিক ভাবেই উদ্বিগ্ন। সূত্র জানায়, বান কি মুন প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন, "আই এম কনসার্নড, হাইলি কনসার্নড"। তবে জঙ্গীবাদ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি বাংলাদেশে চলমান রাজনৈতিক সঙ্কট নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন জাতিসংঘ মহাসচিব।

ব্যাখ্যা : বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে জঙ্গীবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে বলে মন্তব্য করে এজন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন।রিপোর্টটি অনলাইন বার্তা সংস্থা বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোরডটকমে প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি জাতিসংঘে বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি ড. এম এ মোমেনকে টেলিফোনে তার উদ্বেগের কথা জানান জাতিসংঘ মহাসচিব।

Bangladesh: Political Consensus A Must To Combat Militancy:

(ডেইলি স্টার, ৯ এপ্রিল: ২০০৯)

Information minister calls for coordination with media on terrorism, says media has given terrorism undue publicity.

Cooperation between the government and the opposition and coordination with the mass media are vital to combat militancy in the country, speakers at a dialogue said yesterday.

They also called for a cautious role on the part of the media covering militancy and terrorism issues.

The speakers also urged the government to allow intelligence agencies to function independently within their respective ambit, instead of using them for political gains..... (সংক্ষিপ্ত)

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট আয়োজিত অনুষ্ঠানে জঙ্গীবাদ নির্মূলে সরকারী ও বিরোধী দলের সাথে গণমাধ্যমের সম্পৃক্ততা বাড়িয়ে জঙ্গীবাদ নির্মূলের কথা বলেছেন আলোচকরা। জাতীয় নিরাপত্তার জন্য জঙ্গীবাদকে হুমকি হিসেবে উল্লেখ করে এটা প্রতিরোধে জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে তা নির্মূল করা জরুরি বলে মত দিয়েছেন আলোচকরা। দেশের অন্যতম প্রধান ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টারে এ রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে ২০০৯ সালের এপ্রিলের ৯ তারিখ।পত্রিকাটি এ সংবাদটি গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করেছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে গোয়েন্দা সংস্থাকে ব্যবহার না করে তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

সশস্ত্র নারী জঙ্গীদের নিয়ে সংগঠিত হচ্ছে নিষিদ্ধ জঙ্গী সংগঠন:

(অপরাজিতা, ২৮ মে; ২০১৩)

বড় ধরনের নাশকতার চেষ্টায় নতুন করে সংগঠিত হতে শুরু করেছে ঝিমিয়ে পড়া নিষিদ্ধ জঙ্গী সংগঠনগুলোর সদস্যরা। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে অতি গোপনে তারা চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার কওমি মাদ্রাসায় বৈঠক করছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই জঙ্গীরা রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় আবার

Dhaka University Institutional Repository

নাশকতা চালাতে পারে। নতুন কৌশল হিসেবে এসব অভিযানে কাজে লাগানো হতে পারে নারী জঙ্গীদের। বেশির ভাগই কওমি মাদ্রাসার ছাত্রী ও শিক্ষক বলে জানিয়েছেন একাধিক গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য।

সূত্রে জানা গেছে, ৫ মে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে সংঘটিত 'অপারেশন সিকিউর শাপলা' য় অসংখ্য নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়েছে এমন গুজব ছড়িয়ে মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকদের তাদের দলে ভেড়ানোর পাঁয়তারা করছেন জঙ্গীদের মদদদাতা কয়েকটি উগ্রপন্থি ইসলামী দলের শীর্ষ নেতারা। ইতোমধ্যে তারা দেশের বিভিন্ন কওমি মাদ্রাসায় গিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়া জঙ্গী সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছেন। সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে তারা এসব জঙ্গীকে মোটা অংকের আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস দিচ্ছেন।

উগ্রপন্থি এসব রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে পলাতক শীর্ষ জঙ্গী নেতাদের। তবে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন কওমি মাদ্রাসায় পরীক্ষা চলার কারণে কিছুটা স্তিমিত হয়ে আছে জঙ্গীদের কার্যক্রম। র‍্যাবের গোয়েন্দা শাখার পরিচালক লে. কর্নেল জিয়াউল আহসান জানান, ৫ মের অভিযান নিয়ে যদি হেফাজতে ইসলাম বিভ্রান্তি ছড়িয়ে আবারও কোনো ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করে তখন চূড়ান্ত মাত্রায় কঠোর হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। তবে জামায়াতসহ আরও কয়েকটি উগ্রপন্থি ইসলামী দল আবারও হেফাজতে ইসলামকে ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার করার পাঁয়তারা করছে। এ সব কিছু মাথায় নিয়েই র‍্যাব সদস্যরা মাঠে কাজ করছেন।

একটি গোয়েন্দা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে মুফতি শফিকুর রহমানকে আমির করে গঠিত পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট হুজির কমিটিতে হেফাজতে ইসলামের বর্তমান আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফীর নামও ছিল। পরবর্তীতে মাওলানা মহিউদ্দীনের জমিয়তে ওলামা ইসলাম, প্রয়াত মুফতি ফজলুল হক আমিনীর ইসলামী ঐক্যজোট, মুফতি শহিদুল ইসলামের মার্কাজুল ইসলাম হুজিকে সমর্থন জানায়।

দাওয়াতি কাজের মাধ্যমে সমর্থকের সংখ্যা বাড়িয়ে তা নির্বাচনের কাজে লাগিয়ে পরবর্তীতে তারা ক্ষমতায় যেতে আগ্রহী। আফগানফেরত যোদ্ধাদের অভিজ্ঞতা তারা এসব ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে চায়। পরবর্তীতে জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি), শাহাদাত-ই-আল হিকমা গঠিত হওয়ার পরও ওই রাজনৈতিক দলগুলো সমর্থন দিয়েছিল। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি গোয়েন্দা সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, পলাতক হরকাতুল জিহাদের (হুজিবি) বর্তমান আমির মুফতি শফিকুর রহমান, জেএমবির আমির সোহেল মাহফুজসহ কয়েকজন শীর্ষ নেতা সীমান্ত দিয়ে ছদ্মবেশে নাম পাল্টে দেশে প্রবেশ করেছেন বলে তাদের কাছে খবর এসেছে। তাদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করতে ইতোমধ্যেই তারা কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

গোয়েন্দা সূত্র জানায়, ভারতের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সংখ্যালঘু মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে ১৫-২৫ বছর বয়সী তরুণীদের ছিটমহল দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকানোর পরিকল্পনা করছে হুজি। বাংলাদেশের বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকায় তাদের স্বল্পমেয়াদি সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর বড় ধরনের নাশকতামূলক গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে কাজে লাগানো হবে।

এদিকে গত ২৯ মার্চ ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) কাছে গ্রেফতার হুজির আধ্যাত্মিক নেতা ডা. ফরিদ উদ্দীন আহাম্মদ ও আফগানফেরত মুজাহিদ ফরিদ উদ্দীন মাসুদ জানিয়েছেন, নতুন করে হুজির পুনর্গঠনে রয়েছেন ফেনীর সাইদুর রহমান সাঈদ, টঙ্গীর মুফতি সিরাজ, একটি কওমি মাদ্রাসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সানাউল্লাহ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ল্যাংড়া সালাম। তারা সাংগঠনিক কাঠামো মজবুত করাসহ নাশকতার ছক এঁকেছেন। ইতোমধ্যে তারা হত্যাকাণ্ডের একটি রূপরেখা তৈরি করেছেন। কয়েক মাস ধরে নতুন আদলে বিদেশি একটি এজেন্সির অর্থায়নে বাংলাদেশে ফের সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে হুজি।

ডিবির যুগ্ম কমিশনার মনিরুল ইসলাম জানান, মাঝখানে অনেক দিন জঙ্গী সংগঠনগুলো ঝিমিয়ে পড়েছিল। তবে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে এবং কিছু রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে এসব সংগঠন আবারও মাথাচাড়া দিতে পারে। তবে এ তৎপরতা প্রতিহত করতে গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত আছে।

ব্যাখ্যা: প্রথমত:সংবাদটি বাংলাদেশের ইন্টারনেটভিত্তিক অনলাইন "অপরাজিতা"য় ২৮ মে প্রকাশিত হয়েছে। জঙ্গী কার্যক্রমে মহিলাদের সম্পৃক্ত করা হচ্ছে সংবাদটি গুরুত্বপূর্ণ। তবে, সংবাদের শিরোনামে থাকলেও সংবাদের ভিতরে কিন্তু তথ্য উপাত্ত দিয়ে শিরোনামটি প্রতিষ্ঠিত করা যায়নি। তবে, যেহেতু সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে, তাই আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন বা এর গুরুত্ব তারা বিবেচনা করবেন।

জঙ্গীবাদ দমনে প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলন

(বাংলার চোখ, ১৯ সেপ্টেম্বর; ২০১২)

স্বল্প আয়তনের মধ্যে বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত হয়েও একটি শান্তিপ্রিয় দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সুপরিচিতি দীর্ঘদিনের। জনসংখ্যার অধিকাংশই মুসলিম হলেও হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ বিভিন্ন উপজাতির লোকেরা সুদূর অতীত থেকে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সাথে এদেশে বসবাস করে আসছিল।

জনসংখ্যার আধিক্য, দারিদ্র্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছিল মূলত এদেশের সমস্যা। শান্তিপ্রিয় মানুষের এদেশে বিগত এক দশকের বেশি সময় ধরে যোগ হয়েছে এক নতুন সমস্যা। সমস্যার নাম জঙ্গীবাদ। ধর্মে জঙ্গীবাদের কোনো স্থান না থাকলেও, পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, এসব জঙ্গীবাদের সাথে যারা জড়িত তাদের একটি ধর্মীয় লেবাস আছে। মূলত বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত এক শ্রেণির লোক ধর্মের নাম ব্যবহার করে ধর্মীয় চরমপন্থা অবলম্বন করছে। সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করছে ।

বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের উত্থানের পেছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে, এদেশের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষা ব্যবস্থা। ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসন ও পাকিস্তান আমলের ২৩ বছরের শোষণ পেরিয়ে বাংলাদেশের ৪০ বছরের অধিক সময়ে এদেশে একটি সুনির্দিষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক ধারা সৃষ্টি হয়নি। এ সময়ের মধ্যে সাধারণ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সাথে ধর্মভিত্তিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটেছে। দেশে প্রতিষ্ঠিত বিপুল সংখ্যক মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষার সুযোগ নিয়েছে প্রধানত দরিদ্র জনগোষ্ঠী। আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার অনুপস্থিতিতে মাদ্রাসাগুলো ধর্মীয় চরমপন্থা অবলম্বনকারীদের অভয়রাজ্যে পরিণত হয়েছে। সর্বশেষ প্রণীত নতুন শিক্ষানীতি হয়তোবা এরূপ অবস্থার বিপক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

জঙ্গীবাদ বাংলাদেশে একটি সাম্প্রতিক বিষয় হলেও এর দ্রুত ব্যাপ্তি সমাজচিন্তাবিদ, গবেষক এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীদেরকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে। জঙ্গীবাদ এখন এক সামাজিক সংকটে উপনীত হয়েছে। জঙ্গীবাদের প্রতিরোধ ও প্রতিকারে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাস্তবতার নিরিখে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের মাধ্যমে এ সামাজিক ব্যাধি থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে।

বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ দমনে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা ও সামাজিক প্রতিরোধ। পাশাপাশি জঙ্গীবাদী দল, সংগঠন ও ব্যক্তিদের কঠোরভাবে দমন করতে হবে। তাদের আর্থিক ও সাংগঠনিক কাঠামোকে ভেঙ্গে দিতে হবে। অস্ত্র সরবরাহের উৎসগুলো চিহ্নিত করে তা বন্ধ করতে হবে। তাদের সামগ্রিক কার্যক্রমকে শক্ত হাতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে। এজন্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে উপযোগী করে তুলতে হবে। জঙ্গীবাদ প্রতিরোধের অন্যতম পদক্ষেপ হবে এদেশের মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে তোলা। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে উগ্র ধর্মান্ধতা ও চরমপন্থামূলক শিক্ষা ও কার্যক্রম চালাতে না

পারে সেজন্য সরকারের গোয়েন্দা বিভাগকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। একইসাথে দরিদ্রতা ও অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে কেউ যেন জঙ্গীবাদের সাথে যুক্ত না হয়, সেজন্য দারিদ্র্য হ্রাসে টেকসই কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।

সরকার এসব বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ নিয়েছে এবং নিয়ে চলেছে। সরকারের যথাযথ উদ্যোগে শীর্ষস্থানীয় জঙ্গী সংগঠনগুলোকে নিষিদ্ধ করা এবং এর নেতৃত্বকে বিভিন্ন জঙ্গী হামলার দায়ে গ্রেফতার করে বিচারের মাধ্যমে ফাঁসিতে ঝোলানোর পর তাদের মনোবল ভেঙে গেছে। তারা যেন আর কখনও শক্তিমত্তায় সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পারে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের লক্ষ্যে রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বগণ আলোচনা, টকশো করছেন। সরকারী ও বেসরকারি উদ্যোগে ইতোমধ্যে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বহুসংখ্যক সভা, সমাবেশ ও সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। জুম'আর নামাজে মসজিদে মুসল্লিগনের মধ্যে জঙ্গীবাদ বিরোধী প্রচারণার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রায় তিন লক্ষাধিক ইমাম-মুয়াজ্জিন ও ধর্মীয় নেতাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসে জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও ধর্মীয় চরমপন্থার বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি ব্যাপারে নানামুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের কওমি মাদ্রসাগুলোর ব্যাপারে সরকার সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে।

সরকারের এ সামগ্রিক কার্যক্রম ও সার্বক্ষণিক কঠোর নজরদারির সাথে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সচেতনতা ও সম্পৃক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ থেকে এ সমস্যা নিরসন হবে বলে আশা করা যায়। এ সমস্যা মোকাবেলায় জনগণকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসে তাদের সম্পৃক্তি আরো বৃদ্ধি করতে হবে। এর বিরুদ্ধে প্রয়োজন এক সর্বব্যাপী সামাজিক আন্দোলন।

ব্যাখ্যা: এ সংবাদটি অনলাইন "বাংলার চোখ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এটি একটি বিশেষ রিপোর্ট। সংবাদটিতে বেশ কিছু তথ্য-উপাত্ত দেয়া হয়েছে। এ সংবাদে বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের সূত্রপাত, জঙ্গীহামলা, বিভিন্ন তথ্য দিয়ে বেশ কিছু সুপারিশও দেয়া হয়। বলা হয়েছে, সর্বব্যাপি সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে জঙ্গী তৎপরতা প্রতিহত করা যেতে পারে। তবে এ ধরনের সংবাদ আরো বেশি প্রচার সংখ্যা আছে এমন জাতীয় দৈনিকে বা গণমাধ্যমে আসতে পারে।

<u>সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন বাড়ছে:</u>

(যুগান্তর, ১৮ আগষ্ট; ২০১৩)

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে দেশের আর্থিক খাত-তথা ব্যাংকিং খাত। সাম্প্রতিক সময়ে এ খাতে বেড়ে গেছে সন্দেহজনক ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা। শুধু তাই নয়, সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য গোপন করায় দুই ডজন ব্যাংককে বিভিন্ন ধরনের জরিমানা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এছাড়া সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অর্থায়ন বন্ধ করা এবং মানি লন্ডারিং আইন যথাযথভাবে পরিপালনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে (বিএফআইইউ) বিশেষ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে ব্যাংকগুলোর বিভিন্ন শাখায় পরির্দশন কাজ শুরু হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান বলেন, কিছু কিছু ব্যাংক এখনও গ্রাহকের পরিচিতি ফরম সঠিকভাবে সংরক্ষণ করছে না।এ কারণে গ্রাহক পরিচিতি ফরম বা কেওয়াইসি রিপোর্ট তদারকির জন্য ব্যাংকগুলোর প্রধান কার্যালয়সহ শাখা অফিসগুলো পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। তিনি বলেন, সেপ্টেম্বরের শুরুতে এ পরিদর্শন কার্যক্রম চালানো হবে। তিনি বলেন, সম্প্রতি ব্যাংকের পাশাপাশি ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা ও এনজিও খাতের লেনদেনের ওপর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। যথাযথভাবে রিপোর্টিং না করা এবং এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান ঠিকভাবে পালন না করায় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য মতে, জুন পর্যন্ত ব্যাংকগুলোর প্রায় এক হাজার একাউন্টে সন্দেহজনক ও অস্বাভাবিক লেনদেন হয়েছে। আর ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে ১০৩টি সন্দেহজনক লেনদেনের ঘটনা ঘটেছিল। আর এর আগের অর্থবছরে এ সংখ্যা ছিল মাত্র ৩২টি। বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, এসময়ে সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য গোপন করায় একটি ব্যাংককে জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও সন্ত্রাস প্রতিরোধ আইনবিষয়ক বিধি-বিধান যথাযথভাবে মেনে না চলায় ২২টি ব্যাংককে জরিমানা করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর আগে মার্কিন সিনেটের তদন্ত বিষয়ক স্থায়ী সাব কমিটির এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশে জঙ্গী অর্থায়নের সঙ্গে বাংলাদেশের ও বিদেশের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান জড়িত বলে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করে। গতবছরের ১৭ জুলাই প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের দু'টি ব্যাংক জঙ্গী অর্থায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত। একটি গোয়েন্দা সূত্রের দাবী, বাংলাদেশে একাধিক আর্ন্তজাতিক সন্ত্রাসী গ্রুপের এজেন্টরা কয়েকটি ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করছে। এর মধ্যে সন্ত্রাসী কাজে লেনদেন হয়েছে বিদেশি কয়েকটি ব্যাংকের একাউন্টে। সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি, আর্ন্তজাতিক একটি সন্ত্রাসী চক্র এ দেশে ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করে। তবে কয়েকটি ব্যাংক সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য গোপন করছে বলে ওই সূত্র দাবি করেন। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক কর্মকর্তা জানান, নির্দেশনা থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংকগুলো তা যথাযথভাবে পালন করছে না। এ বিষয়ে বিএফআইইউর এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে যুগান্তরকে বলেন, সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পেলেও অভিযুক্তদের আইনের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না। এর অন্যতম কারণ নো ইউর কাস্টমার (কেওয়াইসি) ফরমের তথ্যে গরমিল। গ্রাহকদের ভোটার আইডি কার্ডেও অনেক তথ্য ভুল থাকে। যে কারণে কোনো গ্রাহক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেও ভুল তথ্য দিলে তা নিশ্চিত হওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। তিনি বলেন, এসব সন্দেহজনক অধিকাংশ লেনদেনই বিদেশে অর্থপাচার সংক্রান্ত। এছাড়াও রয়েছে সন্ত্রাসে অর্থায়ন ও ঘুষ লেনদেন বিষয়ক লেনদেন।

জানা গেছে, ব্যাংকিং খাতে সন্দেহজনক বা অস্বাভাবিক লেনদেন শনাক্ত করতে ২০০৫ সালে পাঁচ লাখের বেশি অঙ্কের টাকা ব্যাংকে জমা ও তোলার তথ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে পাঠানোর জন্য ব্যাংকগুলোকে বলা হয়। ২০০৭ সালে এ সীমা সাত লাখ টাকা করা হয়। সূত্র জানায়, কিছু কিছু ব্যাংক আইন অমান্য করে বা গ্রাহকদের পরিচিতি (কেওয়াইসি) অনুযায়ী এ্যাকাউন্ট না খুলে লেনদেন করছে। পাশাপাশি আইন অনুযায়ী এ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে না, মনিটরিং প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারে এগিয়ে আসছে না, সন্দেহজনক লেনদেন (এসটিআর) এবং নগদ লেনদেন (সিটিআর) ঠিকভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে না। এর ফলে ব্যাংক ব্যবস্থায় আর্থিক অনিয়মের পরিমাণ বাড়ছে। যদিও তফসিলি ব্যাংকগুলোর প্রতি কেওয়াইসি যথাযথভাবে পালনের নির্দেশ এর আগেও দেয়া হয়েছিল। কিন্তু একাধিক ব্যাংক তা মেনে চলছে না।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ যুগান্তরকে বলেন, নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নজরদারি বাড়ানো উচিত। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নজরদারি না থাকা ও ব্যাংকগুলোকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ না করার কারণে বাড়ছে অর্থ পাচারসহ ব্যাংকিং খাতে নানা অনিয়ম। তিনি বলেন, পৃথিবীর কোনো দেশের ব্যাংকে কেওয়াইসি ছাড়া গ্রাহকদের লেনদেন করতে দেয়া হয় না। এ কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের আরো কঠোর হওয়া জরুরী।

ব্যাখ্যা : সংবাদটি তথ্যবহুল। এটি ১৮ আগষ্ট দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় বিশেষ রিপোর্টের মর্যাদা পেয়েছে। যেহেতু জঙ্গী তৎপরতায় অর্থায়ন এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়,তাই অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রে সরকারের যে নিয়ম কানুন বা আইন রয়েছে, সেগুলো যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে কিনা তা এ রিপোর্টে বলা হয়েছে। আর্থিক বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় শুধু আইন করলেই হবে না, মনিটরিং জোরদার করার কথাই রিপোর্টে বলা হয়েছে।

জঙ্গীবাদবিরোধী প্রচারে মসজিদ মাদ্রাসাকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্তঃ

(জনকণ্ঠ, আগষ্ট*; ২০১০*)

জঙ্গীবাদবিরোধী প্রচারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের তৃণমূল পর্যায়ের কর্মী এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও মাদ্রাসাকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। একই সঙ্গে জঙ্গী ও সন্ত্রাস প্রতিরোধে প্রয়োজনে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের সংশোধন করারও উদ্যোগ নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক টুকু। মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ ও প্রতিকার কমিটির বৈঠক শেষে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের একথা বলেন। তিনি বলেন, যে কোনভাবেই হোক, দেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গী তৎপরতা প্রতিহত করা হবে। এসব কর্মকান্ডের মদদদাতা ও প্রশ্রয়দাতাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে। সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করতে মসজিদ-মাদ্রাসার ইমাম ছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক, তৃণমূল পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী, আনসার ও ভিডিপি সদস্য, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের কাজে লাগানো হবে। এ ব্যাপারে সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী জানান, কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইতোমধ্যে বিভিন্ন মসজিদে নামাজের আগে ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমে প্রচার চালানো হচ্ছে। 'এসো আলোর পথে' নামে একটি তথ্যচিত্র বানানো হয়েছে। এটি সরকারী গণমাধ্যমে সম্প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন বেসরকারী টিভি ও বেতারে এটি প্রচারের ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানান তিনি।

টুকু জানান, গত সরকারের সময় দেশে জঙ্গীবাদ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত নিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। এর সঙ্গে বিস্তারিত তথ্যসহ আরো একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হবে। এজন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসের ভয়াবহতা নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লিফলেট প্রচার করা হবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ সংবাদটি দৈনিক জনকণ্ঠে ২০১০ সালের আগস্টে প্রকাশিত হয়েছে। জঙ্গীবাদ বিরোধী প্রচারণার অংশ হিসেবে মসজিদগুলোকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্তের রিপোর্ট। তবে এর বাইরে শিক্ষক, স্বাস্থ্যকর্মী, আনসার, সরকারী গণমাধ্যমে প্রচারণা, নাটিকা, পুস্তিকা সহ বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও বলা হয়েছে। তবে শিরোনামে শুধু মসজিদকে ব্যবহারের কথা না বলে সমন্বিত উদ্যোগের কথা লেখা হলে আরো দৃষ্টি আকর্ষিত হতো।

হঠাৎ জঙ্গী তৎপরতা বৃদ্ধি- বিশেষজ্ঞরা যেভাবে দেখছেন:

(নয়া দিগন্ত*, ১ সেপ্টেম্বর; ২০১৩)*

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের মেয়াদের শেষ সময়ে হঠাৎ দেশে জঙ্গী তৎপরতার খবর নিয়ে নানা আলোচনা চলছে। নির্বাচনকালীন সরকার প্রশ্নে সরকার ও বিরোধী দলের মুখোমুখি অবস্থান এবং অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে হঠাৎ এ বিষয়টি সামনে আসা নিয়েই বেশি আলোচনা হচ্ছে। অনেকে বিষয়টিকে সন্দেহ উদ্রেককারী বলে মন্তব্য করছেন। নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের কেউ কেউ বলছেন, সাংঘর্ষিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে এবং আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে নিষ্ক্রিয় জঙ্গীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে থাকতে পারে। কারো কারো মতে, এ সময়ে জঙ্গী প্রসঙ্গটি সামনে আনাটা পরিকল্পিত ও এর পেছনে আগামী জাতীয় নির্বাচনকেন্দ্রিক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে।

কেউ কেউ জঙ্গী তৎপরতার খবরটিকে বর্তমান সরকারের আগের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক উল্লেখ করে বলছেন, সরকার এত দিন জঙ্গী দমনে সফলতার দাবি করে আসছিল। কিন্তু সরকারের শেষ সময়ে এভাবে জঙ্গী সংগঠন ও আস্তানার সন্ধান তাদের আগের দাবির সাথে মিলছে না। গত আওয়ামী লীগ সরকারের শেষের দিকে সরকারের পক্ষ

থেকেই দেশে জঙ্গী উত্থানের খবর প্রকাশের ঘটনা ও উদ্দেশ্যের সাথে এখনকার ঘটনার মিল খোঁজার চেষ্টা করছেন কোনো কোনো বিশ্লেষক। তবে নিরাপত্তা বিশ্লেষকেরা বলছেন, বাংলাদেশে জঙ্গী তৎপরতার বিষয়টি দেশের নিরাপত্তার জন্য বড় কোনো হুমকির কারণ নয়।

তাদের মতে, রাজনৈতিক সঙ্ঘাতময় পরিস্থিতির অবসান ঘটানোর মাধ্যমে গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় ও সুশাসন নিশ্চিত করলে এ ধরনের জঙ্গী তৎপরতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ পেত না। অনেক বিশ্লেষক ও ইসলামি চিন্তাবিদের মতে, শুরু থেকেই বাংলাদেশে জঙ্গী তৎপরতার ঘটনাগুলো রহস্যজনক ও প্রশ্নবিদ্ধ। জেএমবি, হরকাতুল জিহাদসহ যেসব সংগঠনের নামে ইতোপূর্বে বাংলাদেশে বিভিন্ন নাশকতামূলক তৎপরতার ঘটনা ঘটেছে, তার বেশির ভাগ ঘটনার ধরন ও এসব সংগঠনের শক্তি সামর্থ্যের দিক বিবেচনায় এ রহস্য ঘনীভূত হয়। এখনো যেসব সংগঠনের নাম বলা হচ্ছে সেগুলোর নাম ও তৎপরতার বিষয় সাধারণ মানুষ একেবারেই অন্ধকারে। এসব সংগঠনের সাথে দেশে প্রতিষ্ঠিত কোনো ইসলামি রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর সম্পৃক্ততার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ এখনো প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। বাংলাদেশে এই ধরনের জঙ্গী সংগঠনগুলোর জন্ম ও পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে নানা গুঞ্জনও রয়েছে।

ইসলামি চিন্তাবিদেরা এ প্রসঙ্গে বলছেন, ইসলামবিরোধী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের জন্ম এবং ইসলাম ও ইসলামি শক্তিকে ঘায়েল করার জন্যই পরিকল্পিতভাবে জঙ্গী তৎপরতার খবর সামনে আনা হয়। এখনো সরকারের শেষ সময়ে আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে ইসলামপন্থীদের ঘায়েল করতেই এই প্রসঙ্গটি সামনে আনা হয়েছে বলে তাদের অভিমত। হঠাৎ করে আগস্ট মাসে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পরস্পর কয়েকটি অভিযানে জঙ্গী গ্রেফতার ও জঙ্গী সংগঠনের খবর প্রকাশ করে, যা সংবাদমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার হয়। নতুন করে 'আনসার উল্লাহ বাংলা টিম ও বিইএম' নামে দু'টি নতুন জঙ্গী সংগঠন আবিষ্কৃত হয়। এসব সংগঠন আন্তর্জাতিক জঙ্গী সংগঠন আলকায়েদার আদলে গঠিত বলে র‍্যাব বলছে। বলা হচ্ছে, তাদের উদ্দেশ্য সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ইসলামী হুকুমত কায়েম করা। সংগঠনগুলো সুযোগ বুঝে সরকারের শেষ সময়ে নানা রকমের নাশকতামূলক তৎপরতার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। বর্তমান সরকারকে হটিয়ে অন্য দলগুলোকে সাথে নিয়ে তাদের উদ্দেশ্য সফল করার পরিকল্পনা করছিল।

মাঝে মধ্যেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক জঙ্গী আটক ও জঙ্গী আস্তানা আবিষ্কারের ঘটনার খবর প্রকাশিত হলেও বিগত কয়েক বছরে দেশে নাশকতামূলক জঙ্গী তৎপরতার ঘটনা ঘটেনি। তবে গত ফেব্রুয়ারি মাসে শাহবাগ আন্দোলনের সাথে জড়িত ব্লগার রাজিব হত্যা ও ব্লগার আসিফের ওপর হামলার ঘটনার সাথে আনসার উল্লাহ বাংলা টিম জড়িত ছিল বলে তদন্তকারীরা দাবি করছে।

সম্প্রতি বরগুনায় পুলিশের অভিযানে গ্রেফতারকৃত মুফতি জসিম উদ্দিন আনসার উল্লাহ বাংলা টিমের প্রধান বলে পুলিশ জানায়। গত ১২ আগস্ট বরগুনা জেলার সদর উপজেলার দক্ষিণ খাজুরতলা গ্রামের একটি বাড়ি থেকে মুফতি জসীম উদ্দিন ও তার ৩০ সহযোগী গ্রেফতার হন। ১৫ আগস্ট ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলা থেকে আমীর উদ্দিন নামে জঙ্গী সংগঠনের ৯ সদস্যকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ২২ আগস্ট র‍্যাব সদস্যরা বগুড়া থেকে জঙ্গী সন্দেহে গ্রেফতার করে মাওলানা সানাউল্লাকে। পুলিশের দেয়া তথ্য মতে, তার গঠিত সংগঠনের নাম বিইএম। ২৪ আগস্ট বগুড়ার একটি বাড়ি থেকে অস্ত্র, বিস্ফোরক ও বই উদ্ধার করা হয়। এটি বিইএমের আস্তানা ছিল বলে পুলিশ জানায়। এরপর গোয়েন্দা পুলিশ ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৫ আগস্ট আরো ৯ জনকে গ্রেফতার করে। এরপরই আনসার উল্লাহ বাংলা টিমসহ নতুন জঙ্গী সংগঠনের গঠন ও কাজের ধরন সম্পর্কে পুলিশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন তথ্য দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

গত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে এবং গত আওয়ামী লীগ সরকরের আমলে বেশ কিছু নাশকতামূলক তৎপরতার ঘটনা ঘটে। তার মধ্যে জেএমবি একযোগে ৬৩টি জেলায় বোমা হামলার ঘটনা ছিল আলোচিত। ওই ঘটনার দায়ে জেএমবি প্রধান শায়খ আব্দুর রহমান ও বাংলা ভাইয়ের ফাঁসি কার্যকর হয় এবং অন্যান্য বেশ কিছু জেএমবি সদস্যের সাজা হয়। এর বাইরে একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলাসহ অন্যান্য নাশকতামূলক ঘটনার পেছনেও হরকাতুল জিহাদ নামক সংগঠনের জড়িত থাকার অভিযোগ করা হলেও এখন পর্যন্ত কোনো ঘটনার বিচার সম্পন্ন হয়নি।

প্রখ্যাত নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান **মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মোহাম্মদ ইবরাহিম বীর প্রতীকের** কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, জঙ্গীবাদের কারণে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি বড় রকমের কোনো হুমকি সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। পর্যবেক্ষণ মতে, বাংলাদেশের মূল রাজনৈতিক ধারার মধ্যে কোনো প্রকারের উগ্রবাদ বা জঙ্গীবাদী তৎপর রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। সরকারের শেষ সময়ে জঙ্গীবাদের বিস্তারের দিক সামনে আসার বিষয়ে তিনি বলেন, নির্বাচনে সহায়তা লাভের জন্য এটা পশ্চিমা বিশ্বকে দেখানোর উদ্দেশ্যেও হতে পারে। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, ভারতের অন্তত ১০টি রাজ্যে বামপন্থী মাওবাদী যোদ্ধারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ চালাচ্ছে। তাদের কেউ জঙ্গী বলছে না। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনীর অবশিষ্টাংশরা সারেন্ডার না করা অস্ত্র দিয়ে অলিখিত ও অঘোষিত যুদ্ধ চালাচ্ছে রাষ্ট্র,সরকারের এবং জনগণের বিরুদ্ধে। তাদের কেউ জঙ্গী বলছে না। সরকারের মতে, বাংলাদেশের কয়েকটি জায়গায় কিছু কিছু লোক বা গোষ্ঠী আবিষ্কৃত হয়েছে, যারা একটি সুনির্দিষ্ট ডানপন্থী মতবাদে বিশ্বাস করে।সরকারের মতে তারা, জঙ্গী হয়ে গেছে। বস্তুত পৃথিবীতে বিশেষ করে পাশ্চাত্য প্রভাবিত পৃথিবীতে মুসলমানদের কট্টর অংশকে বা চরমপন্থী অংশকে জঙ্গী বলা একটি সহজ ও বহুল প্রচলিত অভ্যাস। বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম নয়। বর্তমান সরকারের মতে, জঙ্গীবাদ নির্মূল হয়ে গেছে। কিন্তু হঠাৎ করে দুই-তিন মাস ধরে আবার তারা আবিষ্কৃত হচ্ছে। মনে হয় পাশ্চাত্য বিশ্বের দিকেই এই সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে একটি ইশারা দিতে চায়। ইশারা এইরূপ– দেখ, জঙ্গীবাদ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ওদেরকে শায়েস্তা করা দরকার। তা না হলে তোমাদের কাঙ্ক্ষিত উদার গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও পুঁজিবাদ যে রক্ষা হবে না।

প্রখ্যাত নিরাপত্তা বিশ্লেষক সাবেক নির্বাচন কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত **ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাখাওয়াত হোসেন** এ ব্যাপারে নয়া দিগন্তের প্রশ্নের জবাবে বলেন, জঙ্গীবাদ ধর্মভিত্তিক বা অন্য মতবাদভিত্তিকও হতে পারে। এটাকে টেরোরিজম বা সন্ত্রাসবাদ বলি। তিনি বলেন, সরকার জঙ্গী দমন করে ফেলেছে বলে আগে দাবি করে থাকতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এটা পুরোপুরি দমন করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, বিগত জোট সরকারের আমলেই জঙ্গীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া শুরু হয়। এভাবে যখন ব্যবস্থা নেয়া হয়, তখন জঙ্গীরা নিষ্ক্রিয় থাকার পন্থা অবলম্বন করে। কিন্তু বিশেষ সময়, বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবার কার্যক্রম শুরু করে। এখন সামনে নির্বাচন। দেশে রাজনৈতিক সঙ্কট চলছে। সঙ্কট ঘনীভূত হচ্ছে। এ অবস্থায় তৎপরতা বেড়ে থাকতেই পারে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা এ সময়ে জঙ্গী উত্থান নিয়ে সন্দেহ সংশয় কিংবা ভিন্ন বিশ্লেষণ করতে পারেন। কিন্তু এটা সত্য যে, যারা ধরা পড়ছে তারা নিজেরা তৎপরতার সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করছে। তিনি বলেন, জঙ্গী তৎপরতা একটি আন্তর্জাতিক বিষয়। সেই জঙ্গীপনার আন্তর্জাতিক প্রয়াস এখানে নেই, সেটা আমরা বলতে পারব না। সারা বিশ্বে ধর্মীয় চেতনায় জঙ্গী উত্থাপনের ঘটনা ঘটছে। পুরো বিষয়টি মনিটরিংয়ের মধ্যে আছে। কাজেই প্রসঙ্গটিকে এড়িয়ে যাওয়া বা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। জাতীয় নিরাপত্তা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশে নিরাপত্তার বিষয়টি হচ্ছে রিঅ্যাকটিভ; প্রোঅ্যাকটিভ নয়। ঘটনা ঘটলেই নিরাপত্তার বিষয় সামনে আনা হয়। তিনি বলেন, নানা কারণে আমাদের রাষ্ট্র দুর্বল। এ জন্য রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাও দুর্বল। সব কিছুতেই রাজনীতিকরণ আছে। সব অর্গানাইজেশনে তা আছে। যার কাজ সে যেন করতে পারে, সেই ধরনের ফ্রিডম দেয়া হচ্ছে না।

Dhaka University Institutional Repository

সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক **ড. বদিউল আলম মজুমদার** এ ব্যাপার বলেন, হঠাৎ করে জঙ্গী উত্থানের বিষয়টি সন্দেহের উদ্রেক করে। কারণ এই সরকার জঙ্গী দমনে সফল হয়েছে দাবি করে আসছিল। আন্তর্জাতিক মহলকে তারা এই দাবির কথা এত দিন বলে এসেছে। কিন্তু এখন দেশের সজ্ঞাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন; তখন আবার দেখা যাচ্ছে দেশে জঙ্গী উত্থান ঘটছে। তিনি বলেন, দেশে জঙ্গীর অস্তিত্ব আছে এতে সন্দেহ নেই। সজ্ঞাতময় রাজনীতি, মানুষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, মানুষের মধ্যে বৈষম্য ইত্যাদি মানুষকে প্রতিবাদী করে। ফলে জঙ্গীবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ যারা জঙ্গীবাদী তারা তো মানুষকে এসব সমস্যা থেকে মুক্তির আশ্বাস দেয়। তিনি বলেন, সংঘাতময় রাজনীতির অবসান ঘটাতে হবে। এ জন্য সংলাপের কোনো বিকল্প নেই। সংলাপ শুধু দু'দলের মধ্যে নয়, জাতীয় সংলাপ দরকার। জাতীয় সনদ স্বাক্ষর করতে হবে। তাহলেই নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। নির্বাচন-পরবর্তী অন্যান্য সমস্যারও সমাধান করা সম্ভব হবে।

বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ মাসিক মদীনা সম্পাদক **মাওলানা মুহিউদ্দীন খান বলেন,** ইসলামি হুকুমত কায়েমের জন্য কথিত জঙ্গীবাদীরা পরিকল্পনা করছিল বলে যে কথা বলা হচ্ছে, তার কোনো ভিত্তি নেই। জঙ্গীবাদ ইসলাম প্রতিষ্ঠার পন্থা নয়। তিনি বলেন, মাঝে মধ্যেই জঙ্গীবাদের অস্তিত্বের খবর দেখা যায়। আসলে জঙ্গীবাদের পুরো বিষয়টাই বাংলাদেশে পরিকল্পিত এবং ইসলামপন্থীদের সাইজ করার কৌশল হিসেবে সময়মতো ব্যবহার করা হয়। এখনো হঠাৎ করে জঙ্গীবাদের বিষয় সামনে আনার উদ্দেশ্য হচ্ছে,আমেরিকাসহ বিশ্বকে জানানো যে বাংলাদেশে ইসলামপন্থীরা জঙ্গীপনায় লিপ্ত। তাদের শায়েস্তা করা দরকার। এর প্রধান উদ্দেশ্য যাতে ইসলামপন্থীরা আগামী নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে।

বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের (বেফাক) মহাসচিব বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ **মাওলানা আব্দুল জব্বার এ ব্যাপারে বলেন,** বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের উত্থান ষড়যন্ত্রের অংশ। এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে, এ দেশে কওমি মাদরাসা ভিত্তিক শিক্ষাকে ধবংস করার মাধ্যমে ইসলামি শিক্ষার দ্বারকে রুদ্ধ করে দেশকে ইসলামশূন্য করা। তিনি বলেন, হেফাজতে ইসলামের নেতৃত্বে ঈমান আকিদাভিত্তিক যে আন্দোলন তা মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়ে এখন কওমি আলেম-ওলামা ও ইসলামপন্থীদের বিতর্কিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যেই জঙ্গী প্রচারণা চালানো হতে পারে। তিনি বলেন, যাদের ধরা হচ্ছে বা যেসব সংগঠনের নাম বলা হচ্ছে, সেগুলো যদি সত্যিও হয় তবে তা দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের সৃষ্ট। এর সাথে এ দেশের আলেম-ওলামাদের কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলাম এই ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে সমর্থন করে না। তিনি বলেন, যেখানে ইসলামি দলগুলো নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করছে সেখানে কিছু জনসমর্থনহীন বিচ্ছিন্ন লোক কিছু অস্ত্র আর গোলাবারুদ মজুদ করে বিপ্লব করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবে এটা হাস্যকর ব্যাপার।

ব্যাখ্যা : এ সংবাদটি ১ সেপ্টেম্বর দৈনিক নয়াদিগন্তে বিশেষ রিপোর্ট হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠায় বিশেষ গুরুত্বের সাথে বক্স করে সংবাদটি ছাপা হয়েছে।এতে নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহীম, অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার এম সাখাওয়াত হোসেন ,সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের মহাসচিব মাওলানা আব্দুল জব্বারের সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে।এতে দুইজন বিশ্লেষক জঙ্গীবাদের অস্তিত্ব আছে এমনটা স্বীকার করে রাজনৈতিক দলগুলোকে সংলাপের মাধ্যমে এসমস্যা কাটিয়ে ওঠার পরামর্শ দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগের আমলেই জঙ্গি সংগঠনের রমরমা অবস্থা কেন?

(সংগ্রাম, ২৮ আগষ্ট; ২০১৩)

সরদার আবদুর রহমান : দেশে নতুন করে ইসলামপন্থী জঙ্গী সংগঠন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে বলে সরকারের জঙ্গীবিরোধী তৎপরতা দেখে মনে হচ্ছে। তবে এ নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। রাজনৈতিক ভাষ্যকাররা প্রশ্ন তুলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই কেন জঙ্গী সংগঠন মাথা চাড়া দেয়। আর মহাজোট সরকারের সাড়ে চার বছর সময় অতিক্রান্ত হবার পর এই দীর্ঘ সময়ে সরকার কী কাজটা করলো যে এদের উত্থান অব্যাহত রয়েছে? পর্যবেক্ষকদের মতে, এসব ঘটনার হোতাদের কোন না কোনভাবে আওয়ামী লীগের সঙ্গেই যোগাযোগ দেখা যায়। অথচ এর সঙ্গে পরিকল্পিতভাবে জামায়াত-শিবিরের সঙ্গে সম্পৃক্ততা দেখানোর জোর চেষ্টা চালানো হয়।

গত কয়েক সপ্তাহে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বরগুনা ও উত্তরাঞ্চলের বগুড়া থেকে জঙ্গী তৎপরতার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে বেশ কিছু মাদ্রাসা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করেছে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা। পরে রাজধানীতেও অভিযান চালিয়ে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। গত ১২ আগস্ট বরগুনা থেকে আনসারুল্লাহ বাংলা টিম প্রধান মুফতি জসিমউদ্দীন রাহমানীকে ৩০ জনসহ আটক করা হয়। ১৫ আগস্ট ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলা থেকে গ্রেফতার করা হয় তা-আমীর উদ্দীন নামের সংগঠনের ৯ জনকে। এই ৯ জনের দলনেতা হচ্ছেন নলছিটি উপজেলার নাচন মহল গ্রামের মশিউর রহমান। তবে তাদের প্রধান নেতা মুফতি আবদুর রউফ বর্তমানে কাশিমপুর কারাগারে আছেন। গোয়েন্দাদের দাবি, তার নির্দেশিত পথে টিমের নেতৃত্ব দিচ্ছেন মশিউর রহমান। ২২ আগস্ট র‌্যাব সদস্যরা বগুড়া থেকে ৩ সহযোগীসহ গ্রেফতার করে মাওলানা সানাউল্লাকে। তার সংগঠনের নাম বিইএম। বগুড়ার বিইএম-এর কাছ থেকে বিপুল পরিমান আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের কথা জানায় র‌্যাব। বরগুনা ও ঝালকাঠিতে গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের দেয়া তথ্য অনুসারে গোয়েন্দা পুলিশ ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আরো ৯ জনকে গ্রেফতার করে। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে র‌্যাব কর্মকর্তারা জানান, সম্ভবত সাবেক জেএমবির সদস্যরাই বিইএম নামে নতুন করে সংগঠিত হচ্ছে। তবে বিইএম এর নামের পুরো অর্থ তারাও জানতে পারেননি। চেষ্টা করেও গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে তাদের সংগঠন ও নাশকতার ছক সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। গ্রেফতারকৃতদের বগুড়া সদর থানায় হস্তান্তর করা হলে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে সরকারি কাজে বাধাদান, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উপর হামলা এবং অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র রাখার পৃথক তিনটি অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

দেশে জঙ্গী তৎপরতা প্রতিহত করতে র‌্যাবের ভূমিকার প্রশংসা করা হলেও এর পেছনে নানা প্রশ্ন উঠে আসতে শুরু করেছে। মহাজোট সরকার তার ক্ষমতার মেয়াদে জোর গলায় বলে আসছে সরকার জঙ্গি তৎপরতা নির্মূল করে দিয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ সাড়ে চার বছর পর হঠাৎ করে এতো তৎপরতা কীভাবে বেড়ে গেল আর সরকারের শ্যেণ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে এতো বিপুল যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহে সমর্থ হলো- সে প্রশ্নের কোন জবাব মিলছে না। বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচন ঘনিয়ে আসায় হঠাৎ জঙ্গী ধরা শুরু হয়ে গেছে। এতোদিন মহাজোট সরকার দেশে-বিদেশে জঙ্গী দমনের সাফল্য প্রচার করেছে। বিদেশী মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দিয়েও জঙ্গীমুক্ত বাংলাদেশ প্রচার করা হয়েছে। জঙ্গী নিধনের সেই সাফল্যকে চেপে রেখে হঠাৎ আবার জঙ্গী ইস্যুকে সামনে নিয়ে আসায় জনমনে কৌতূহলের জন্ম দিয়েছে। অনেকের প্রশ্ন, সরকারের দাবি অনুয়ায়ী জঙ্গিমুক্ত দেশে হঠাৎ এই ইস্যু সামনে নিয়ে আসার পিছনের রহস্য কি? উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগের কৌশল হলো, নির্বাচন এগিয়ে আসলেই তারা এই ইস্যুকে সামনে নিয়ে আসবে। সন্ত্রাসী ঘটনা যে আমলেই ঘটুক তার দায় বিএনপি-জামায়াতের। অথচ দেখা যায়, জেএমবি, বিইএম, আনসারুল্লাহ প্রভৃতি সব সংগঠনের জন্ম ও বিকাশ আওয়ামী লীগ শাসনামলেই ঘটেছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, জেএমবি গঠিত হয় ১৯৯৭ সালে, যে সময় ক্ষমতায় ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। জেএমবির প্রধান শায়খ আবদুর রহমান ছিলেন আওয়ামী যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সংসদ সদস্য মির্জা আজমের আপন ভগ্নিপতি। অপর দুই জেএমবি নেতা

Dhaka University Institutional Repository

আতাউর রহমান সানি শায়খ আবদুর রহমানের ভাই এবং আবদুল আউয়াল আজমের ভাগ্নি জামাই। আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় দফা ক্ষমতাসীন সময়ের শেষ ৩ বছর অর্থাৎ ১৯৯৯, ২০০০ ও ২০০১ সালে আরো সন্ত্রাসী বোমা হামলা হয়। এরপর চারদলীয় জোট সরকারের আমলে ময়মনসিংহের সিনেমা হলে বোমা হামলা দিয়ে জেএমবির নতুন অধ্যায় শুরু হয়। ২০০০ সালের ২০ জুলাই গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ার শেখ লুৎফর রহমান কলেজ মাঠে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনসভাস্থলের কাছে একটি দোকানের সামনে মাটিতে পুঁতে রাখা ৭৬ কেজি ওজনের বোমা উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনার প্রধান আসামী মুফতি আবদুল হান্নান দাবি করেছিলেন, শেখ হাসিনাকে হত্যা প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ও গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলী খানও জড়িত ছিলেন। এ ঘটনায় তাকে বলির পাঠা বানানো হয়েছে, গোপালগঞ্জের বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আদালতের বারান্দায় সাংবাদিকদের দেখে মুফতি হান্নান বলেন, বোমা পুঁতে রাখার সঙ্গে তার সরাসরি সম্পৃক্ততা ছিল না। বোমা পোঁতার বিষয়ে আবদুল্লাহ, মাহবুব সবই জানে। এর সঙ্গে কোটালীপাড়ার আরো অনেক নেতা জড়িত ছিল বলেও তিনি সাংবাদিকদের জানান। এই দুই নেতাকে তাঁর মুখোমুখি করে জিজ্ঞাসাবাদেরও দাবি জানান মুফতি হান্নান। মুফতি হান্নানের দেয়া বক্তব্যকে কেন্দ্র করে সারা গোপালগঞ্জে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সর্বশেষ, বগুড়ায় বিইএম-এর ঘাঁটি সেই বাড়ির মালিক স্থানীয় আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতা দুলাল হোসেন।

অস্ত্রের উৎস নিয়ে প্রশ্ন:

বিগত সময়ে জেএমবির ব্যবহৃত বোমার উপকরণ, ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ডেটোনেটর ইত্যাদি সবই ছিল ভারত থেকে আমদানিকৃত। তেজগাঁও পলিটেকনিক থেকে গ্রেফতার শায়খ আবদুর রহমানের ছোট ভাই আতাউর রহমান সানি ছিল জেএমবির সামরিক কমান্ডার। সে ছিল সকল নাশকতামূলক কাজ ও বোমার বিস্ফোরণ ঘটানোর কৌশলগত বুদ্ধি ও প্রশিক্ষণদাতা। সানি এবং জেএমবির বোমারু মিজানসহ অনেকেই ভারতে গিয়ে বোমা তৈরি ও হামলার পূর্ণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। গ্রেফতারের পর আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে তারা স্বীকার করে, তারা বোমার সকল রাসায়নিক ও ডেটোনেটর সবই ভারত থেকে আনতো। এরপর শায়খ আবদুর রহমান গ্রেফতার হলে সেও একই কথা বলে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহে জেএমবির একটি আস্তানা তথা ঘাঁটি থাকার কথাও তারা জানায়। তারাই ঐ বোমার সরঞ্জামাদি ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে যোগাড় করে বাংলাদেশে পাচার করে। জেএমবির প্রথম নাশকতা শুরু ১৯৯৯ সালের মার্চে উদীচির অনুষ্ঠানে হামলার মধ্য দিয়ে। আর সে সময়েও ক্ষমতায় ছিল আওয়ামী লীগ। আর জেএমবির অস্ত্রের প্রধান উৎস ছিল ভারত।

অথচ এর দায় চাপানো হয় চার দলীয় জোটের উপর। দেশের অনেক মানুষই বিশ্বাস করেন, এটা ছিল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামপন্থী তথা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের ষড়যন্ত্রের একটি অংশ। বাংলাদেশে জঙ্গী তৎপরতা বিস্তৃত হবার পেছনে ভারতের ভূমিকা আছে বলে ব্যাপকভাবে সন্দেহ করা হয়। জঙ্গী তৎপরতার অন্যতম হোতা জেএমবির অস্ত্র-বিস্ফোরকের প্রধান উৎসই ছিল ভারত। বাংলাদেশে গ্রেফতারকৃত জেএমবির অনেকেই তাদের রসদ আমদানির প্রধান উৎস ভারত বলে স্বীকারোক্তি দিয়েছে। গত ৫ জুন ২০০৯ তারিখের বাংলাদেশের একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়, ভারত থেকে বিস্ফোরক সংগ্রহ প্রসঙ্গে জেএমবির বোমারু মিজান জানিয়েছে, জেএমবির বিস্ফোরক সংগ্রহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি দল আছে। সেটা তদারক করেন সংগঠনের আমীর সাইদুর রহমান ও ঢাকা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাহফুজ ওরফে সোহেল। মাহফুজ এর আগে জেএমবির সামরিক শাখার প্রধান ছিল। তারপর বোমারু মিজান সামরিক শাখার দায়িত্ব পায়। মিজান জানায়, জেএমবি কিছু বিস্ফোরক দেশের বিভিন্ন রাসায়নিকের দোকান থেকে সংগ্রহ করে। তবে পিস্তল, পাওয়ার জেলসহ আরো কিছু বিস্ফোরক সংগ্রহ

Dhaka University Institutional Repository

করা হয় ভারত থেকে। এ কাজে সহায়তার জন্য ভারতের মালদহে জেএমবির একটি শাখা আছে। তারা অস্ত্র-বিস্কোরক সংগ্রহ করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহীর গোদাগাড়ী সীমান্ত দিয়ে এপারে পাঠায়।

পুলিশের একটি সূত্র জানায়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ২০০৮-এর অক্টোবরে গ্রেফতার হওয়া জেএমবির শুরা সদস্য রফিকও একই রকম তথ্য দিয়েছিল। ফাঁসির আগে জেএমবির প্রতিষ্ঠাতা শায়খ আব্দুর রহমানও টিএফআই কেন্দ্রে দেয়া জবানবন্দিতে এমন তথ্য দেয়। শায়খ আব্দুর রহমান জবানবন্দিতে বলেছিল, ২০০২ সালে ভারতের মালদহ জেলায় জেএমবির কার্যক্রম শুরু হয়। মালদহকে জেএমবির ৬৫তম সাংগঠনিক জেলা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মালদহ শাখার মাধ্যমে জেএমবি ওয়ান শুটারগান, পাওয়ার জেল ও ডেটোনেটর সংগ্রহ করে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, ১৯৯৮-৯৯ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১১-১২ বছর ধরে ভারত থেকে এই সকল সন্ত্রাসী কাজের বোমার সরঞ্জাম আসে। আর পশ্চিমবঙ্গের মালদহে বিচ্ছিন্নভাবে নয়, টানা ১১-১২ বছর ধরে জেএমবির গোপন ঘাঁটি ছিল। তাই এতটা সময় গোয়েন্দা সংস্থা ও ভারতীয় প্রশাসনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কিভাবে বাংলাদেশে বোমার সরঞ্জাম আসে-সে প্রশ্নও উঠে যথারীতি। বলাবাহুল্য, শায়খ আবদুর রহমান ও বাংলা ভাইসহ জেএমবির শীর্ষ নেতারা সকলেই চারদলীয় জোটের আমলে গ্রেফতার হয়। তাদের ফাঁসি কার্যকর হয় ৩০ মার্চ ২০০৭ সালে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০০৫-এর ১৭ আগষ্টের দেশ কাঁপানো ৬৩ জেলায় ৪ শতাধিক সিরিজ বোমা হামলায় একজন নিহত হবার ঘটনার জন্য ভারতকে দায়ী করেন তৎকালীন বাংলাদেশ রাইফেলস-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধূরী। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত "ইন্দো-বাংলা সীমান্ত সমন্বয় "শীর্ষক ৩ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এক কনফারেন্সে ঢাকার প্রতিনিধিত্ব করার সময় তিনি এই ঘটনায় ভারতের সংশ্লিষ্টতা থাকার অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, এই ঘটনার বোমা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ভারতের। তিনি বলেন, আমাদের তদন্তে তা প্রকাশ পেয়েছে। আপনারাই এর জন্য দায়ী। জেনারেল চৌধুরী বলেন, ভারতীয় দুর্বৃত্তরা সীমান্ত পার হয়ে এসে দেশব্যাপী এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে। যদিও এই মন্তব্যকে ভিত্তিহীন এবং মানহানিকর উল্লেখ করে ভারতীয় মুখপাত্র জানান, এতে নয়াদিল্লী খুবই মর্মাহত এবং দুঃখিত। মুখপাত্র জানান, বিডিআর এবং বিএসএফ এর মধ্যে গঠনমূলক আলোচনার পর এই ধরনের বক্তব্য দুঃখজনক।

কেষ্ট ব্যাটাই চোরঃ বাংলাদেশে উগ্রপন্থা দমনে চারদলীয় জোট সরকারের আমলে এতোটুকুও ছাড় দেয়া হয়নি। মহাজোটপন্থীরা বরাবর এই জঙ্গী তৎপরতার সঙ্গে বিশেষ করে জামায়াত-শিবিরকে জড়িত করার যে কোন প্রকারে চেষ্টা করে যাচ্ছে। অথচ আজ অবধি এর কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। কোন জঙ্গী গ্রেফতার হলে তার মুখ দিয়ে কখনো এধরনের বক্তব্য বের হয়নি। তাদের নাম দিয়ে আইন-শৃংখলা বাহিনী যা বলছে সেটাই মিডিয়ায় আসছে। কিন্তু সরাসরি জঙ্গীদের কোনো বক্তব্য প্রচার পাচ্ছে না।

অন্যদিকে, দেশের ইসলামী দলসমূহকে জঙ্গীবাদ উত্থানের জন্য দায়ী করার চেষ্টা করা হয়। বলা হয়ে থাকে, মৌলবাদী ইসলামই এজন্য দায়ী। আরো বলা হয়ে থাকে, আটককৃতদের কারো কারো অতীতে জামায়াত-শিবিরের যোগাযোগ পাওয়া গেছে। এর জবাবে একজন বিশ্লেষক উল্লেখ করেন, এসব ব্যক্তি যদি জামায়াত-শিবিরের সঙ্গে অতীতে যুক্ত থেকেই থাকে তবে তারা এই সংগঠনকে তাদের পছন্দের উগ্রবাদিতা কিংবা জঙ্গীবাদের দিকে নিয়ে যেতে না পেরেই তা ছেড়ে গেছে। এর ফলে জামায়াত-শিবিরও উগ্রবাদ, জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ মুক্ত থাকার সুযোগ পেয়েছে। আর এর বিপরীতে জামায়াত-শিবির একটি ঐতিহ্যবাহী গণতান্ত্রিক সংগঠন হিসেবেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। অপরদিকে এই পাল্টা প্রশ্ন উঠছে, তাহলে দেশে সর্বহারা, চরমপন্থী, গণবাহিনী, শান্তিবাহিনী প্রভৃতি নামের ধর্মনিরপেক্ষ-বামপন্থী-সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর দায় কি মহাজোট সরকার নিতে রাজি আছে? কেননা এরা ধর্মনিরপেক্ষ ও বামপন্থী আদর্শ চর্চার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে। এসব সংগঠনের সাবেক অনেক নেতাই এখন মহাজোট সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী অবস্থান গ্রহণ করেছেন।

একটি পর্যবেক্ষণ: বাংলাদেশের এই সব জঙ্গীদের তৈরি প্রক্রিয়ার সাথে আন্তর্জাতিক শক্তি জড়িত রয়েছে বলে দেশের একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা গত সোমবার একটি পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছে। তাদের মতে, বিশেষ প্রক্রিয়ায় মুসলিম তরুণ ও যুবকদের মানসপটে আমেরিকা-ভারত প্রভৃতি অমুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম বিরোধী ভূমিকার বিষয় তুলে ধরে তাদের মনমানসিকতায় প্রতিবাদী চেতনা গড়ে তোলা হয়। নিউইয়র্কে যেমন বাংলাদেশী তরুণ নাফিসকে ধ্বংসাত্মক কাজে উদ্বুদ্ধ করে তারপর তাকে হাতেনাতে ধরা হয়, ঠিক একই কায়দায় অদৃশ্য আন্তর্জাতিক শক্তি এইসব জঙ্গীদেরও একই কায়দায় একটি বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত অগ্রসর করিয়ে তারপর তারাই বিশেষ মারফতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ধরিয়ে দেয়। আন্তর্জাতিক এই চক্রটির কাছে দেশের অভ্যন্তরে সক্রিয় সকল জঙ্গীদের অবস্থান স্পষ্ট আছে। ফলে ইচ্ছা করলেও তথাকথিত জঙ্গীরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকতে পারে না। বাংলাদেশকে একটি মৌলবাদী জঙ্গী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত করে দৃশ্যমান বা অদৃশ্য আগ্রাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়। প্রয়োজন মাফিক এইসব জঙ্গিদের লালন পালন তথা প্রশিক্ষণ দিয়ে অবশেষে নাশকতার ছক বাস্তবায়ন বা প্রয়োজনে তাদের অবস্থান আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে জানিয়ে দিয়ে ধরিয়ে দেয়া হয়। জঙ্গী সংগঠনগুলোর জটিল স্তর বিন্যাসের জন্যও জঙ্গীরা নিজেরা যেমন নিজের প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারেনা তেমনি যখন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তখন তারা তেমন কিছুই বলতে পারে না।

(২৮ আগষ্ট, ২০১৩ দৈনিক সংগ্রাম)

ব্যাখ্যা : এটি জামায়াতের মুখপাত্র বলে পরিচিত দৈনিক সংগ্রাম এর একটি বিশেষ রিপোর্ট। রিপোর্টে বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ বিকাশে বিভিন্ন সময়ে জামায়াতে ইসলামী ও তাদের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরকে জড়িয়ে যে খবরাখবরগুলো প্রকাশিত হতো, মূলত: এ রিপোর্টে সে তথ্যগুলো খন্ডনের চেষ্টা করা হয়েছে। তথ্য উপাত্ত দিয়ে পরে একটি পর্যালোচনা সংযুক্ত করা হয়েছে। গণমাধ্যমের একপেশে রিপোর্টকে দায়ী করে আন্তর্জাতিক চক্রান্তকে জঙ্গীবাদ প্রসারের কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে রিপোর্টে।

রোহিঙ্গা জঙ্গীদের আঁতুড় ঘরে পরিণত হচ্ছে বাংলাদেশ:

(নতুনদিন, ২৯ *জুলাই;* ২০১৩)

ভয়ঙ্কর রুপ লাভ করছে রোহিঙ্গাদের জঙ্গীবাদ। আর, রোহিঙ্গা জঙ্গীবাদের আঁতুড় ঘরে পরিণত হচ্ছে বাংলাদেশ। ইতোমধ্যে,বাংলাদেশের একাধিক ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও পাকিস্তানের একাধিক চরমপন্থী সংগঠন রোহিঙ্গাদের সন্ত্রাসবাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতায় রোহিঙ্গাদের সহিংসতার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গোয়েন্দা নজরদারির আড়ালেই চলছে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ব্যবহার।

চলতি বছরের মার্চ মাসে বাংলাদেশের আইন শৃংখলা বাহিনী জঙ্গীবাদের পৃষ্টপোষকতার দায়ে আটক করে রোহিঙ্গা জঙ্গী নেতা হাফেজ সালাউল ইসলামকে। তার বিরুদ্ধে নিজের মাদ্রাসায় জঙ্গীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে গত ২৮ জুলাই রোহিঙ্গা জঙ্গী সালাউল ইসলাম আবারো কার্যক্রম শুরু করেছেন। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে রোহিঙ্গাদের মধ্যে ত্রাণ ও টাকা বিতরণ করেন এ নেতা।

মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গারা বাংলাদেশসহ বিশ্বের কয়েকটি মুসলিম দেশে আশ্রয় নিয়েছে। বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের সংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক। বিশাল এই রোহিঙ্গা শরণার্থীদের একটি অংশ জড়িয়ে পড়েছে অপরাধ জগতের সাথে। এর বাইরে রোহিঙ্গাদের একটি অংশ জঙ্গীবাদের সাথে জড়িয়ে পড়ছে।

বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গারা জঙ্গীবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে বলে মনে করা হচ্ছে। মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রীও সম্প্রতি রোহিঙ্গাদের জঙ্গীবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ার বিষয়ে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীকে সতর্ক থাকার আহবান

জানান। তার মতে, রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করতে না পারলে, মুসলিম এই সম্প্রদায়টি বেছে নিতে পারে জঙ্গীবাদের পথ। মালয়েশিয়াসহ ইসলামিক দেশগুলোতে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গারা খুব সহজেই বিভিন্ন ইসলামী চরমপন্থী দলের সাথে যুক্ত হয়ে যেতে পারে বলেই তার অভিমত।

রোহিঙ্গারা খুব সহজেই চরমপন্থীদের টার্গেটে পরিণত হচ্ছে। তাদের অত্যাচারিত ইতিহাস খুব সহজেই রোহিঙ্গাদের এই পথে টেনে আনবে। আর এই ক্ষেত্রে রোহিঙ্গাদের আঁতুড় ঘর হয়ে উঠতে পারে বাংলাদেশ। রোহিঙ্গাদের সবচেয়ে বড় শরণার্থী শিবির বাংলাদেশে অবস্থিত। রোহিঙ্গাদের অনেকে এরই মধ্যে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভ করে বিভিন্ন দেশে গিয়ে জড়িয়ে পড়ছে অপরাধের সাথে। এছাড়া কক্সবাজার ও এর পাশ্ববর্তী এলাকায় রোহিঙ্গারা বিভিন্ন অপরাধ কর্মের সাথে জড়িত।

অনেকেই মনে করেন, বাংলাদেশে বসবাস করা রোহিঙ্গাদের একটি বড় অংশই জঙ্গীবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আর এই কাজে রোহিঙ্গাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে হাফেজ সালাউল ইসলামসহ অন্যান্য রোহিঙ্গা নেতারা।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি জঙ্গী গোষ্ঠী তাদের কার্যক্রম জোরদার করছে বলেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। হেফাজতে ইসলামসহ অন্যান্য ইসলামিক দলগুলো দেশে নাশকতা তৈরির জন্য ব্যবহার করছে রোহিঙ্গাদের। হেফাজতের লংমার্চে রোহিঙ্গারা নাশকতা করতে পারে ,এমন সন্দেহ ছিল আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর। যে কারণে লংমার্চে অংশ নিয়ে যাওয়ার পথে ৫ শত রোহিঙ্গাকে আটক করে পুলিশ। পুলিশের অভিযোগ ছিল, এরা লংমার্চের সময় ঢাকায় নাশকতা সৃষ্টি করবে। মিয়ানমারে রোহিঙ্গারা প্রতিনিয়ত বৌদ্ধ ও সরকার বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়ে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। নির্যাতিত এই রোহিঙ্গারা নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বেছে নিতে পারে জঙ্গীবাদের মত চরম পথ। আর বিপথগামী রোহিঙ্গাদের অস্ত্র ও আর্থিক সাহায্য করতে পারে বিভিন্ন জঙ্গী গোষ্ঠী। যারা মুসলিম বিশ্বের অধিকার আদায়ের নামে দেশে দেশে চালাচ্ছে সন্ত্রাস ও বোমাবাজি। আর জঙ্গীদের প্রধান টার্গেট হতে পারে বাংলাদেশে থাকা রোহিঙ্গারা। রোহিঙ্গাদের ক্রমেই অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়া ও বিভিন্ন জঙ্গীগোষ্ঠীর তৎপরতার ফলে এটা বলাই যায়, বাংলাদেশ ক্রমেই রোহিঙ্গা জঙ্গীদের জন্য আঁতুড় ঘর হতে।

ব্যাখ্যা : এ প্রতিবেদনটি ২৯ জুলাই একটি অনলাইন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।এ রিপোর্টে বাংলাদেশের কক্সবাজার সহ কিছু এলাকায় মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বসবাস ও তাদের কর্মকান্ডের প্রতি সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যেহেতু রোহিঙ্গাদের একটি বড় অংশ বাংলাদেশে অমানবিক ভাবে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছে। তারা যেহেতু তাদের নিজ দেশেই নির্যাতনের শিকার ,সেহেতু একসময় তারা বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের মতো চরমপন্থার দিকে ধাবিত হবে বলে আশংকা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে তাদের কর্মকান্ড বেশি সক্রিয় হবে বলেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

<u>বিশ্বেজুড়েই জঙ্গীদের অর্থ জোগায় মধ্যপ্রাচ্যের দাতা সংগঠনগুলো:</u>

(নতুনদিন, ২২ জুলাই; ২০১৩)

মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক ওয়াহাবি ও সালাফী গ্রুপগুলো সারাবিশ্বের ইসলামী চরমপন্থীদের অর্থায়ন করে আসছে অনেক দিন ধরেই। মূলত, বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের নামে বেসরকারি উদ্যোগে এ অর্থায়ন করা হচ্ছে। ফলে, মধ্যপ্রাচ্য থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জঙ্গী অর্থায়ন বন্ধ করা কঠিন হয়ে পড়ছে। অভিযোগ আছে, মধ্যপ্রাচ্যের সরকারগুলোও জঙ্গী অর্থায়নের ব্যাপারে উদাসীনতা দেখিয়ে আসছে। মূলত: ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীরা পরস্পরের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্যই জঙ্গী অর্থায়ন করে থাকে। যেমনঃ সৌদি আরব থেকে সুন্নী মতাবলম্বী চরমপন্থীদের জন্য অর্থায়ন করা হয়, এর বিপরীতে ইরান শিয়া মতাবলম্বী চরমপন্থী গ্রুপগুলোকে অর্থায়ন করে।

Dhaka University Institutional Repository

ইউরোপীয় ইউনিয়নের পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অর্থায়ন করে। এছাড়াও টেলিভিশন অনুষ্ঠানে ধর্ম প্রচার করেও অর্থ জোগাড় করে সালাফীরা। শুধু অর্থজোগাড় নয়, চরমপন্থীদের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর কৌশল হিসেবেও এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করা হয়। টেলিভিশন অনুষ্ঠান ছাড়াও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকেও সালাফী মতাদর্শের প্রচার ও সাধারণ মুসলমানদের চরমপন্থায় উৎসাহিত করতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওই প্রতিবেদনে ইসলামী সন্ত্রাসবাদে সামাজিক যোগাযোগ সাইটের ব্যবহারের উদাহরণ হিসেবে কুয়েতের ধর্মপ্রচারক শেখ হাজ্জাজ বিন হাজামীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কুয়েতের এ ধর্মপ্রচারক অর্থ সংগ্রহ করার জন্য তার টুইটার একাউন্ট ব্যবহার করেন। তিনি চরমপন্থীদের অর্থায়নের জন্য দাতাদের উৎসাহিত করেন। এছাড়া, কোথায়, কিভাবে অর্থ জমা দিতে হবে তা নিয়েও পরামর্শ দেন।
চলতি মাসে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পৃথিবীর কোন মুসলিম দেশ ওয়াহাবী ও সালাফীগ্রুপগুলোর আওতামুক্ত নয়। এ গ্রুপগুলোর লক্ষ্য থাকে, সন্ত্রাসীদের অর্থায়ন করে প্রতিপক্ষের ওপর নিয়ন্ত্রণ বাড়ানো। মধ্যপ্রাচ্যের এই গ্রুপগুলো সারাবিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে চরমপন্থী ইসলামী ভাবাদর্শ বিস্তারের লক্ষ্যে অর্থায়ন করে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, সিরিয়া, মালি, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ইত্যাদি। অর্থায়নের প্রাথমিক উদ্দেশ্য থাকে, ইসলামের ভিন্ন মতামতগুলোর টুটি চেপে ধরা। এছাড়া, নিজস্ব মতাদর্শের প্রাধান্য নিশ্চিত করা। এভাবে নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ নিতে গিয়ে সন্ত্রাসের পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো। তবে, শুধু উন্নয়নশীল বিশ্বই নয়, মধ্যপ্রাচ্যর ওহাবী ও সালাফীরা ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার সন্ত্রাসীগ্রুপগুলোকেও অর্থায়ন করে।

পশ্চিমা দেশগুলোসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সবসময়ই মধ্যপ্রাচ্যে থেকে দাতব্য কাজের জন্য অর্থায়নকে ইতিবাচকভাবে দেখা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে চরমপন্থাবলম্বন তীব্র আকার ধারণ করার প্রেক্ষিতে নতুন করে ভাবছে ইউরোপ। তবে, এর আগেও সন্ত্রাসবাদে সৌদি অর্থায়ন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ২০০৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র বিভাগ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, সৌদি দাতাগোষ্ঠীগুলো নব্বইয়ের দশক থেকেই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সন্ত্রাসীদের অর্থায়ন করছে। সৌদি দাতাগোষ্ঠীর সন্ত্রাসী অর্থায়ন নিয়ে প্রতিবেদন ফাঁস করেছে উইকিলিকসও। উইকিলিকসের ওই প্রতিবেদনে দেখা যায়, সৌদি আরব থেকে প্রতিবছর কমপক্ষে ১০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার সারবিশ্বের দেওবন্দী ও আহলে হাদিসপন্থী চরমপন্থীদের দেওয়া হয়।

সৌদি আরব সত্তরের দশক থেকে পাকিস্তানে জঙ্গী অর্থায়ন শুরু করে। পাকিস্তানে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই পাকিস্তান মধ্যপ্রাচ্য থেকে জঙ্গীবাদের জন্য অর্থায়ন করা হয়। ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর আন্তর্জাতিক রাজনীতিও এই জঙ্গী অর্থায়নে প্রভাব ফেলছে। সৌদি আরব থেকে সুন্নী মতাবলম্বী চরমপন্থীদের জন্য অর্থায়ন হয়। এর বিপরীতে শিয়া মতাবলম্বীদের জন্য অর্থায়ন বাড়িয়ে দেয় ইরান। ফলে উভয় দিক থেকে চরমপন্থী গ্রুপগুলোর শক্তি-সামর্থ্য বেড়েই যাচ্ছে দিনের পর দিন।

ব্যাখ্যা : নতুনদিন নামের একটি অনলাইন পত্রিকায় এ সংবাদটি জুলাই মাসের ২২তারিখে প্রকাশিত হয়। এতে ধর্মীয় কাজে অনুদান বা সামাজিক কার্য সম্পাদনের নামে সৌদিআরব থেকে পাকিস্তানে প্রতিবছর বেশকিছু অর্থ দেয়া হয় সুন্নী মতাবলম্বীদের। আবার ইরান থেকে শিয়া গোত্রের লোকদের অর্থ দেয়া হয়। এতে বলা হয়, অর্থ পেয়ে এদের শক্তি-সামর্থ্য দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে সাংগঠনিক কাজের নামে অনেক অর্থ অনুদান পায় এসব গোষ্ঠী যা একটা সময়ে তারা তাদের মতাদর্শ বাস্তবায়নের পিছনে ব্যয় করে।

Dhaka University Institutional Repository

উর্বর দিনের আশায় জঙ্গীরা:

(*রাইজিংবিডি২৪.কম,১ সেপ্টেম্বর;২০১৩*)

আন্তর্জাতিক জঙ্গী সংগঠন আল কায়েদার অনুসারি দাবিদার আনসারউল্লাহ বাংলা টিম এবং বিইএম নতুন উদ্যমে শুরু করেছে তাদের তৎপরতা। তাদের এই উৎসাহে যোগান দিচ্ছে সেনাবাহিনী থেকে চাকরিচ্যুত মেজর জিয়া। এছাড়া গত ৫ মে মতিঝিলে হেফাজতের সমাবেশ দেখে তারা ভেবেছিলেন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের পতন ঘটা শুধু সময়ের ব্যাপার। এই সরকারের পতন ঘটলেই সম্ভব দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা।

ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখায় জিজ্ঞাসাবাদকালে এসব চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন আনসারউল্লাহ বাংলা টিমের প্রধান মাওলানা জসীম উদ্দিন।

তিনি পুলিশের কাছে স্বীকার করেন, শায়খ আব্দুর রহমান ও বাংলা ভাই যেভাবে দেশজুড়ে বোমা ফাটিয়ে জেএমবির শক্ত অবস্থান জানান দিয়েছিল, সেভাবেই প্রস্তুতি নিয়ে এগুতে থাকে আনসারউল্লাহ বাংলা টিম।

গোয়েন্দা শাখার একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জসীম উদ্দিনের স্বীকারোক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে রাইজিংবিডিকে জানান, সাম্প্রতিক কয়েকটি অভিযানে প্রায় ৬৫ ক্যাডার গোয়েন্দা জালে আটকা পড়ে। এর পর এই দুটি উগ্র মৌলবাদী জঙ্গী সংগঠনের ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনার অনেক কিছুই ফাঁস হয়ে গেছে।

ওই গোয়েন্দা কর্মকর্তা আরো জানান, আনসারউল্লাহ বাংলা টিমের প্রধান জসীম উদ্দিন বরগুনায় গ্রেফতার হবার পর এই জঙ্গী সংগঠনের ভয়াবহতা টের পায় আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জসীম উদ্দিন জানান, তারা আল কায়েদার আদর্শ ও কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে শরীয়া ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এজন্যে দেশজুড়ে ক্যাডার সংগ্রহ করতে চলছে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ। গোয়েন্দা কর্মকর্তারা আরো জানান, সেনা অভ্যুত্থান চেষ্টার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আলোচনায় আসা চাকরিচ্যুত মেজর সৈয়দ জিয়াউল হক প্রাথমিকভাবে বিদেশে পালিয়ে নিজেকে রক্ষা করলেও তিনি আবার ফিরে এসেছেন দেশে। এবং এসব জঙ্গী সংগঠনগুলোর সঙ্গে মিশে হামলার ছক তৈরি করছেন তিনি।

ব্যাখ্যা: এ সংবাদটি ২০১৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর অনলাইন রাইজিংবিডি২৪.কমে প্রকাশিত হয়েছে।এখানে সাম্প্রতিক সময়ে উত্তরাঞ্চলে আনসারউল্লাহ বাংলা টিম নামে নতুন জঙ্গী সংগঠনের সন্ধান পাওয়ার দাবি করেছে র‍্যাব। সেনাবাহিনীর চাকুরীচ্যুত এক কর্মকর্তা এর সামরিক উপদেষ্টা বলে জানিয়েছে গ্রেফতারকৃত জসিম। এখন এ অভিযোগটি কতখানি সত্য তা তদন্ত করে গণমাধ্যমে এলে ভালো হতো।

জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে সমন্বিত উদ্যোগ চাই:

(কালের কণ্ঠ, ৩ সেপ্টেম্বর; ২০১৩)

সাংবাদিক ও কলামিস্ট হারুন হাবীব ৩রা সেপ্টেম্বর কালের কণ্ঠ পত্রিকায় মুক্তধারায় উপমহাদেশে"জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে সমন্বিত উদ্যোগ চাই" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। কলামের শেষের দিকে তিনি লিখেছেন,দক্ষিণ এশিয়ার নানা দেশে কমবেশি জঙ্গীবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে এর বিস্তার ইতোমধ্যেই ভয়ংকর রুপ ধারণ করেছে। প্রায় প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে চলেছে এই দুই রাষ্ট্রের জনজীবন। ভারতকেও কমবেশি জঙ্গীবাদ আক্রান্ত করে চলেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে ঐতিহ্যগত এবং ইতিহাসগত কারণেই জঙ্গীবাদ ভয়ংকর রুপ ধারণ করতে পারেনি এখনো। কিন্তু জনজীবনকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে চলেছে তাদের তৎপরতা। সুষ্ঠু পদক্ষেপে যদি প্রতিরোধ করা না হয়, তাহলে দেশটির জন্য জঙ্গীরা বড় হুমকির কারণ হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

মাত্রার হেরফের যা-ই হোক না কেন, উপমহাদেশের সমাজে জঙ্গীবাদ বহু বছর ধরেই একটি উদ্বেগ ও আলোচিত বিষয়। লাগোয়া সীমান্তবর্তী এই তিনদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির নৈকট্যও কম নেই। কাজেই জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সার্থকভাবে লড়তে অবশ্যই সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রয়োজন একদিকে আঞ্চলিক সহযোগিতা, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সমন্বয়। এ লক্ষ্যে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়টি অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

একটি কথা মনে রাখা উচিত যে, "এ ধরনের অপরাধী ও সন্ত্রাসীদের ভূখন্ডগত বা রাষ্ট্রগত সীমাবদ্ধতা নেই। কাজেই সন্ত্রাসবাদকে ঠেকাতে হলে প্রতিটি রাষ্ট্রকেই সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে উঠতে হবে, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে"

ব্যাখ্যা: নিবন্ধটি ৩ রা সেপ্টেম্বর কালের কণ্ঠ পত্রিকায় মত ও মন্তব্য হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে লেখক হারুন হাবীব যথার্থই বলেছেন, জঙ্গীবাদের বিষয়ে সাধারণভাবে না দেখে সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে উঠে প্রতিটি রাষ্ট্রকে সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার পরিচয় দিয়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ নির্মূলে এগিয়ে আসতে হবে।

দুর্ধর্ষ তিন জঙ্গী ছিনতাই:

(বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৪ ফেব্রুয়ারি; ২০১৪)

গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগার থেকে প্রিজনভ্যানে করে জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের (জেএমবি) মৃত্যুদণ্ড ও যাবজ্জীবনপ্রাপ্ত তিন আসামিকে ময়মনসিংহ আদালতে আনার পথে নিষিদ্ধ সংগঠনটির সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা পুলিশের ওপর বোমা হামলা ও গুলি চালিয়ে ফিল্মি স্টাইলে ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ত্রিশালের সাইনবোর্ড নামক এলাকায় গতকাল সকাল ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ছিনতাইকৃত মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দুই আসামি হচ্ছেন সালাউদ্দিন সালেহীন ওরফে সানি ও রাকিব হাসান এবং যাবজ্জীবনপ্রাপ্ত বোমা মিজান ওরফে বোমারু মিজান। এ সময় জেএমবি সন্ত্রাসীদের গুলিতে ঘটনাস্থলেই মারা যান গাজীপুর পুলিশের কনস্টেবল আতিকুর রহমান ওরফে আতিক। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন এসআই হাবিবুর রহমান (৫০) ও কনস্টেবল সোহেল রানা (২৫)। এ সময় জেএমবির সশস্ত্র ক্যাডাররা মুখে কালো কাপড় বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। পরে রাকিব হাসানকে টাঙ্গাইলের সখিপুর থেকে পুলিশ ও র‍্যাব যৌথ অভিযান চালিয়ে আটক করেছে।

এ ঘটনায় গাজীপুর, ময়মনসিংহসহ আশপাশের জেলাগুলোতে রেড অ্যালার্ট জারি করে পুলিশ প্রশাসন। ময়মনসিংহ-ঢাকা মহাসড়কের ময়মনসিংহ অংশের চারটি পয়েন্টে র‍্যাব ও পুলিশের চারটি চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। ঘটনার পরপরই চিরুনি অভিযানে টাঙ্গাইলের সখিপুর থেকে একটি মাইক্রোবাসসহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ সময় একটি পিস্তল ও গুলিসহ কয়েকটি বোমা উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলো মাইক্রোবাস-চালক জাকারিয়া, জঙ্গীচক্রের দুই সদস্য ময়মনসিংহ মুক্তাগাছা উপজেলার রায়হান (৩০) ও গাজীপুরের সখিপুরের রাসেল (৩৫)। ময়মনসিংহ পুলিশ ও গাজীপুরের কাশিমপুর কারা কর্তৃপক্ষ সূত্র জানায়, রবিবার সকালে কাশিমপুর-১ কারাগার থেকে জেএমবির সালেহীন ওরফে সানি, কাশিমপুর-২ কারাগার থেকে বোমা মিজান এবং কাশিমপুর-৩ হাই সিকিউরিটি কারাগার থেকে রাকিব হাসানকে ময়মনসিংহে আনার উদ্দেশ্যে প্রিজনভ্যানে তোলা হয়। তাদের মুক্তাগাছা থানার রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা ১৬/০৩/২০০৬ ও কোতোয়ালি থানার ০৭/১২/০২ তারিখে সিরিজ বোমা হামলাসহ পাঁচটি মামলায় হাজিরা দিতে ময়মনসিংহ আদালতে আনা হচ্ছিল। এদিকে দুপুর ২টার দিকে ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি এস এম মাহফুজুল হক নুরুজ্জামান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দুই পুলিশ সদস্যকে দেখতে যান। যাওয়ার আগে

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনাস্থল ত্রিশালের সাইনবোর্ড এলাকায় তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'সাধারণত এ ধরনের আসামিকে মুভমেন্ট করানোর সময় কারা কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট পুলিশকে অবহিত করে।

কিন্তু ময়মনসিংহ পুলিশের এসপি জানিয়েছেন, তাকে এ বিষয়টি অবহিত করা হয়নি।' তিনি বলেন, 'ইতোমধ্যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি। কারও কোনো গাফিলতি থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আসামি ধরার ব্যাপারে সব রকম চেষ্টা অব্যাহত আছে।' তিনি নিহত পুলিশ কনস্টেবল পরিবারকে এক লাখ টাকা ও আহতদের সর্বোচ্চ সেবা প্রদানের কথা জানান। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সকালে গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগার থেকে ময়মনসিংহ আদালতের উদ্দেশ্যে জেএমবির মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি সালেহীন ওরফে সানি ও রাকিব হাসান এবং যাবজ্জীবনপ্রাপ্ত বোমারু মিজানকে আনা হচ্ছিল। এ সময় প্রিজনভ্যানে এক এসআই হাবিবুর রহমান, দুই কনস্টেবল আতিক ও সোহেল রানা এবং চালক সবুজ ছিলেন। তবে প্রিজনভ্যানের আগে-পিছে কোনো প্রটেকশন ছিল না। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে প্রিজনভ্যানটি ত্রিশাল উপজেলার সাইনবোর্ড নামক স্থানে পৌছালে সামনে থাকা একটি ট্রাক গতি কমিয়ে দেয়। প্রিজনভ্যানটি এ সময় গতি কমাতে বাধ্য হলে এর সামনে-পেছনে থাকা সাদা ও কালো রঙের দুটি মাইক্রোবাস ও একটি প্রাইভেটকার থেকে কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা ১৫-২০ জন জঙ্গি কমান্ডো স্টাইলে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি শুরু করে। এ সময় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকেন এসআই হাবিবুর রহমান, কনস্টেবল সাহেল রানা ও আতিক। পরে চালক সবুজের কাছ থেকে চাবি নিয়ে প্রিজনভ্যানের তালা ভেঙে আসামিদের ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা। ঘটনার সময় ককটেল বিস্ফোরণ ও উপর্যুপরি গুলির শব্দে আশপাশের দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায় এবং আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর স্থানীয় জনতা রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থল থেকে গুলিবিদ্ধ কনস্টেবল আতিকের লাশ উদ্ধার করে এবং গুরুতর আহত এসআই হাবিবুর রহমানকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ও কনস্টেবল সোহেল রানাকে প্রথমে ত্রিশাল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যাওয়ার পরে অবস্থার অবনতি হলে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। চালক সবুজ জানান, প্রিজনভ্যানের সামনে একটি ট্রাক ছিল এবং পেছনে দুটি মাইক্রোবাস ও একটি প্রাইভেটকার ছিল। ট্রাকটি সামনে থেকে প্রিজনভ্যানের গতিরোধ করলে পেছন থেকে কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা ১৫-২০ জন দুর্বৃত্ত ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি শুরু করে।

এসআই হাবিবুর রহমান বলেন, 'সন্ত্রাসীরা প্রিজনভ্যানের সামনে এলাপাতাড়ি গুলি ও বোমাবাজি করলে আমি গুলিবিদ্ধ হই। পরে সন্ত্রাসীরা চালক সবুজের কাছ থেকে ভ্যানের চাবি নিয়ে আসামিদের ছিনিয়ে নিয়ে যায়।' এরপর কী হয়েছে কিছুই বলতে পারেননি তিনি। এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় ইউপি মেম্বার শাজাহান বলেন, 'সাইনবোর্ড এলাকায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। জঙ্গীরা ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি করে আসামিদের ছিনিয়ে কালো রঙের একটি মাইক্রোবাস ঢাকার দিকে এবং অপর একটি মাইক্রোবাসে ময়মনসিংহের দিকে চলে যায়। খবর পেয়ে ময়মনসিংহের পুলিশ সুপার মঈনুল হক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হারুন-অর-রশিদ হাসপাতালে ছুটে যান এবং ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, একটি ট্রাক সামনে থেকে প্রথমে ভ্যানটিকে ব্যারিকেড দেয়। পরে কালো কাপড়ে মুখ বাঁধা কয়েকজন সন্ত্রাসী ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি করে। টাঙ্গাইলের সখিপুর থেকে পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বেলা ১১টার দিকে কালো রঙের মাইক্রোবাসটি (ঢাকা মেট্রো-চ ১১-৬০৪৮) সাগরদীঘি-সখিপুর সড়কে পালানোর সময় সখিপুর থানার সামনে পৌছালে পুলিশ ও জনতা গাড়িটির গতি রোধ করতে ব্যর্থ হয়। পরে তারা গাড়িটির পিছু নেয়। অবস্থা বেগতিক দেখে ঢাকা-সখিপুর সড়কের প্রশিকা এলাকায় গাড়িটি রেখে আসামিরা পালিয়ে যায়। এ সময় স্থানীয় জনতা গাড়ির চালক জাকারিয়াকে (২৫) আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। এ সময় পুলিশ গাড়ি থেকে দুই রাউন্ড গুলি, একটি পিস্তল, চারটি মোবাইল সেট ও রড কার্টারসহ বেশ কয়েকটি তাজা বোমা উদ্ধার করে। এরপর সখিপুরের তক্তাখলা বাজার

Dhaka University Institutional Repository

এলাকা থেকে জঙ্গিচক্রের দুই সদস্য ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলার রায়হান (৩০) ও গাজীপুরের সখিপুরের রাসেলকে (৩৫) আটক করে। পালিয়ে যাওয়া জঙ্গিদের ধরতে পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবির সদস্যরা সখিপুর ও আশপাশ এলাকায় চিরুনি অভিযান চালাচ্ছে।

কাশিমপুরের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার পার্ট-১-এর জেলার আবদুল কুদ্দুস জানান, পার্ট-১-এর হাজতি সালাউদ্দিন সালেহীন ওরফে সানিকে ২০১০ সালে কাশিমপুর কারাগারে আনা হয়। সানি জেএমবির শূরা সদস্য। তার বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন থানায় ৪০টি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি মামলায় তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ রয়েছে। তিনি নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানার ৫৮ সেন রোড এলাকার রফিকুল ইসলামের ছেলে। কাশিমপুরের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার পার্ট-২-এর সুপার মো. জাহাঙ্গীর কবির জানান, হাজতি বোমারু মিজান জামালপুর সদরের শেখের ভিটা এলাকার সুজা মিয়ার ছেলে। তার বিরুদ্ধে ১৯টি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে সাজা হয়েছে পাঁচটি মামলায়। এর একটিতে যাবজ্জীবন হয়েছে। কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারের সুপার আবদুর রাজ্জাক জানান, রাকিবুল হাসানের বিরুদ্ধে ৩০টি মামলা রয়েছে। একটি মামলায় তার ফাঁসি, তিনটিতে যাবজ্জীবন, একটিতে ১৪ বছর, একটিতে সাত বছরের দণ্ড হয়েছে। তিনি জামালপুরের মেলান্দহ থানার বংশীবাড়ী গ্রামের আ. সোবাহানের ছেলে।

জড়িতরা অচিরেই গ্রেফতার হবে: পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) হাসান মাহমুদ খন্দকার বলেছেন, দেশে জঙ্গী তৎপরতা এখনো বন্ধ হয়নি। তবে তা নিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী উদ্বিগ্ন নয়। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আল-কায়েদার হুমকি নিয়েও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিচলিত নয়। যে কোনো হুমকি মোকাবিলায় পুলিশ প্রস্তুত রয়েছে। গতকাল টি-২০ বিশ্বকাপের ভেন্যু সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়াম পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন আইজিপি। তিনি বলেন, প্রিজনভ্যানে বোমা মেরে দণ্ডপ্রাপ্ত জেএমবির তিন জঙ্গী ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা অনভিপ্রেত। এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে এবং অচিরেই তাদের গ্রেফতার করা হবে। এ সময় তার সঙ্গে র‍্যাবের মহাপরিচালক মোখলেছুর রহমানও ছিলেন।

পুলিশ বরখাস্ত: প্রিজনভ্যান থেকে আসামি ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় এক পুলিশকে সাময়িক বরখাস্ত এবং অপরজনকে ক্লোজড করা হয়েছে। গাজীপুরের পুলিশ সুপার মো. আবদুল বাতেন জানান, দায়িত্বে অবহেলার জন্য গাজীপুর পুলিশ লাইনের রিজার্ভ ইন্সপেক্টর (আর.আই) সাইদুল করিমকে পুলিশ লাইনে ক্লোজড এবং একই পুলিশ লাইনে কর্মরত ফোর্স সুবেদার আবদুল কাদেরকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। এদিকে ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি এসএম মাহফুজুল হক নুরুজ্জামান জানিয়েছেন, ছিনতাই হওয়া বাকি দুই জেএমবি সদস্যকে ধরিয়ে দিতে পারলে প্রতিজনের জন্য ২ লাখ টাকা করে পুরস্কার প্রদান করা হবে। পরে পুরস্কারের পরিমাণ ৫ লাখে উন্নীত করা হয়।

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশে এখনো জঙ্গীরা যে সক্রিয় এ ঘটনার মধ্য দিয়ে আরো একবার সেটি প্রমাণ হয়েছে। দিনে দুপুরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাত থেকে জঙ্গী ছিনিয়ে নেয়ার ঘটনা তাদের দুর্ধর্ষতার পরিচয় বহন করে। এ ঘটনায় পুলিশ নিহত হয়েছে একজন। এ ঘটনা সরকার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে আরো সতর্ক ও দায়িত্বশীল হবার বার্তাই বহন করে। পাশাপাশি এ ঘটনায় আরো কেউ জড়িত কিনা তা খুঁজে বের করাও প্রয়োজন,একইসাথে পুলিশের যারা জড়িত তাদের যথাযথ শাস্তি প্রদান করা প্রয়োজন ।

বন্দুকযুদ্ধে জঙ্গী রাকিব নিহত, বাকিদের ধরতে অভিযান:

(বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৫ ফেব্রুয়ারি; ২০১৪)

প্রিজন ভ্যানে পুলিশ খুন করে কমান্ডো স্টাইলে ছিনিয়ে নেওয়া তিন শীর্ষ জঙ্গীর মধ্যে টাঙ্গাইলের সখীপুর থেকে গ্রেফতার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত রাকিব হাসান ওরফে হাফেজ মাহমুদ রাকিব (৩৫) পুলিশের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন। তবে পলাতক বাকি দুই শীর্ষ জঙ্গীসহ অভিযানে অংশ নেওয়া জঙ্গীদের গ্রেফতারে সারা দেশে চিরুনি

Dhaka University Institutional Repository

অভিযান অব্যাহত রেখেছেন র‍্যাব-পুলিশসহ বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা। জঙ্গি অধ্যুষিত এলাকাগুলোয় অভিযানের কৌশল হিসেবে ছদ্মবেশে অবস্থান নিয়েছেন গোয়েন্দারা। কড়া নজরদারির মধ্যে রাখা হয়েছে অর্ধশতাধিক সন্দেহজনক ব্যক্তি ও সারা দেশের শতাধিক মাদ্রাসা। জেএমবির (জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ) শীর্ষ তিন জঙ্গী জাহিদুল ইসলাম ওরফে বোমারু মিজান, সালাউদ্দীন সালেহীন, রাকিব হাসান ওরফে রাসেল ওরফে হাফেজ মাহমুদকে রবিবার ময়মনসিংহের ত্রিশালে প্রিজন ভ্যানে গুলি চালিয়ে ও বোমা মেরে পুলিশ খুন করে কমান্ডো স্টাইলে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তাদের সহযোগীরা। অন্যদিকে, পলাতক দুই দুর্ধর্ষ জঙ্গিকে ধরিয়ে দিতে সরকারের পক্ষ থেকে ৫ লাখ টাকার স্থলে ১০ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার জাকারিয়া ও রায়হানকে ২০ দিন করে রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। এরই মধ্যে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছে পুলিশ। খুব শীঘ্রই তাদের টিএফআই (টাস্ক ফোর্স ইন্টারোগেশন) সেলে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আজিজ আহমেদ জানান, পলাতক জঙ্গিদের ধরতে সীমান্তে সবগুলো ব্যাটেলিয়ানে বিশেষ নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে অনেকগুলো পেট্রল টিম অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে বিভিন্ন জায়গায় জোড় তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। র‍্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক কর্নেল জিয়াউল আহসান জানান, 'পলাতক এবং গ্রেফতারকৃতরা বহুদিন আগে থেকেই গোপনে ছক এঁকেছিলেন। আর প্রিজন ভ্যানে দুর্ধর্ষ তিন জঙ্গীর অপেক্ষাকৃত দুর্বল নিরাপত্তাব্যবস্থার জন্যই এমনটি হয়েছে। তবে গ্রেফতারকৃতদের টিএফআই সেলে জিজ্ঞাসাবাদ করলে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।'সূত্র জানায়, গত বছরের ৫ মে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে সংগঠিত 'অপারেশন সিকিউর শাপলা'য় অসংখ্য নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়েছে এমন গুজব ছড়িয়ে মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকদের তাদের দলে ভেড়ানোর পাঁয়তারা করেন জঙ্গীদের মদদদাতা কয়েকটি উগ্রপন্থি ইসলামী দলের শীর্ষ নেতারা।

এরই অংশ হিসেবে তারা বোমারু মিজান, সালাউদ্দীন সালেহীনকে প্রাথমিকভাবে কারাগার থেকে বের করার ছক আঁকেন। একই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন কওমি মাদ্রাসায় গিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়া জঙ্গী সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। উগ্রপন্থি এসব জঙ্গী সংগঠনকে আর্থিকভাবে সহায়তাসহ বিভিন্নভাবে মদদ দিচ্ছেন চিহ্নিত কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতা। ঘাঁটি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত শতাধিক মাদ্রাসাকে। জঙ্গী তথা জামায়াত-শিবির অধ্যুষিত এলাকার মাদ্রাসাগুলোতেই জঙ্গীরা আশ্রয় নিতে পারেন।এরই মধ্যে গত বছরের ৮ অক্টোবর চট্টগ্রামের লালখান বাজারের জামিয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়ায় গ্রেনেড বিস্ফোরণের ঘটনার পর ওই মাদ্রাসা থেকে অভিযান চালিয়ে তিনটি তাজা গ্রেনেড, ১৮ বোতল এসিড ও বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়।সূত্র আরও জানায়, জেএমবির বর্তমান আমির সোহেল মাহফুজ বর্তমানে সস্ত্রীক পাশের একটি দেশে অবস্থান করছেন। সেখান থেকেই তিনি সীমান্তবর্তী এলাকায় এসে দেশে অবস্থানরত জঙ্গীদের সঙ্গে মাঝেমধ্যেই কথা বলেন। তার দিকনির্দেশনা অনুযায়ীই বর্তমানে জেএমবির কার্যক্রম চলছে বলে তথ্য রয়েছে গোয়েন্দাদের কাছে। এ জন্য ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট কিংবা এর আশপাশের সীমান্ত দিয়ে পলাতক দুই জঙ্গীর দেশ ছেড়ে পালানোর সম্ভাবনাকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন গোয়েন্দারা। তবে যে কোনো মূল্যে তাদের গ্রেফতার করতে সন্দেহভাজন শতাধিক ব্যক্তিকে কড়া নজরদারির মধ্যে রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রিজন ভ্যানের নিরাপত্তায় দায়িত্বরত পুলিশ টিম এবং কারাগারের কর্মকর্তাদেরও কড়া নজরদারির মধ্যে রাখা হয়েছে। তাদের অতীত কর্মকাণ্ড পর্যালোচনাও করে দেখছেন গোয়েন্দারা।

তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, জেএমবির কমান্ডো অপারেশনে নেতৃত্ব দেন শীর্ষ জঙ্গি ফারুক হোসেন। তিনিই বর্তমানে জেএমবির একটি অংশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তার বাড়ি জামালপুরে। অপারেশনে অংশ নেওয়া তিনটি মাইক্রোবাসের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে দুটি ১৫ দিন আগে ২১ লাখ টাকায় কেনেন জঙ্গিরা। এর মধ্যে দুটি মাইক্রোবাস টাঙ্গাইলের সখীপুর ও ময়মনসিংহের ত্রিশাল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। নিরাপত্তার অংশ হিসেবে মাইক্রোবাসগুলোর চালকও ছিলেন জঙ্গি সদস্য। পাঁচ বছর আগে কারাগার থেকে জঙ্গী ফারুক জামিনে বের হন। ওই সময়ই তিনি রাকিব হাসানের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাকে যে কোনো মূল্যে কারাগার থেকে বের করার। এরই অংশ হিসেবে দুই সপ্তাহ আগে তিনি ঢাকা জেলা আদালত প্রাঙ্গণে রাকিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে একটি মুঠোফোন (সিটিসেল) দেন। ওই মুঠোফোনেই দিনের বিভিন্ন সময় অপারেশনের আগ পর্যন্ত কথোপকথন হয়েছে তাদের মধ্যে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ থেকে অপারেশনে অংশ নেওয়া জঙ্গিরা ময়মনসিংহের ভালুকায় এসে মিলিত হন। পরে জঙ্গি রাকিবের সঙ্গে কয়েকদফা কথা বলে ত্রিশালে গিয়ে অপারেশন সম্পন্ন করেন।টাঙ্গাইলের পুলিশ সুপার (ভারপ্রাপ্ত) হাসিবুল আলম জানান, অপারেশনে অংশ নিয়েছিলেন ১২-১৩ জন জঙ্গী। তাদের প্রত্যেকের কাছে আগে থেকেই পর্যাপ্ত টাকা দিয়ে দেওয়া হয়। বন্দুকযুদ্ধে নিহত রাকিব হাসানের কাছ থেকে ১৪ হাজার ২৫০ এবং গ্রেফতার জাকারিয়ার কাছ থেকে সাড়ে ১২ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

বন্দুকযুদ্ধের ব্যাপারে তিনি বলেন, 'রাকিবের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী রবিবার গভীর রাতে মির্জাপুরের বেলতইল গ্রামে অভিযানে গেলে সশস্ত্র জঙ্গিরা আমাদের ওপর গুলিবর্ষণ করেন। আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি চালালে শুরু হয় বন্দুকযুদ্ধ। একপর্যায়ে জঙ্গিরা পিছু হটেন। তবে এরই মধ্যে জঙ্গিদের গুলিতে গুরুতর আহত হন রাকিব। তৎক্ষণাৎ তাকে মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।' ঘটনাস্থল থেকে একটি শাটারগান উদ্ধার করা হয় বলে জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, ২০০৬ সালের ৬ মার্চ র‍্যাবের একটি দল ময়মনসিংহ জেলা শহরের ৪৫ কিলোমিটার দূরের মুক্তাগাছার দুল্লা ইউনিয়নের এক অজপাড়াগাঁ থেকে জেএমবির অন্যতম শীর্ষ জঙ্গি সিদ্দিকুর রহমান ওরফে বাংলা ভাইকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের আগে বাংলাভাই রামপুর গ্রামের আহমেদ মোড়লের বাড়িতে বাঁশঝাড় ও পুকুরে ঘেরা একটি ছোট টিনের ঘরে বসবাস করতেন। ওই ঘরটি ছিল চান মিয়া নামে তার এক অনুসারীর। পরে বাংলা ভাইকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। এবার তিন জঙ্গিকে ছিনিয়ে নিয়ে আবারও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ময়মনসিংহ। রাকিব হাসান ক্রসফায়ারে মারা যায়নি: স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন, জেএমবির সদস্য রাকিব হাসান ক্রসফায়ারে মারা যায়নি। দুর্ধর্ষ জঙ্গীরা তাকে ছিনিয়ে নেওয়ার পর পুলিশ গ্রেফতার করে।

রাতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর তার দেওয়া তথ্যানুযায়ী পলাতক অন্য জঙ্গীদের গ্রেফতার করতে তাকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালায়। এ সময় সশস্ত্র জঙ্গীরা ফিল্মি কায়দায় পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে আবার রাকিব হাসানকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় জঙ্গীদের সঙ্গে পুলিশের বন্দুকযুদ্ধ হয়। এতে জঙ্গী রাকিব গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়।

ব্যাখ্যা: পুলিশ ভ্যান থেকে পালিয়ে যাওয়া জঙ্গী রাকিব ধরা পড়ার পরদিন এনকাউন্টারে মারা যাওয়ার ঘটনা কিছুটা রহস্যের সৃষ্টি করেছে। কেন, কোন পরিস্থিতিতে তাকে মরতে হলো পুরো বিষয়টি আরো পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে সামগ্রিকভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে।

<u>নেপথ্যে সেই মেজর জিয়াউল:</u>

(বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৬ ফেব্রুয়ারী ; ২০১৪)

কারাগারের ভেতরেও থেমে নেই নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠনের সদস্যদের তৎপরতা। বরখাস্তকৃত সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা মেজর সৈয়দ জিয়াউল হকের পরামর্শ অনুযায়ী এখনো উজ্জীবিত জঙ্গীরা! কারা অভ্যন্তরের সেলের বারান্দার অল্প জায়গার মধ্যেই তারা সেরে নিচ্ছে সামরিক কায়দায় কঠোর প্রশিক্ষণ। অতীতে কেবলমাত্র

Dhaka University Institutional Repository

বিস্ফোরকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও এক বছর ধরে জঙ্গিরা ঝুঁকেছে আগ্নেয়াস্ত্রের দিকে। এরই অংশ হিসেবে জঙ্গীরা ময়মনসিংহের ত্রিশালে পুলিশ খুন করে কমান্ডো স্টাইলে ছিনিয়ে নিয়েছিল মৃত্যুদণ্ড ও যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত তিন শীর্ষ জঙ্গিকে। পরবর্তীতে ওই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গ্রেফতারকৃত জাকারিয়া ও রাসেলকে গোয়েন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছে তদন্ত সংশ্লিষ্টদের।

অন্যদিকে, এরই মধ্যে টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলার গারোবাজার এলাকা থেকে ছয়টি পিস্তল, আটটি ম্যাগাজিন, ৪১ রাউন্ড গুলি ও পাঁচটি তাজা ককটেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত সোমবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। পুলিশের ধারণা, উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যবহার করেই জেএমবির সদস্যরা ত্রিশালে কমান্ডো অপারেশনে অংশ নিয়েছিল।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ডিবির অতিরিক্ত উপ-কমিশনার ছানোয়ার হোসেন জানান, পলাতক দুই শীর্ষ জঙ্গী জাহিদুল ইসলাম ওরফে বোমারু মিজান, সালাউদ্দীন সালেহিন এবং অপারেশনের নেতৃত্বদানকারী ফারুক হোসেনকে গ্রেফতার করলে অনেক কিছুই স্পষ্ট হওয়া যাবে। তাদের পেছনে আরও অনেকের সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে। তবে তদন্তের স্বার্থে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কারা সূত্র জানায়, দেশের বিভিন্ন কারাগারে বন্দী জঙ্গীরা কারাগারের দুর্নীতিগ্রস্ত সদস্যদের ম্যানেজ করে নিয়মিত খালি হাতেই তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ অব্যাহত রেখেছে। প্রতিদিন ভোরে অন্য সব বন্দী জেগে ওঠার আগেই তারা ঘণ্টাব্যাপী কসরত সেরে নিচ্ছে। মেজর জিয়ার (বরখাস্তকৃত) তৈরি এবিটির সামরিক কৌশল, সিলেবাস এবং প্রশিক্ষণ মডিউলে এ বিষয়টি উল্লেখ ছিল। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে প্রতিদিন কাকডাকা ভোরে জঙ্গি সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের (এবিটি) সদস্যরা তাদের সেলের বারান্দায় সামরিক কসরত সেরে নিচ্ছে। ওই কারাগারে বন্দী এবিটির সদস্যরা ব্লগার আহমেদ রাজীব হায়দার হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিল। তারা আল-কায়েদা নেতা আনোয়ার আল আকীকে আইকন হিসেবে মনে করে। এবিটির মতাদর্শ গ্রহণ করতে তাদের পাশে থাকা অন্য বন্দীদেরও তারা প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে বলে জানা গেছে।

দেশের অন্য কারাগারগুলোতে অন্তরীণ হিযবুত তাহ্রীর, জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) ও হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশের (হুজিবি) সদস্যরাও একই কায়দায় শারীরিক কসরত ও তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে বলে নিশ্চিত করেছে একাধিক সূত্র। গত এক দশকে এদেশে গড়ে ওঠা জেএমবি, হুজি, হিযবুত তাহ্রীর, জামায়াতুল মুসলেমিন, জাদিদ আল-কায়দা, জুমাআতুল আল সাদাত, তামির উদ্দীনের একটি অংশের সদস্যরা এবিটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন গোয়েন্দারা। কারাবন্দী শীর্ষ জঙ্গিরা এখনো নিয়মিত মেজর জিয়ার পরামর্শ এবং নির্দেশনা পেয়ে থাকে।

গোয়েন্দা সূত্র জানায়, গত বছর জুলাই মাসে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া এবিটির প্রধান মুফতি জসীম উদ্দীন রহমানী টাস্কফোর্স ইন্টারোগেশন (টিএফআই) সেলে গোয়েন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছিলেন, তার সঙ্গে মেজর জিয়াউল হক (বরখাস্তকৃত) নিয়মিত যোগাযোগ করতেন। তার পরামর্শেই সাজানো হয়েছিল এবিটির সামরিক কৌশল, সিলেবাস এবং প্রশিক্ষণ মডিউল। গত বছর কুমিল্লায় ওই সেনা কর্মকর্তা এবং জসীম উদ্দীন রহমানীর সর্বশেষ সাক্ষাৎ হয়। বিদেশে থেকেই তিনি হেফাজতে ইসলামের সঙ্গে এবিটির সদস্যদের কাজ করার ব্যাপারে মতামত জানিয়েছিলেন। গত বছরের মাঝামাঝিতে বর্তমানে পাকিস্তানে অবস্থানরত এবিটির অপারেশনাল প্রধান ইজাজ হোসেন জুন্নুন শিকদার ও কাজী রেজোয়ানের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠক করেছিলেন রহমানী।

তিনি আরও জানিয়েছিলেন, মেজর জিয়ার (বরখাস্ত) পরামর্শ মতোই তৈরি করা হচ্ছিল 'ট্রেনিং ইনস্টিটিউট'। তবে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য এসব ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে বিস্ফোরকসহ অন্যান্য যুদ্ধ উপকরণের পাশাপাশি মজুদ করা হচ্ছিল ভারী আগ্নেয়াস্ত্র। তবে আপাতত সমতল ভূমিতে প্রশিক্ষণ নিলেও নিবিড় প্রশিক্ষণের জন্য জঙ্গি পছন্দের

Dhaka University Institutional Repository

তালিকায় রয়েছে পাহাড়ি অঞ্চল। রহমানী নিজে টেকনো দক্ষ না হওয়ায় মেজর জিয়াকে দেওয়া রহমানীর ই-মেইল পাঠানো এবং খোলার কাজ করতেন তারই একজন ঘনিষ্ঠ সহচর। পুরান ঢাকার বাংলাবাজারের একজন বই বিক্রেতা ফোরকান মিডিয়া এবং খুৎবা ওয়েব পেইজের প্রশাসক হিসেবে কাজ করতেন।নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা জানান, পলাতক থেকেও মেজর জিয়া দেশে জঙ্গিবাদ উসকে দেওয়ার কাজ করে যাচ্ছেন। মেজর জিয়া জঙ্গিদের কাছে রীতিমতো আদর্শ। বর্তমানে হিযবুত তাহরীরর কয়েকজন শীর্ষ নেতার সঙ্গে তার যোগাযোগ রয়েছে বলে তারা জানতে পেরেছেন। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গোয়েন্দা কর্মকর্তারা জানান, জঙ্গীরা বিভিন্ন নামে বিভক্ত হলেও তাদের টার্গেট এক ও অভিন্ন। কারাগারে অন্তরীণ বিভিন্ন সংগঠনের জঙ্গীরা সুযোগ বুঝে নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ সেরে নেয়। এ ছাড়া কারাগারে থেকে আদালতে নেওয়ার সময় মুঠোফোনের মাধ্যমে বাইরে থাকা তাদের সহযোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। দেওয়া হয় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা। বিশেষ করে ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলার ঘটনায় দেশের বিভিন্ন জেলায় মামলা হওয়ায় ওইসব মামলায় হাজিরা দিতে গিয়ে তাদের সাক্ষাতের সুযোগ মেলে। গোয়েন্দা সূত্র আরও জানায়, ২০১২ সালের শেষের দিকে মিয়ানমারের আরাকানের উদ্দেশ্যে এবিটির অন্তত অর্ধশতাধিক জঙ্গী যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য রওনা দিয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল রোহিঙ্গা ও আরাকান মুসলমানদের তিনটি সংগঠনের (আরএসও, এআরএনও ও এআরইএফ) সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করা। এর আগে তারা পর্যাপ্ত সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। প্রশিক্ষণ মডিউলের একটি অংশে লক্ষ্যবস্তুর টার্গেট ঠিক রাখতে মাঝে মাঝে এয়ারগান দিয়ে পাখি শিকার করার কথা বলা হয়েছে শিক্ষানবিস জঙ্গীদের।

এ ছাড়া গত বছরের জুলাই মাসে র‍্যাব-১২ এর একটি দল বগুড়া ঠনঠনিয়া থেকে ‘বিইএম’ নামের একটি জঙ্গী সংগঠনের তিন সদস্যকে গ্রেফতার করে। তাদের আস্তানা থেকে উদ্ধার করা হয় অত্যাধুনিক এসএমজি একে টুটু সাব মেশিনগান, জার্মানির তৈরি এসএমজি, পিস্তল, তিনটি ম্যাগাজিনসহ ৮০টি গুলি এবং জঙ্গী প্রশিক্ষণের উপকরণ। এসব অস্ত্রের পাশাপাশি অত্যাধুনিক অস্ত্রের নকশা এবং আত্মঘাতী হতে উদ্বুদ্ধকরণ নোটও উদ্ধার করা হয় আস্তানাটি থেকে। উদ্ধার করা কাগজপত্র যাচাই করে দেখা যায়, জেএমবির আদলেই এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রতিদিন ভোর ৪টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত ১৯ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো সেখানে। আর তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিও কিছুটা সামরিক বাহিনীর আদলে তৈরি করা। ট্রেনিং মডিউলে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মতো জঙ্গী দের ম্যাপ রিডিংয়ের গুরুত্ব দেওয়া হয়। শেখানো হয় সাংকেতিক চিহ্ন এবং অবস্থানের দূরত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জ্ঞান।

র‍্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক কর্নেল জিয়াউল আহসান জানান, র‍্যাব সৃষ্টির পর থেকেই জঙ্গী দমনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। জঙ্গী দমনের ক্ষেত্রে র‍্যাবের সাফল্য দেশে-বিদেশে অনেক প্রশংসিতও হয়েছে। ছিনিয়ে নেওয়া দুই জঙ্গিসহ অপারেশনে অংশ নেওয়া জঙ্গিদের গ্রেফতারে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে র‍্যাব। এর পেছনে যারাই নেপথ্য ভূমিকা রেখেছেন তাদের ছাড় দেওয়া হবে না।কে এই মেজর জিয়া : সেনাবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপপ্রয়াসের অন্য পরিকল্পনাকারী মেজর সৈয়দ মো. জিয়াউল হক ২০১১ সালের ২২ ডিসেম্বর অন্য এক কর্মরত কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করে তাকেও রাষ্ট্র ও গণতন্ত্রবিরোধী কর্মকাণ্ড তথা সেনাবাহিনীকে অপব্যবহার করার কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে প্ররোচনা দিয়েছিলেন। ওই কর্মকর্তা বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবগত করলে সদ্য দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী মেজর জিয়ার ছুটি ও বদলি আদেশ বাতিল করে তাকে সত্বর ঢাকার লগ এরিয়া সদর দফতরে যোগ দিতে বলা হয়। বিষয়টি টেলিফোনে গত ২৩ ডিসেম্বর তাকে জানানো হলে তিনি পলাতক থাকেন। পলাতক অবস্থায় মেজর জিয়া সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সাবভারসিভ (নাশকতামূলক) কার্যক্রম চালানোর পাঁয়তারা করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

কারাগারে বন্দী জঙ্গীদের তালিকা উদ্ধার:

টঙ্গীর গাজীপুরা থেকে গ্রেফতারকৃত জঙ্গী জাকারিয়ার স্ত্রী স্বপ্নার কাছ থেকে বিভিন্ন কারাগারে বন্দীদের তালিকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত রবিবার গাজীপুরার একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তালিকা ছাড়াও তার কাছ থেকে কিছু জিহাদি বই, একটি ল্যাপটপ, একটি মডেম, পেনড্রাইভ, ডাচ-বাংলা ব্যাংকের একটি এটিএম কার্ড, ৫টি মোবাইল ফোন, দুটি গাড়ির ব্লুবুক উদ্ধার করা হয়। স্বপ্না জানিয়েছেন, কারাবন্দী জঙ্গী এবং দুস্থ জঙ্গীদের পরিবারকে বিভিন্ন সময় আর্থিকভাবে সহায়তা করা হতো। স্বপ্নার গ্রামের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জের পরশা থানার বাইকাপাড়া এলাকায়। স্বপ্না রাজশাহীর একটি কলেজের সম্মান শ্রেণীর ছাত্রী। ওই বাসা থেকেই মাঝে মাঝে ক্লাস করতে রাজশাহী যেতেন স্বপ্না।

ব্যাখ্যা: ২৩ ফেব্রুয়ারি জঙ্গী ছিনিয়ে নেয়ার ঘটনায় এক সাবেক সেনা কর্মকর্তাকে ইন্ধনদাতা হিসেবে সংবাদপত্রে নাম এসেছে। এর সত্যতা যাচাই করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন ।

সংবাদ মূল্যায়ন: অল্প কথায় উপরের সংবাদগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলে কিছু বিষয় সংক্ষেপে চিহ্নিত করা যায়। যেমন গণমাধ্যমের মালিকানা ও সম্পাদকীয় নীতি জঙ্গীবাদ সম্পর্কিত সংবাদ গুলোকে প্রভাবিত করে। এ সংবাদের ভিতরে রাজনীতিও থাকে। বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি সংবাদপত্রের আনুগত্য বা সমর্থনের বিষয়টি বোঝা যায়। আর যেসব সংবাদপত্র মালিক বা সম্পাদকের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নেই,তারা সংবাদগুলো বাস্তবতার নিরিখে লেখার পরামর্শ দেন সংবাদকর্মীদের। জঙ্গীবাদ সমগ্র বাংলাদেশের জন্যই একটি সমস্যা। একে অবজ্ঞা বা অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করা বা এর সাথে কোন রাজনৈতিক দলকে এককভাবে জড়িয়ে সংবাদ প্রকাশ করা সঠিক নীতির প্রতিফলন হতে পারেনা। কারণ বিশেষ একটি দলের বিরুদ্ধে জঙ্গীবাদের অভিযোগ এনে একটি দল লাভবান হতে পারে,কিন্তু রাষ্ট্র এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হলে পুরো দেশ তথা জনগণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আর যেটুকু জঙ্গীবাদের অস্তিত্ব বাংলাদেশে রয়েছে এর দায়ও কিন্তু সব রাজনৈতিক দলেরই,সেটা হয়তো কম বেশি হতে পারে,কিন্তু কেউ পুরোপুরি দায় এড়াতে পারবেনা। জঙ্গীবাদ দমনে সমন্বিত ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে গণমাধ্যম সঠিক নীতিমালা প্রণয়ন করলে এর পরিধি অনেক কমে যাবে, দেশ ও সমাজ উপকৃত হবে।

বাংলাদেশের গণমাধ্যম আইন ও বিধিমালা: আবু নছর মো: গাজীউল হক সংকলিত ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশের গণমাধ্যম আইন ও বিধিমালায় সংবাদ তৈরির ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ শর্তের কথা বলা হয়েছে। যেমন : রাষ্ট্রের নিরাপত্তা : রাজদ্রোহ : কোন উক্তি,চিহ্ন অথবা দৃশ্যমান বস্তু দ্বারা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের যদি নিন্দা করা হয়, অথবা সরকারের সার্বভৌমত্বো প্রতি উত্তেজনামূলক কিছু সৃষ্টি করা হয় তবে সরকার এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে এবং আইন অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে । দ্রষ্টব্য : দন্ডবিধির ১২৩এ এবং ১২৪এ ধারা এবং ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৬ এবং ১৮ ধারা।

গোপনীয় আইন: কোন নির্দিষ্ট এলাকা অথবা স্থানে কোন গোপনীয় দলিলে কোন ব্যক্তিকে ফটোগ্রাফ, ছবি, মডেল ইত্যাি প্রকাশ করতে দেয়া হবেনা।

দ্রষ্টব্য: ১৯৮৩ সালের অফিসিয়াল গোপনীয়তা আইনের ৩(ক) ধারা।

কারো মানহানিজনক রচনা বা প্রকাশিত পুস্তক:

কেউ যদি জেনে শুনে কারো বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক বিষয় প্রকাশ করে তবে সে এর জন্য কঠোরভাবে দায়ী হবে। এক্ষেত্রে অপরাধীর বিরুদ্ধে দেওয়ানি বা ফৌজদারি উভয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দন্ডবিধির আওতায় ফৌজদারি

মোকদ্দমায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। ক্ষতিকর বিবৃতি বা সংবাদ প্রচার থেকে বিরত থাকার জন্য দেওয়ানি মোকদ্দমাও করা যেতে পারে (দ্রষ্টব্য: দন্ডবিধির ৫০১ ধারা টর্ট আইন)।

অশ্লীলতা: যদি কোন প্রকাশনা নৈতিক ক্ষতিকর এবং কোন ব্যক্তির মনে বিকৃত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তবে তা আইনের দৃষ্টিতে একটি অশ্লীল প্রকাশনা বলে গণ্য হবে ।

দ্রষ্টব্য: দন্ডবিধির ২৯২ ধারা এবং ১৯৬৩ সালের অশ্লীল বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধকরণ আইনের ৩ ও ৪ ধারা।

গ্রেফতার ও অপরাধ সংবাদ:

দেশের নিরাপত্তার হুমকিস্বরুপ কোন প্রকাশনা অথবা সরকারের বিরুদ্ধে জনমনে বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে অথবা বিচার বিষয়ক কার্যবিবরণীর প্রতি বাধার সৃষ্টি করে এমন প্রকাশনার ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান রয়েছে।

দ্রষ্টব্য: দন্ডবিধির ১২৩এ, ১২৪এ এবং ২২৮ ধারা এবং ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন।

আদালতের কার্যধারা:

সরকারের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, রাজদ্রোহাত্মক বা রাজদ্রোহমূলক কোন সংবাদপত্র, বই অথবা দলিলাদি যার দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকের মাঝে শত্রুতা অথবা ঘৃণার সৃষ্টি হতে পারেসে ধরনের বই, দলিলাদি এবং সংবাদপত্র সরকার বাজেয়াপ্ত করতে পারেযার প্রতিকারের জন্য হাইকোর্ট ডিভিশনে আবেদন করা যাবে। এ সব আবেদনের দ্বারা বই, সংবাদপত্র অথবা দলিলাদির প্রকৃতি প্রমাণ করতে হবে।

দ্রষ্টব্য: ফৌজদারি কার্যবিধির ৯৯এ, ৯৯বি, ৯৯ই, ৯৯এফ এবং ৯৯জি ধারা।

জাতীয় নিরাপত্তা ও সরকারি আদেশের শর্ত:

যদি কোন গ্রন্থাগার, সম্পাদক, মুদ্রাকর, এবং প্রকাশক কোন ক্ষতিকর প্রতিবেদন তৈরি করে বিতরণ করে অথবা বিক্রি করে সেক্ষেত্রে সরকারি কতৃপক্ষের অনুমতি প্রদর্শন করতে না পারলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে। কিন্তু সরকার যদি মনে করে এজাতীয় প্রকাশনা দেশের নিরাপত্তার, বৈদেশিক ররাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কেও প্রতি হুমকিস্বরুপ তবে সরকার এ ধরনের পুস্তক/দলিলাদি যে কোন কর্তৃপক্ষ দ্বারা এমন ব্যবস্থা নিতে পারবেন যিনি ৭২ ঘন্টার মধ্যে সিদ্বান্ত নেবেন যা প্রকাশ করা যাবে কিনা। এবং এ আদেশের ফলে যিনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন সরকারের নিকট তিনি ৭ দিনের মধ্যে আপীল করতে পারবেন এবং সরকার তা জেলা জজের নিকট পাঠাবেন যিনি আবেদনকারীকে ঐ রিপোর্ট সরকারের সুপারিশসহ পেশ করার সুযোগ দিবেন।

দ্রষ্টব্য: ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২(ডি), ২ (এফ), ২(জি), ১৬, ১৭ এবং ১৮ ধারা এবং দন্ডবিধির ৬, ৮, ১৪ এবং ১৫ অধ্যায়।

জনগণের নৈতিকতা:

যদি কোন ব্যক্তি সরকারের অনুমতি ছাড়া কোন অশ্লীল জিনিস, ফটোগ্রাফ, বিক্রি করে ভাড়া দেয়, জনসমক্ষে প্রদর্শন করে অথবা ব্যবসায়িক স্বার্থে যদি কোন পুরস্কার ঘোষণা করে তবে তা জনগণের নৈতিকতা বিরোধী কাজ বলে গণ্য হবে। দ্রষ্টব্য: দন্ডবিধির ২৯২, ২৯৫এ, ৪৯৯, এবং ৫০১ ধারা।

সম্প্রচার নীতিমালা (খসড়া):

বাংলাদেশে ১৯৯৯ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি বেসরকারী খাতে টেলিভিশন চ্যানেল চালু হয়। এর পর গত সাড়ে ১৪ বছরে বেসরকারী স্যাটেলাইট টেলিভিশনের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৪ । আরো ১৩টি চ্যানেলের সম্প্রচার প্রক্রিয়াধীন।

Dhaka University Institutional Repository

বেসরকারী স্যাটেলাইট টেলিভিশনের জন্য প্রয়োজন হয়, একটি লাইসেন্স এবং পরে তরঙ্গ বরাদ্দ। বাংলাদেশে বেসরকারী টেলিভিশনগুলোর জন্য এখন পর্যন্ত কোন সম্প্রচার নীতিমালা তৈরি হয়নি, তবে এর খসড়া চূড়ান্ত করেছে সরকার। তবে লাইসেন্সের জন্য যে শর্ত বা শর্তভঙ্গের জন্য শাস্তিগুলো কি তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

লাইসেন্স প্রদানঃ

সকল বেসরকারী বেতার, টেলিভিশন, কম্যুউনিটি রেডিও, অনলাইন বেতার ও টেলিভিশন চ্যানেলগুলোকে সরকারের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। সম্প্রচার কমিশন লাইসেন্স প্রদানের জন্য একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন করবে। উক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে সম্প্রচার কমিশন লাইসেন্স প্রদানের জন্য সরকারকে সুপারিশ করবে।

অংশীজনদের সাথে আলোচনা করে লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক উন্মুক্ত স্বতন্ত্র আইন/নীতিমালা/বিধিমালা প্রণয়ন করা হবে। এতে লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতি, লাইসেন্স প্রদানের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা, লাইসেন্স বাতিল ও অগ্রায়নের বিধান বর্ণিত থাকবে :

তথ্য মন্ত্রণালয় হতে ইতোমধ্যে অনুমোদনপ্রাপ্ত বেসরকারী বেতার ও টেলিভিশনগুলোকে ধারাবাহিকতা রেখে এই নীতিমালার অধীনে লাইসেন্স গ্রহণের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ সম্পর্কিত আইন/নীতিমালা/বিধিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার তথা তথ্য মন্ত্রণালয় এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সংবাদ ও তথ্য সংক্রান্ত অনুষ্ঠান সম্প্রচার: অনুষ্ঠানে সরাসরি বা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোন রাজনৈতিক দলের বক্তব্য বা মতামত প্রচার করা যাবেনা ।

কোন আলোচনামূলক অনুষ্ঠানে কোন প্রকার অসঙ্গতিমূলক বিভ্রান্তিমূলক অসত্য তথ্য বা উপাত্ত দেয়া পরিহার করতে হবে। এ ধরনের অনুষ্ঠানে উভয় পক্ষের যুক্তিসমূহ যথাযথভাবে উপস্থাপনের সুযোগ থাকতে হবে।

সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নিম্নবর্ণিত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান বাধ্যতামূলকভাবে প্রচার করতে হবে। যথা: জরুরি আবহাওয়া বার্তা, স্বাস্থ্য বার্তা, গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা, সরকার কর্তৃক জারীকৃত প্রেসনোট, সরকার কর্তৃক সময় সময় অনুমোদিত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ইত্যাদি। এ নীতিমালায় সম্প্রচারের অনুপযুক্ত হচ্ছে :

জাতীয় আদর্শ বা উদ্দেশ্যের প্রতি কোন প্রকার ব্যঙ্গ বা বিদ্রুপ, বাংলাদেশের জনগণের প্রতি অবমাননা বা ব্যঙ্গ কিংবা বাংলাদেশের অখন্ডতা বা সংহতি ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন প্রবণতা বিচ্ছিন্নতা বা অসন্তোষ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতি বা শ্রেণী বিদ্বেষ প্রচার, কোন ধর্মেও প্রতি বিদ্রুপ, অবমাননা বা আক্রমণ, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়, বর্ণ বা মতাবলম্বীদের মধ্যে বিদ্বেষ বা বিভেদ সৃষ্টি। কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত বা গোপনীয় মর্যাদা হানিকর তথ্য প্রচার করা যাবেনা। তবে,এমন কোন তথ্য যা গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থকে সরাসরিভাবে ক্ষুণ্ন করে, সকলক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি কর্তৃক সংগঠিত জনস্বার্থবিরোধী কর্মকান্ড সংক্রান্ত তথ্য গোপনীয়তার আওতায় পড়বেনা। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন ধরণের সামরিক বা সরকারী তথ্য ফাঁস ধর্মীয় মূল্যবোধে আঘাত সৃষ্টি করতে পারে,আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে উৎসাহ প্রদান করতে পারে, এবং আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করে এমন ধরনের অনুষ্ঠান বা বক্তব্য সশস্ত্রবাহিনী অথবা দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত দায়িত্বশীল অন্য কোন বাহিনীর প্রতি কটাক্ষ, বিদ্রুপ বা অবমাননা, অপরাধ নিবারণ ও নির্ণয়ে অথবা অপরাধীদের দন্ডবিধানে নিয়োজিত সরকারী কর্মকর্তাদের হাস্যস্পদ করে তাদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করে এমন দৃশ্য প্রদর্শন বা বক্তব্য প্রদান কোন বিদেশী রাষ্ট্রের অনুকূলে এমন ধরণের প্রচারণা যা বাংলাদেশ ও সংশ্লিষ্ট দেশের মধ্যে বিরোধের কোন একটি বিষয়কে প্রভাবিত করতে পারে কিংবা একটি বন্ধুভাবাপন্ন বিদেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এমন ধরণের প্রচারণা যার ফলে সেই রাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে সুসম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশংকা সৃষ্টি হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

কোন জনগোষ্ঠী, জাতি, বা দেশের মর্যাদা বা ইতিহাসের ক্ষতিকর ঘটনা/দৃশ্য বিন্যাস বা ঐতিহাসিক তথ্যের বিকৃতি, ধর্ষণ, ব্যভিচার, নারী ও শিশুর উপর অপরাধমূলক আক্রমণ, নারী ও শিশুদের নিয়ে অবৈধ ব্যবসা, উত্যক্তকরণ, পতিতাবৃত্তি এবং দালালী, কামুক বা অশোভন দেহভঙ্গী, নৈতিক মান অনুযায়ী গ্রাহ্য শয্যাদৃশ্যের বহির্গত কোন দৃশ্য সংযোজন। শারীরিক নিগ্রহ অথবা মাত্রাতিরিক্ত প্রসব বেদনা প্রদর্শন, যৌন ব্যধি, অতিমাত্রায় রক্তক্ষরণ, জখমও ছেদন ইত্যাদি দৃশ্য, সত্যিকার ফাঁসিতে ঝোলানো বা বীভৎস হত্যাকান্ড, শ্বাসরোধ করে এবং আত্মহত্যার দৃশ্য প্রদর্শন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোন বিদ্রোহ, নৈরাজ্য এবং হিংসাত্মক ঘটনা প্রদর্শন করা। আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে বা আইন অমান্য করার পক্ষে সহানুভূতি সৃষ্টি করে এমন কিছু দেখানো।

সম্প্রচার কমিশন গঠন: সম্প্রচারের লাইসেন্স প্রদান, গুণগত মান নিশ্চিতকরণ সম্প্রচারে অন্যায্য ও অনুচিত বিষয়াদি পরিহারকরণ এবং গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন করে এমন বিষয়াদি পরিহারের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ এবং পরিবীক্ষণের জন্য একটি সম্প্রচার কমিশন গঠিত হবে। এ কমিশন সম্প্রচারিত, অনুষ্ঠান সংবাদ এবং বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত মান সম্পর্কে জনগণের অভিযোগ গ্রহণ ও তা নিস্পত্তিকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। নিয়মিত সম্প্রচার নীতিমালা ও কমিশন কর্তৃক জারীকৃত নিয়মাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা মনিটর করা। যে কোন সময় প্রয়োজন মনে করলে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন। যে কোন সময় যে কোন সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানকে পরিপন্থী অনুষ্ঠানের কারণে কারণ দর্শানোর সুনির্দিষ্ট অভিযোগে বা স্বপ্রণোদিতভাবে যে কোন সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিলের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করতে পারবে। (আবু নছর মো: গাজীউল হক, ১৯৯৬ বাংলাদেশের গণমাধ্যম আইন ও বিধিমালা)।

অনলাইন সংক্রান্ত নীতিমালা: বাংলাদেশে অতিসম্প্রতি অনেক ইন্টারনেট ভিত্তিক অনলাইন বার্তা সংস্থা চালু হয়েছে। যদিও এর জন্য সরকার এখন পর্যন্ত কোন নীতিমালা প্রণয়ন করেনি, তাই যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি আইনে দোষীদের বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা নিতে পারবে। রোববার ৬ই অক্টোবর এ আইন জাতীয় সংসদে পাশ হয় ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন: ২০১৩ ও এর বিভিন্ন দিক:

এই আইনের অপরাধ সমূহ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৪ থেকে ৬৫ ধারা পর্যন্ত কোন কোন কর্মকাণ্ড অপরাধ তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৫৪ ধারায় উল্লেখ রয়েছে, (১) যদি কোন ব্যক্তি কোন কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মালিক বা জিম্মাদারের অনুমতি ব্যতিরেকে-

(ক) তার ফাইলে রক্ষিত তথ্য বিনষ্ট করার বা ফাইল থেকে তথ্য উদ্ধার বা সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে ঐ কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে প্রবেশ করেন বা অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রবেশ করতে সহায়তা করেন;

(খ) কোন কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক থেকে কোন উপাত্ত, উপাত্ত-ভাণ্ডার বা তথ্য বা তার উদ্ধৃতাংশ সংগ্রহ করেন বা স্থানান্তরযোগ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থায় রক্ষিত বা জমাকৃত তথ্য *(removable storage medium)* বা উপাত্তসহ ঐ কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের তথ্য সংগ্রহ করেন বা কোন উপাত্তের অনুলিপি বা অংশ বিশেষ সংগ্রহ করেন;

(গ) কোন কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোন ধরনের কম্পিউটার সংক্রামক বা দূষক বা কম্পিউটার ভাইরাস প্রবেশ করান বা প্রবেশ করানোর চেষ্টা করেন;

(ঘ) ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, উপাত্ত, কম্পিউটারের উপাত্ত-ভাণ্ডারের ক্ষতিসাধন করেন বা ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করেন বা ঐ কম্পিউটার, সিস্টেম বা নেটওয়ার্কে রক্ষিত অন্য কোন প্রোগ্রামের ক্ষতি সাধন করেন বা করার চেষ্টা করেন;

(ঙ) ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা নেটওয়ার্কে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন বা করার চেষ্টা করেন;

Dhaka University Institutional Repository

(চ) কোন কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে কোন বৈধ বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন উপায়ে প্রবেশ করতে বাধা সৃষ্টি করেন বা করার চেষ্টা করেন;

৫৫ ধারায় বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে, কোন কম্পিউটার, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত কম্পিউটার সোর্স কোড, গোপন, ধ্বংস বা পরিবর্তন করেন, বা অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে ঐ কোড, প্রোগ্রাম, সিস্টেম বা নেটওয়ার্ক গোপন, ধ্বংস বা পরিবর্তন করার চেষ্টা করেন এবং ঐ সোর্স কোডটি যদি আপাততঃ বলব অন্য কোন আইন দ্বারা সংরক্ষণযোগ্য বা রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য হয়, তাহলে তাহার এই কাজ হবে একটি অপরাধ?

৫৭ ধারায় বলা আছে, (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েব সাইটে বা অন্য কোন ইলেক্ট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সমপ্রচার করেন, যা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেউ পড়লে, দেখলে বা শুনলে নীতিভ্রষ্ট বা অসত্ কাজে আগ্রহী হতে পারেন অথবা যার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানি প্রদান করা হয়, তাহলে তার এই কাজ হবে একটি অপরাধ?আপনি যদি অন্য কারো কম্পিউটারে তার অনুমতি ব্যাতিরেকে প্রবেশ করেন বা অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রবেশ করতে সহায়তা করেন তাহলে আপনার ৭ থেকে ১৪ বছরের জেল হতে পারে। শুধু তাই নয় এই অভিযোগে দায়েরকৃত মামলায় আপনি জামিনও পাবেন না। এমনকি বিনা পরোয়ানায় পুলিশ আপনাকে গ্রেফতার করতে পারবে। ২০১৩ সালে সংশোধিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ এ এই বিধান করা হয়েছে। আইন বিশেষজ্ঞরা এটিকে একটি বিপজ্জনক আইন বলে অভিহিত করেছেন।

আইন বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এর মাধ্যমে তরুণ সমাজকে একটি ভীতিকর অবস্থার মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছে। এই আইনের সবচেয়ে বিপজ্জনক হচ্ছে ৫৭ ধারা। এই ধারাকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যার কারণে ইন্টারনেটের যে কোন কর্মকাণ্ডকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া সংবাদপত্রের অনলাইনে বা ওয়েবসাইট বা ফেসবুকে বা ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে প্রকাশ বা সম্প্রচার করা কোন কিছু মিথ্যা বলে প্রমাণিত হলে একই দণ্ড হবে। আপনার বিরুদ্ধে যদি মিথ্যা অভিযোগও হয় তবু মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আপনার জামিন মিলছে না।

বিগত বিএনপি সরকারের আমলে ২০০৬ সালে জাতীয় সংসদে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন পাস হয়। সে সময় এই আইনে সর্বনিম্ন কারাদণ্ডের সময়সীমা ছিল না। ফলে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী যে কোন ধরনের দণ্ড প্রদানের ক্ষমতা আদালতের ছিলো। কিন্তু ২০১৩ সালে সংশোধিত এই আইনে যে কোন অপরাধের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সাজা নির্ধারণ করা হয়েছে সাত বছর। ২০০৬ সালের মূল আইনে আদালতের ওপর জামিনের ক্ষমতা ন্যস্ত ছিলো। অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী আদালত যে কোন পর্যায়ে আসামিকে জামিন দিতে পারত। কিন্তু ২০১৩ সালের আইনে এই আইনের অধীনে অপরাধসূমহ অজামিনযোগ্য এবং আমলযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে আপনি যদি বৃদ্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত কিংবা নির্দোষও হন তাহলে মামলার বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত জামিন মিলছে না। এছাড়া অপরাধ আমলযোগ্য হওয়ায় আদালতের পরোয়ানা ছাড়াই পুলিশ যে কাউকে গ্রেফতার করতে পারবে।

এ প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার তানজীব উল আলম বলেন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের মূল সমস্যা (প্রতিবন্ধকতা) হচ্ছে ৫৭ ধারা। এই আইনে অপরাধ সংঘটনের যে বর্ণনা দেয়া আছে তাতে এক ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ ৫৭ ধারায় এমনভাবে অপরাধ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যেমন ইন্টারনেটে যে কোন কর্মকাণ্ডকেই এই আইনের আওতায় অপরাধ হিসেবে গণ্য করার একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েই আছে। এরকম একটি

Dhaka University Institutional Repository

আইনে এতদিন যে রক্ষাকবচ (সেফগার্ড) ছিল এই সরকারের আনীত সংশোধনীর ফলে সেটিও উঠে গেছে। অর্থাৎ এতদিন মামলা করতে হলে সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হতো। এখন আর অনুমতির প্রয়োজন লাগবে না।

ব্যারিস্টার তানজীব বলেন, মানুষের বাক স্বাধীনতার জায়গাটি- সংবিধানে যেটিকে মৌলিক অধিকার হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে সেই অধিকার হরণ হয়েছে চরমভাবে। এই আইন আপনাকে ইন্টারনেটে ব্লগিং বা ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিতে বারণ করছে না। কিন্তু যখন আপনি একাজগুলো করতে যাবেন তখনই আপনার মনে এক ধরনের ভীতি কাজ করবে। ওই ভীতি কাজ করা বা ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করাটাই তো বাক স্বাধীনতার পরিপন্থী। বাক স্বাধীনতার মত যেসব মৌলিক অধিকার আছে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আমার মধ্যে কি ধরনের ভীতি কাজ করছে। আমি তো মনে করি এই আইনে এক ধরনের ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে আছে। যা আমাদের বাক স্বাধীনতাকে খর্ব করছে। যেহেতু বাক স্বাধীনতা খর্ব করছে সেহেতু আইনটি সংবিধান বিরোধী। এক কথায় যদি বলি তাহলে এই আইনের ৫৭ ধারা সংবিধান বিরোধী। এই সংবিধান বিরোধী আইনে পুলিশকে দেয়া হয়েছে ব্যাপক ক্ষমতা। যা মানুষের বাক স্বাধীনতাকে হরণ করবে।

সংবিধানে বলা আছে আইনের চোখে সবাই সমান। এখন বর্তমান আইনানুযায়ী সংবাদপত্রের অনলাইনে মিথ্যা কোন কিছু প্রকাশ করা হলে ন্যূনতম সাজা হবে ৭ বছর।
ব্যারিস্টার তানজীব বলেন, আগের আইনে সর্বোচ্চ সাজার বিষয়টি উল্লেখ ছিল। কিন্তু ন্যূনতম সাজার বিষয়টি ছিলো না। কারণ জুতা চুরির জন্য তো কারো ফাঁসি হতে পারে না! চুরির অপরাধের জন্য যে সাজা সেই সাজাই তার প্রাপ্য হবে। কিন্তু এখন যদি আপনি বলেন, ফেসবুকে আপনার দেয়া স্ট্যাটাসের ফলে কারো মানহানি হয়েছে তাহলে মানহানির পরিমাণ অনুযায়ী সেই পরিমাণ শাস্তি হতে পারত। মানহানি কতটুকু হয়েছে সেটি তো আদালতের বিচার্য বিষয়। কিন্তু এই আইনে ন্যূনতম সাজা ৭ বছর উল্লেখ করে দিয়ে কোর্টের হাত-পা বেঁধে দেয়া হয়েছে। কারণ কাউকে যদি সাজা দিতে হয়, তাহলে তাকে ৭ বছর সাজা দিতে হবে। ন্যূনতম সাজার বিধান করে নাগরিকদের এক ধরনের অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, সংশোধনীতে আইনের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইন্টারনেট ব্যবহার বৃদ্ধি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে আরো এগিয়ে নেয়ার জন্য এই আইন। কিন্তু আইনে শাস্তির পরিমাণ বাড়িয়ে কিভাবে আপনি এর ব্যবহারকে বৃদ্ধি করবেন? কিভাবে জনগণকে ডিজিটালাইজেশনে উৎসাহিত করবেন? যখন ইন্টারনেট ব্লগিং বা ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিলে শাস্তি হবে, তখন কেউ কি আর দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করবেন?

ব্যারিস্টার তানজীব বলেন, সিলেকটিভ অ্যাপলিকেশন অব ল এর তৈরি হয়েছে এই সংশোধনীর ফলে। কারণ আপনার যাকে পছন্দ হলো না তাকে ধরলেন এবং সাজার ব্যবস্থা করলেন আর যাকে পছন্দ হল তাকে ধরলেন না– এতে করে আপনি রিপ্রেশনের জন্য আইনটিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলেন। কিন্তু আইনের আসল উদ্দেশ্য কখনোই এটি হওয়া উচিত নয়। রাষ্ট্রের এ ধরনের পদক্ষেপের ফলে জনগণের সঙ্গে এক ধরনের দূরত্ব তৈরি হয়। যা গণতন্ত্রের জন্য কখনো শুভ ফল বয়ে আনতে পারে না। মনে হচ্ছে সরকারের শেষ মুহূর্তে এসে সরকারের মধ্যেই কিছু কিছু লোক এমন সব পদক্ষেপ নেয়াচ্ছে যেগুলো আসলেই জনবিরোধী।

তিনি বলেন, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা তরুণ প্রজন্ম। আইনে সংশোধনী এনে এই প্রজন্মকে ভীতিকর পরিবেশের মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ একটি প্রজন্মকে আপনার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন। এই আইন দিয়ে তো কোন কিছু অর্জন করতে পারবেন না। কিন্তু জনগণের অনুভূতিতে আঘাত হলো। এটা গণতন্ত্রের জন্য শুভ নয়।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এডভোকেট এম আসাদুজ্জামান বলেন, মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তার সমাজ বিনির্মাণে এই আইন একটি বড় বাধা হয়ে দেখা দেবে। পুলিশকে যে অসীম ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তাতে পুলিশ আরো বেপরোয়া

হবে। পুলিশ চাইলে যে কাউকে এই আইনে মামলা দিয়ে দীর্ঘকাল কারাগারে রাখতে পারবে। এ আইন মানুষের নাগরিক অধিকারকে চরমভাবে বাধাগ্রস্ত করবে। মানুষ সরকার তথা রাষ্ট্রের বিদ্যমান আইনকে শ্রদ্ধার পরিবর্তে ভয় পাবে। তার বাক স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এটি হবে চরম লঙ্ঘন। মুক্তবুদ্ধি চর্চা ও সমালোচনা করার ক্ষেত্রে নাগরিক নিজ থেকেই সংযত হবে। এ আইনে ইতোমধ্যে মাহমুদুর রহমান ,মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের আদিলুর রহমান খান ও কিছু বিরোধী দলীয় সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

জঙ্গীবাদ নির্মূলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের ভূমিকার মূল্যায়নঃ

ইনস্টিটিউট অফ হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর পরিচালক, লেখক ফাতিন হক তার দ্বন্ধ নিরসনের ক্ষেত্রে গ্লোবাল মিডিয়া, ইসলামোফোবিয়া এবং এর প্রভাব শীর্ষক গবেষণায় বলেছেন, গণমাধ্যমে ক্রমশই একপাক্ষিক এবং বস্তুনিষ্ঠহীন সংবাদ পরিবেশন করছে। ইসলামের প্রশ্ন যেখানে আসছে সেখানেই হামলে পড়ছে বিশ্ব গণমাধ্যম নীতি নৈতিকতাহীন ভাবে।পাশ্চাত্য গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ ডেনিস ম্যাককোয়েল বলেছেন, যখন বেশিরভাগ চ্যানেল একসুরে কথা বলবে, তখন সেটার বিশ্বাসযোগ্যতা দর্শকের কাছে বেড়ে যাবে *(ম্যাককোয়েল, ১৯৯৪)*।

স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তি বিশ্ব শান্তি নষ্ট করার জন্য পশ্চিমা দেশগুলো মুসলমানদেরই দায়ী করে। পশ্চিমে দ্রুত ইসলাম বিস্তৃতির কারণে ইসলাম সম্পর্কে নানা অজ্ঞতাপূর্ণ বক্তব্য, অসত্য ও বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য প্রচার করা হচ্ছে। মুসলমানদের কখনো উগ্রবাদী, কখনো সন্ত্রাসী আবার কখনো মৌলবাদী বলে প্রচার করা হচ্ছে। অন্যদিকে পশ্চিমারা ইসলামের শান্তি ও সুমহান আদর্শের কারণে ইসলামের দিকে ঝুঁকছে। ইউরোপে অটোম্যান ও মরিস যুগে মুসলিম ও খৃষ্টানরা ধর্মযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পরবর্তিতে বিভিন্ন সময়ে ইসলামের বিকাশ ঘটায় খৃষ্টান শাসকশ্রেণী ভীত হয়ে পড়েছে। তখন ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যার বিকৃতি শুরু করেছে। নেতিবাচক প্রচারণার ফলে ইসলাম ধর্মের সুনাম নষ্ট করছে। যার ফলে শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই নয়, কথামালার ম্যাধমে ইসলামকে সহনশীল না ভেবে এর সার্বিক সুনাম নষ্টের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তারা। ইসলাম সন্ত্রাসবাদকে উস্কে দেয়, এমন বক্তব্য আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে হরহামেশাই প্রকাশিত হয়, যা অনভিপ্রেত। এখানে উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯৯৫ সালে টিমোথি ম্যাকভিহ আমেরিকার ওকলাহোমা শহরের ট্রেড সেন্টারে বোমা হামলা করে ১৬৭ জন নীরিহ মানুষকে হত্যা করে, যার বেশিরভাগই ছিল শিশু। সেখানে কোন উত্তেজনা তৈরি হয়নি, এমনকি ম্যাকভিহকে খ্রীষ্টান সন্ত্রাসীর তকমাও দেয়নি গণমাধ্যম। এরপর টিডব্লিউএ ৮০০ বিপর্যয় এবং অলিম্পিকে বোমা হামলার ঘটনা সারা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে। যেখানে আরব-আমেরিকানও মুসলমানদের অভিযুক্ত করা হয়। এবং অন্তত ২২০বার অভিযান হয় এ ঘটনায়। *(www.suite1001.com)*

ওয়েস্টার্ণ ইলিনয় বিশ্ববিদ্যায়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ এ সিদ্দিকী বলেছেন, আমেরিকার প্রধান দৈনিক গুলোতে হরহামেশাই ইসলামের অপব্যাখ্যা, বিদ্বেষ, বিভ্রান্তি বা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে সংবাদ পরিবেশিত হয়। ১৯৯৩ সালে ১১ জানুয়ারি ফ্রান্স থেকে পাঠানো নিউইয়র্ক টাইমসের একটি রিপোর্টে দেখা যায়, সেখানে বলা হয়েছে, দুই শিশু কন্যার প্রজনন অঙ্গ বিকৃত করে দেয়ায় জাম্বিয়ার এক মহিলাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এটাকে মুসলিম রীতি আর কন্যা সন্তান যাতে জন্ম না দিতে মুসলিম দেশগুলোতে এ ধরনের কাজ হয়ে থাকে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। *(www.jannah.org/article/media/html)*

এ ঘটনার পর প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন নৃতাত্ত্বিক সম্পাদককে লিখলেন, এ ধরনের ঘটনা কখনোই ইসলাম সমর্থন করে না। না এটি কোন মুসলিম রীতি, আফ্রিকা সাব-সাহারা অঞ্চলে এ ধরনের ঘটনা অমুসলিমদের মধ্যে দেখা যায়। আবদেল্লাহ হামৌদি এবং লরেন্স রোসেন পরে 'প্র্যাকটিস অব মিউটিলেশন' শিরোনামে নিউইয়র্ক টাইমসে একটি কলাম লেখক এ এম রোসেনথালকে ধন্যবাদ জানান।

(*www.jannah.org/article/media/html)*

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৩ সালে নিউইয়র্ক ট্রেড সেন্টারে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার সাথে অভিযুক্ত একটি র‍্যাডিক্যাল মুসলিম গোষ্ঠীর গণমাধ্যমের কর্মীদের যোগাযোগ ছিল। ম্যাসাচুয়েটস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ইভোন হাদ্দাদ ইউএসএ টুডেতে বলেছেন, 'সংবাদপত্রের দ্রুত সংবাদ বিক্রি করা উচিত, আর যদি সেটা মুসলিম গোষ্ঠীর কোন সন্ত্রাস হয়,তবে তা সহজে বিক্রি হয়'। অনেক সংবাদপত্র এটা সাবধানতার সাথে করে,কিন্তু অনেকেই এটা ব্যবহার করে। *(www.jannah.org/article/media/html)*

আফগান যুদ্ধের সময় টাইম ম্যাগাজিনে একবার একটি প্রচ্ছদে এক আফগান যোদ্ধা পাশে অস্ত্র রেখে নামাজ পড়ছিলেন। ছবির ক্যাপশনে লেখা হলো, "Guns & Prayer Go Together In The Fundamental Battle"।

আমেরিকান গণমাধ্যমে নাইন ইলেভেনের প্রপাগান্ডা: মূলত: নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পর সেদেশের গণমাধ্যমগুলো বৈদেশিক নীতিতে দুই-তৃতীয়াংশই সহিংসতার খবর দিত। আক্রমণের কয়েক মাস পর আমেরিকান গণমাধ্যম আফগানিস্তানের সংবাদ ৪৪ভাগ ও ইরাক নিয়ে ২ভাগ খবর প্রচার হতো। অন্য সময়ের তুলনায় সামরিক বাহিনীর সংবাদ ১২গুণ বেশি প্রচার হতো। ফক্স নিউজে আফগানিস্তান ও সন্ত্রাসের উপর তাদের মোট সময়ের ৬৮ ভাগ, সিএনএন করতো ৪২ ভাগ। রাতের একঘন্টা সংবাদের অর্ধেকই থাকতো নাইন ইলেভেনের উপর তৈরি নানা রিপোর্ট। সেন্টার ফর মিডিয়া এন্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্সের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ফক্স টিভি যুদ্ধের সংবাদ দেখাতো ৯৫ ভাগ সময়। সিবিএস যুদ্ধের সংবাদ ৬১ভাগ সময়, এবিসি ২০ভাগ, ফক্স নিউজের ৯৫ ভাগ সংবাদই থাকতো যুদ্ধের উপর। এবিসি ৪৮, এনবিসি ৮৫, সিবিএস ৭৭ভাগ সময় ব্যয় করতো। ফক্স নিউজ বুশ ও সামরিক বাহিনীর ইতিবাচক সংবাদ প্রচার করতো এবং বুশের পক্ষে সরাসরি অবস্থান নিতো। ফক্সকে মোস্ট ভিজিবল সোর্স অফ ইনফরমেশন অ্যাবাউট ৯/১১, এন্ড ইউএস রেসপন্স'এ উপাধি দিয়ে আফগানিস্থান ও ইরাকে সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি ঠিক করতো বুশ প্রশাসন।

প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সন্ত্রাসীদের শয়তান এবং নিজেদের ভালো দাবি করে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আরেকটি উদাহরণ তৈরি হবে এমন ঘোষণা দিলেও এবিসি এবং ফক্স নিউজ এর কোন সমালোচনা না করে বরং তা বারবার প্রচার করতো। কি প্রচার করতো সংবাদ মাধ্যমগুলো, তারা আমেরিকান সৈন্যদের বীরত্ব, বাগদাদের পুড়ে যাওয়া বাড়িঘর, গাড়ী, ব্রিটিশ, ইউরোপিয় ইউনিয়ন, আরব দেশগুলো এবং কানাডা যে মুহূর্তে বাগদাদের ক্ষয়ক্ষতি, মানুষের মৃত্যু, হতাহতের খবর প্রচার করতো, সে মুহূর্তে আমেরিকান গণমাধ্যমগুলো সামরিক বাহিনীর দেশপ্রেম, যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক সংবাদ প্রচার করায় ব্যস্ত থাকতো। আরবের অন্যদেশগুলোতে বিক্ষোভ , ইরাকী হতাহতদের উপর সংবাদ সবসময় অবহেলা করা হতো। *(Television and the Crisis of Democracy (Kellner 1990); The Persian Gulf TV War (Kellner 1992); Grand Theft 2000 (Kellner 2001) Media Spectacle (Kellner 2003a); and From 9/11 to Terror War: Dangers of the Bush Legacy (Kellner 2003b).*

তাদের প্রচারিত সংবাদের উপর ভিত্তি করে আমেরিকার নাগরিকরা ইরাকীদের বিরুদ্ধে ভুল ধারণা পোষণ করতো। ফক্স দর্শকদের ৮০ ভাগ, সিবিএস ৭১, এবিসি ৬১, এনবিসি এবং সিএনএন এর ৫৫ ভাগ দর্শক এ ভুল ধারণা নিয়েছিল। পিবিএস এবং ন্যাশনাল পাবলিক রেডিও এবং ৪৭ ভাগ দর্শক তখন সংবাদপত্রের উপর নির্ভর করতো। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণা করলে গণমাধ্যমের উপাদানগুলো স্বাভাবিক হয়ে আসে। যদিও প্রায় ৪হাজার সৈন্য ইরাক যুদ্ধে মারা যায় *(ম্যাথিউ রবিনসন, মিডিয়া কভারেজ অফ টেরোরিজম এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ: সরকারের অস্ত্র মিডিয়া, 8 July 2008 UK)*।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটেনে মুসলমানদের প্রতি নেতিবাচক প্রচারনাঃ

ব্রিটেনে গণমাধ্যমে কর্মরত মুসলমানদের উপর এক গবেষণায় দেখা গেছে, মুসলমানদের প্রতি প্রচারণা নেতিবাচক। কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দল ৮ বছরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক হাজার প্রবন্ধ নিবন্ধ পর্যালোচনা করে এ তথ্য নিশ্চিত হন। প্রকাশিত সংবাদের দুই তৃতীয়াংশ সন্ত্রাসবাদ, সাংস্কৃতিক আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মিলিট্যান্সি, র‍্যাডিকালিজম এবং ফান্ডামেন্টালিজম শব্দ ব্যবহার করে। চ্যানেল ফোর এ তথ্য দেয়। স্টোরির তথ্যগত বিশ্লেষণ, মুসলমানদের ব্যাখ্যা, এবং ভাষা প্রয়োগ এ তিনটি বিষয়কে গবেষণায় বিবেচনা করা হয়। একপাশে ছবি আর অন্যপাশে নাম এবং বিশেষণ ব্যবহারের প্রতি গবেষকরা দৃষ্টি দিয়েছেন। সাধারণত এক্সিট্রিমিজম, সুইসাইড বোম্বারস, মিলিট্যান্সি, র‍্যাডিকালিজম শব্দ প্রয়োগ আর ব্রিটিশ মুসলমানদের ক্ষেত্রে ফ্যানাটিক ও মৌলবাদী শব্দগুলো ৩৫ভাগ ব্যবহার হয়। আর ব্যাখ্যায় ইসলামকে পশ্চাৎমুখী অথবা হুমকি বলে উল্লেখ করা হয়।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে মুসলিম ও সন্ত্রাসী ঘটনার সংবাদ মূল্যায়নঃ

সিবিএস সংবাদঃ

CBS News, CAIRO - A top leader of the Muslim Brotherhood was arrested Wednesday by the military government. It's part of the crackdown on the Brotherhood, which advocates a strict Islamic government. Eamss El-Erian went into hiding when the military ousted President Mohammed Morsi. Since then, Islamic militants have stepped up attacks on Christians.

In a packed church in a poor Cairo neighborhood, mourners grieved for their dead: Five Christians mowed down by masked gunmen as they arrived for a wedding.....(সংক্ষিপ্ত)

ব্যাখ্যাঃ খ্রীষ্টান চার্চে বোমা হামলার দায়ে মিশরের একজন শীর্ষ ব্রদারহুড নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একদিকে খ্রীষ্টান চাচ, অন্যদিকে ব্রাদারহুড নেতার সংবাদটি প্রকাশ করেছে সিবিএস নিউজ।

Student gets 40 years for terror campaign against muslims:

Pavlo Lapshyn hunted down a Muslim to murder before he bombed three Midlands mosques to trigger a race war:

The Guardian, 25 October; 2013

Pavlo Lapshyn came to Britain in April from Ukraine after winning a prize to further his studies, but within days he had stabbed Mohammed Saleem in Birmingham. Photograph: Reuters

A white supremacist who hoped to "ethnically cleanse" Muslims has been told he will serve at least 40 years imprisonment for a terror campaign in which he hunted down a Muslim to murder before he bombed three Midlands mosques aiming to kill and maim worshippers.....(সংক্ষিপ্ত)

ব্যাখ্যাঃ দি গার্ডিয়ান পত্রিকার একটি সংবাদ। মুসলিম বিদ্বেষী প্রচারণা চালানো এক ব্রিটিশ যুবককে ৪০ বছরের কারাদন্ড দেয়া হয়েছে। রয়টার্সের একটি সংবাদ যা গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

Turkey's female MPs wear headscarves in parliament for the first time:

(Associated Press /theguardian.com, 31 October 2013)

Four female MPs wearing headscarves walked into Turkey's parliament in Ankara on Thursday, marking the end of a ban emphatically imposed since the early days of the Turkish Republic.

The issue of where women can wear headscarves remains highly charged in the Muslim-majority country, founded in 1923 under strictly secular principles, but where a public cry for freedom of religious expression is growing louder.
Restrictions on the wearing of headscarves in government buildings were loosened in recent reforms by the Prime Minister, Recep Tayyip Erdogan, aimed at promoting democracy. The ban remains in place for judges, prosecutors and military and security personnel.

The four MPs who took advantage of the relaxed legislation are members of Erdogan's Justice and Development party, abbreviated as AKP, which has Islamist roots and has gained a strong following.

The reforms have been criticised by many Turks who fear a rise of political Islam, but politicians from the main secular opposition party, CHP, reacted coolly to the appearance of the headscarved MPs.

In 1999 an MP, Merve Kavakci, tried to take her oath wearing a headscarf. The then prime minister, Bulent Ecevit, told MPs to "put this woman in her place". Kavakci left while some of her colleagues chanted "get out". Kavakci lost her seat in 2001.

ব্যাখ্যাঃ তুর্কী পার্লামেন্টে চারজন নারী সদস্য মাথায় স্কার্ফ পরে প্রথমবারের মতো সংসদে প্রবেশ করেছেন। সে ছবি এবং সংবাদ এটি। ধর্মনিরেপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে তুরস্ক প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মাথায় স্কার্ফ পরার বিষয়টি নিষিদ্ধ ছিল।

The Next Islamist Revolution?

The New York Times ON THE WEB *(January 23, 2005)*

Before dawn one morning this past November in Bagmara, a village in northwestern Bangladesh, six puffy-eyed men gathered beneath a cracked-mud stairwell to describe a man they consider their leader, a former schoolteacher called Bangla Bhai. The quiet was broken now and then by donkey carts clattering past, as village women, seated on the backs of the carts, were taken to the market. The women wore makeshift burkas -- black, white, canary yellow -- and kept their heads down, and this, the men explained, was Bangla Bhai's doing.

Last spring, Bangla Bhai, whose followers probably number around 10,000, decided to try an Islamist revolution in several provinces of Bangladesh that border on India.

Dhaka University Institutional Repository

His name means "Bangladeshi brother." (At one point he said his real name was Azizur Rahman and more recently claimed it was Siddiqul Islam.) He has said that he acquired this nom de guerre while waging jihad in Afghanistan and that he was now going to bring about the Talibanization of his part of Bangladesh. Men were to grow beards, women to wear burkas. This was all rather new to the area, which was religiously diverse. But Jagrata Muslim Janata Bangladesh, as Bangla Bhai's group is called (the name means Awakened Muslim Masses of Bangladesh), was determined and violent and seemed to have enough lightly armed adherents to make its rule stick.....(সংক্ষিপ্ত) ।

ব্যাখ্যাঃ নিউইয়র্কের লেখক এলিজা গ্রিসওল্ড এ লেখাটি ২৩ জানুয়ারী সংখ্যায় নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় লিখেছেন। প্রায় ৪ হাজার শব্দের এ লেখায় তিনি বাংলাদেশের ইসলাম ধর্মের বিকাশ ও ধর্মীয় রাজনীতিসহ সাম্প্রতিক অনেক বিষয় তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশে জঙ্গী হামলা ও বিশেষজ্ঞদের মতামত দিয়ে তিনি বলতে চেয়েছেন, এগুলো কি বিপ্লবের কোন লক্ষণ কিনা, বাংলাদেশে বিদ্রোহ আসন্ন এমনটাই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন তার লেখায়।

জঙ্গীবাদের প্রজনন ক্ষেত্র বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, জড়িয়ে পড়ছে বিত্তবান ঘরের সন্তানরাঃ

(বিবিসি, ৯ আগস্ট; ২০১৩)

বাংলাদেশে ধর্মীয় উগ্রবাদ বিস্তারের ধারায় একটা ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এতদিন ধারণা করা হতো শুধুমাত্র মাদ্রাসাগুলোর মধ্যেই উগ্রবাদ সীমিত,কিন্তু এখন তা শহরকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে । ধর্মীয় উগ্রবাদের প্রজননক্ষেত্র হিসেবে কাজ করছে, বেসরকারি অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা । সম্প্রতি নিউইয়র্কে বাংলাদেশি যুবক নাফিস আহমেদের সন্ত্রাসবাদে জড়িত থাকার দায়ে শাস্তি হওয়ায় নতুন করে বিষয়টি আলোচনায় এসেছে বলে বিবিসি বাংলার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের নিরাপত্তা গবেষক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ পিস অ্যান্ড সিকিউরিটিজ স্টাডিজের প্রেসিডেন্ট অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মুনিরুজ্জামান বলেছেন, বাংলাদেশে উগ্র বা জঙ্গী মতবাদ বিস্তার লাভের স্থান হিসেবে এতদিন ধারণা করা হতো শুধু মাদ্রাসাগুলোর মধ্যেই তা সীমিত, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে উগ্রবাদ, জঙ্গীবাদ শহরকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ তৎপরতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে।

তিনি বলেন, অভিজাত এবং ধনী পরিবার থেকে শিক্ষার্থীরা যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাচ্ছেন সেখানে এ ধরনের মতবাদ ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করা শুরু করছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার চেষ্টার দায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত বাংলাদেশি যুবক কাজী নাফিস শুক্রবার নিউ ইয়র্কের আদালতে বলেছেন, ঢাকার নামকরা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় কিছু সহপাঠির সূত্রেই তার উগ্রবাদে দীক্ষা হয়। সম্প্রতি ঢাকায় একজন ব্লগারকে হত্যার ঘটনায় যে কজন তরুণকে আটক করা হয়, তারাও ওই একই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বিবিসি বাংলাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে মি. মুনিরুজ্জামান বলেছেন, তারা এতদিন ধারণা করে আসছিলেন যে বাংলাদেশে উগ্র বা জঙ্গী মতবাদের বিস্তার লাভের স্থান শুধু মাদ্রাসাগুলোর মধ্যেই সীমিত। কিন্তু এখন মাদ্রাসাগুলোর পাশাপাশি ঢাকার বড় বড় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেখানে অভিজাত ও ধনী পরিবারের ছেলেমেয়েরা পড়তে যান সেগুলোও এই মতবাদের বড় ক্ষেত্র হিসেবে পরিণত হচ্ছে।

তিনি আরও বলেছেন, বেশ উদ্বেগের সঙ্গে তারা লক্ষ্য করছেন বাংলাদেশে দুবছর আগে নিষিদ্ধ-ঘোষিত 'হিযবুত তাহরির' নামের সংগঠনটির কর্মকাণ্ড এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ঢাকার বেশ কিছু অভিজাত এলাকায় ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে এবং হিযবুত তাহরিরের মাধ্যমে এধরনের উগ্র মতবাদ বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ছড়িয়ে পড়ছে।

মি. মুনিরুজ্জামান বলেছেন বাংলাদেশে হিযবুত তাহরিরের যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তারা উত্তর আমেরিকায় উচ্চ শিক্ষালাভ করে বাংলাদেশে এসে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন এবং তাদের মতবাদ প্রসারে উদ্যোগী ভূমিকা রাখছেন।

গবেষণায় তারা দেখেছেন যে, এসব শিক্ষক তাদের এ সংগঠনের সাথে যাদের জড়িত করছেন তাদের বেশিরভাগই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং তারা বিত্তবান ঘরের সন্তান।

এসব শিক্ষার্থীরা কেন এই ধরনের মতবাদে আকৃষ্ট হচ্ছেন এমন প্রশ্নের ব্যাখ্যায় মি. মুনিরুজ্জামান বলেছেন আভ্যন্তরীণ কিছু ব্যাপারে এদের মধ্যে হতাশা কাজ করছে। এছাড়া বহির্বিশ্বের যেসব ঘটনার প্রভাব বাংলাদেশের ওপর পড়ছে তার জের ধরে এ ধরনের কর্মকাণ্ডে তারা জড়িয়ে পড়ছে বলে মন্তব্য করেছেন এই নিরাপত্তা বিশ্লেষক।

ব্যাখ্যা : এ সংবাদটি বিবিসি বাংলায় ২০১৩ সালের ৯ আগস্ট প্রচারিত হয়। সংবাদটি গুরুত্ব দিয়ে প্রচারিত হয়, কারণ ঘটনার দুদিন আগে আমেরিকায় সন্ত্রাসী হামলার চিন্তা করায় বাংলাদেশী যুবক নাফিসকে ৩০ বছরের কারাদন্ড দেয়া হয়। নাফিস একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশে পড়াশোনা করতো। এ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বিত্তবান পরিবারের সদস্যদের জঙ্গী তৎপরতায় জড়িত থাকা নিয়ে সংবাদটি তৈরি হয়। নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মুনিরুজ্জামানের সাক্ষাতকার এতে জুড়ে দেয়া হয়। সবমিলিয়ে সংবাদটি সময়োপযোগী বলে প্রচারিত হয়।

বিশ্বব্যাপী চাপ প্রয়োগের হাতিয়ার হিসেবে জঙ্গীবাদকে ব্যবহার করা হচ্ছেঃ সাংবাদিক সিরাজুর রহমানঃ

(রেডিও তেহরান, ১৩ ডিসেম্বর; ২০১০)

মানবাধিকার এবং জঙ্গীবাদ বর্তমান বিশ্বে খুবই আলোচিত বিষয়। পশ্চিমা দেশগুলো মানবাধিকারকে তাদের ইচ্ছামতো ব্যবহার করছে চাপ প্রয়োগের হাতিয়ার হিসেবে। আবার তথাকথিত ৩য় বিশ্বের অনেক দেশে জঙ্গীবাদ শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে কারণে অকারণে। মানবাধিকার ও জঙ্গীবাদের বিষয়ে ব্রিটেনে বসবাসরত প্রথিতযশা বাংলাদেশী সাংবাদিক জনাব সিরাজুর রহমানের সাক্ষাতকার প্রচারিত হয়।

সিরাজুর রহমান বলেন, মানবাধিকার বলতে মানুষের অধিকারকে বোঝায়। এসব অধিকারের মধ্যে রয়েছে- মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার, স্বাধীন থাকার অধিকার, জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের চেষ্টার অধিকার ও রয়েছে বাক স্বাধীনতা।

আর জঙ্গীবাদের সংজ্ঞা একেক জন একেকভাবে দিচ্ছে। জর্জ ডাব্লিও বুশ এবং টনি ব্লেয়ারের দৃষ্টিতে জঙ্গীবাদ হচ্ছে - তাদের দেশের মুসলমানরা যখন তাদের দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছে, তখন তারা জঙ্গীবাদী। ভারতের কাশ্মীরে যারা স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করছে তাদেরকে ভারত জঙ্গীবাদী বলে দাবী করে। বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারের বিরুদ্ধে কেউ কোনো আন্দোলন সংগ্রাম করলে তাদেরকে জঙ্গীবাদী বলা হচ্ছে। এছাড়াও বাংলাদেশে আরেক ধরনের মানুষ আছে, যারা মনে করে শাসক দল দেশে যেসব অন্যায় অত্যাচার করছে, নারী নির্যাতন হচ্ছে, রাজনৈতিক বিরোধীদের হত্যা করা হচ্ছে, টেন্ডার নিয়ে বাণিজ্য হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি নিয়ে বাণিজ্য করা হচ্ছে, সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ ও পদোন্নতি নিয়ে বাণিজ্য করা হচ্ছে এসব বিষয়কে অনেকে সরকারী জঙ্গীবাদ বা সন্ত্রাস বলে অভিহিত করে থাকেন।

জঙ্গীবাদী চাপ-শক্তিশালী হাতিয়ার কিনা সে স্পর্কে তিনি বলেন, আসলে শক্তিশালী দেশগুলো যা কিছু করছে তা তাদের নিজেদের স্বার্থে করছে এবং করে। তারা দাবী করে থাকে ,তাদের দেশে মানবাধিকার আছে এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলোতে মানবাধিকার নেই। মানবাধিকার নেই বলে শক্তিশালী দেশগুলো দূর্বল দেশগুলোর ওপর চাপ দিচ্ছে - সে কথাটাই ঠিক। আর এ ধরনের চাপ দেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে , তাদের কথা শুনতে বাধ্য করা। আর এ বিষয়টি আগেও ছিল। তবে সম্প্রতি উইকিলিকস যেসব দলিলপত্র প্রকাশ করেছে ,তাতে শক্তিশালী দেশ বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে বিশ্বের মানুষ নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে। দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র যেখানে আমেরিকার স্বার্থ নিহিত আছে সেখানে তারা সক্রিয়। তারা সেসব দেশে সামরিক ঘাঁটি করছে, সামরিক মহড়া চালাচ্ছে - আর এসব করে তারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করছে। কিন্তু ওই সব দেশে যখন মার্কিনীদের এসব কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওঠে তখন তারা জঙ্গীবাদের কথা বলে। ফিলিস্তিনীদের গোটা দেশটাকে ইসরাইলীরা দখল করে নিয়েছে। ফিলিস্তিনের আদিবাসীরা বিশ্বের বহু দেশে শরণার্থী হিসেবে মানবেতর জীবন যাপন করছে। তারা তাদের নিজেদের ভূ-খণ্ডে ফিরতে চায়। দখলীকৃত ফিলিস্তিনী ভূখণ্ডে ইসরাইলীরা অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করছে।

আমেরিকা বা পশ্চিমাদের কাছে সে বিষয়টি কোনো দোষের বা দস্যুতার নয়, আর যখন ইসরাইলী জবরদখল, অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনীরা আন্দোলন সংগ্রাম করে তখন তারা হয়ে যায় সন্ত্রাসী, হয়ে যায় জঙ্গীবাদী। তাছাড়া বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে যে অশান্তি এবং অস্থিতিশীলতা চলছে, বিশ্বের দাবী এগুলো আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল এবং আরো কোনো কোনো পশ্চিমা দেশের কারণে হচ্ছে অথচ তারাই মধ্যপ্রাচ্যে সন্ত্রাস বা ইসলামী সন্ত্রাসের কথা বলছে। মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তির বিষয়টি শুরু হয়েছিল ফিলিস্তিনীদের প্রতিবাদ থেকে। ফিলিস্তিনীরা প্রথম দিকে নানাভাবে তাদের প্রতিবাদ জানিয়েছে বিশ্বসমাজের কাছে। কিন্তু বিশ্বসমাজ তাদের সেই ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও ফরিয়াদের বিষয়টি কানে তুলেনি। তারপর মানুষের যখন আর কোনো কিছু করার থাকে না, যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায় তখন বাধ্য হয় প্রতিবাদের ভিন্ন ভাষা ব্যবহার করতে।

কিন্তু ফিলিস্তিনীদের দমনের নামে ইসরাইলীরা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করছে, নির্যাতন চালাচ্ছে, শিশু হত্যা করছে- আমার দৃষ্টিতে সেগুলোই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাস। দেখুন এই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমণ করলো এটি একটি মারাত্মক সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাস

ব্যাখ্যাঃ সিরাজুর রহমান বিবিসির সাবেক বাংলা বিভাগের প্রধান।তিনি জঙ্গীবাদ ও মানবাধিকার প্রসঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক তথ্য উপাত্ত দিয়ে বলেছেন, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাই জঙ্গীবাদ সৃষ্টির কারণ। বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডকে দায়ী করেন তিনি। দলীয়করণ, রাজনৈতিক অপরাধের বিচার রাজনৈতিক কারণে না হওয়া ,গণমাধ্যমের স্বাধীনতা না থাকাকেও দায়ী করেন। ইসরাইল ইরানের ক্ষেত্রে দুই রকম নীতি জঙ্গীবাদকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন।

আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ খোঁজা হচ্ছে :মাওলানা যাইনুল আবেদীনঃ

(রেডিও তেহরান, ২রা মার্চঃ ২০১১)

বাংলাদেশে আলকায়দার নেটওয়ার্ক আছে কিনা তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু। আজ (বুধবার) চট্টগ্রামে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠককালে তিনি এ কথা জানান। মন্ত্রী বলেন, বিশ্বকাপ চলাকালে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক থাকতে আগে থেকেই নির্দেশ দেয়া আছে। দেশে জঙ্গী ,সন্ত্রাসী ও আলকায়দা আছে কিনা এমন

সন্দেহ প্রকাশ করে স্বরাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রীর দেয়া বক্তব্যে বিশ্লেষক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে ঢাকার তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা যাইনুল আবেদীন রেডিও তেহরানকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, স্বরাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী একসময় বলছেন, দেশের কিছু ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান জঙ্গীদের অর্থায়ন করছে আবার তিনিই বলছেন, দেশে আলকায়দা জঙ্গীদের নেটওয়ার্ক আছে কিনা তা খুঁজে দেখা হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রীর দু'টি বক্তব্যই স্ব-বিরোধী। সারা বিশ্বেই ইসলাম ও মুসলমান বিরোধীরা সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে বাংলাদেশেও এ ধরনের প্রচারণা চালাচ্ছেন অনেকে। এখন দেশের মন্ত্রী-এমপিরাও এ কাজে নেমে পড়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন মাওলানা যাইনুল আবেদীন। তিনি বলেন, সারা বিশ্বের ইহুদিবাদী শক্তির দোসররা ইসলামকে ভয় পায়। আর তাই ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে এ ধরনের অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। অপপ্রচার চালিয়ে ইরাক ও আফগানিস্তানের নিরীহ মুসলমানদের ওপর নির্মম হামলা করেছিল পশ্চিমা শক্তি। এখন তাদের দোসররাই বাংলাদেশের মুসলমানদের দমন করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। এসব অপশক্তির বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান এই ইসলামী চিন্তাবিদ।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের সেক্রেটারী মাওলানা খলিলুর রহমান মাদানী রেডিও তেহরানকে বলেছেন, ইসলাম এবং জঙ্গীবাদ সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী বিষয়। ইসলাম কখনোই সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদকে প্রশ্রয় দেয় না এবং কখনোই দেয়নি। যার প্রমাণ এর আগে বহুবার পেয়েছে বিশ্ববাসী। আর একমাত্র ইসলামই জঙ্গীবাদের মূলোৎপাটনে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। এমনকি বাংলাদেশের আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখরা জঙ্গীদের আখড়া দমনে সফল প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। মুসলমানরা কখনোই এ কাজে জড়িত নয় মন্তব্য করে খলিলুর রহমান মাদানীবলেন, সন্ত্রাসী ও জঙ্গীবাদী আখ্যা দিয়ে বিশ্বের দরবারে দেশের মানসম্মান ক্ষুন্ন করার লক্ষ্যে একটি শ্রেণী অপচেষ্টা চালিয়ে আসছে।

ব্যাখ্যাঃ তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা যাইনুল আবেদীন বলেছেন, ইসলাম জঙ্গীবাদকে কখনোই প্রশ্রয় দেয়নি, বরং জঙ্গীবাদ দমনে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী ইহুদীদের অপপ্রচারের কারণে এটা বিভ্রান্তি বড় ধরনের রুপ পেয়েছে। মসজিদ মিশনের সেক্রেটারি মাওলানা খলিলুর রহমান মাদানী বলেছেন, একটি শ্রেণী দেশকে জঙ্গীবাদ বলে দেশের সুনাম নষ্ট করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

<u>জঙ্গীবাদ বাংলাদেশের জন্য বড় হুমকী নয়:</u>

(রেডিও তেহরান, ১৯ মে; ২০০৯)

সাংবাদিক মাহফুজ উল্লাহ রেডিও তেহরানকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে জঙ্গীবাদের ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে । অপরদিকে বিরোধী দল মনে করছে বাংলাদেশের জন্য জঙ্গীবাদ বড় কোনো হুমকী নয় । আসলে বিষয়টি সম্পর্কে যেভাবে বলা হচ্ছে বা প্রচার চলছে তা অতিরঞ্জিত করে বা বাড়িয়ে বলা হচ্ছে । আর এতে দেশের যে সুনাম আছে তা ক্ষুন্ন হচ্ছে । জঙ্গীবাদ একটি সমস্যা- এ বিষয়টি কিন্তু আপেক্ষিক । কারণ ১০, ১৫ বা ২০ জনকে যদি অনেক বলে আখ্যায়িত করা হয়, তাহলে তা আরো বেশী করে বিভ্রান্তি ছড়াবে । বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ যে অবস্থায় আছে সেটি আইন শৃঙ্খলা বা অপরাধ বিষয়ক সমস্যা । তবে জঙ্গীবাদ এখন পর্যন্ত দেশে ব্যাপক কোনো সমস্যার সৃষ্টি করেছে বলে তিনি মনে করেন না। অন্যান্য দেশে যেভাবে জঙ্গীবাদের প্রসার ঘটেছে - বাংলাদেশে সেভাবে জঙ্গীবাদের প্রসার ঘটা সম্ভব নয় বলে তার অভিমত।

মাহফুজ উল্লাহর মতে, প্রথমত: সমাজে বা রাষ্ট্রে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্যে বা বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর জন্য হাতে গোনা কয়েকজনই যথেষ্ট। এজন্য খুব বেশী বা বড় সংখ্যার প্রয়োজন হয় না । দ্বিতীয়ত: জঙ্গীবাদকে অর্থনৈতিকভাবে, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে মোকাবেলা করতে হবে। আর যদি এটি করতে হয় তাহলে সরকারকে পরিষ্কার ভাষায়

Dhaka University Institutional Repository

গ্রেফতারকৃত জঙ্গীদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসাবাদে যেসব তথ্য বেরিয়ে আসে তা জানাতে হবে। সরকার গ্রেফতারকৃত জঙ্গীদের কাছে থেকে জিজ্ঞাসাবাদে যেসব তথ্য আদায় করছে, সেসব বিষয়ের অনেক কিছু নিয়ে দেশের সাধারণ মানুষের সাথে, সিভিল সোসাইটির সাথে, বিভিন্ন সংস্থার সাথে বা রাজনীতিবিদদের সাথে মত বিনিময় করছে না । সরকার যদি এসব বিষয় নিয়ে মতবিনিময় না করে তাহলে জঙ্গীবাদী যে সমস্যা আছে, বা যে সমস্যার কথা বলা হচ্ছে তার সমাধান সম্ভব হবে না; চিহ্নিতও করা যাবে না। জঙ্গীবাদের অভিযোগে গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় সে তথ্য সম্পর্কে কিন্তু কেউ কিছু জানি না । কারণ সরকারের পক্ষ থেকে তথ্যগুলো প্রকাশ করা হয় না । যদি সরকার এসব তথ্য প্রকাশ না করে তাহলে এর উৎস বা কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না । শুধুমাত্র পুলিশী কায়দায় বা লাঠি দিয়ে এ ধরণের সমস্যা সমাধান করা যায় না।

জঙ্গীবাদ বা ধর্মীয় জঙ্গীবাদীদের মূল লক্ষ্য কি? এমন প্রশ্নের উত্তরে মাহফুজ উল্লাহ বলেন, জঙ্গীরা কিন্তু এ বিষয়গুলো স্পষ্ট করে বলছে না। তাদের যেসব প্রচারপত্র বা অন্যান্য প্রকাশনা পুলিশ আটক করে, তাতে কি বলা হয়েছে পুলিশ সে কথাগুলোও জানায় না। ঐসব প্রকাশনা সম্পর্কে যদি পুলিশ জানাতো তাহলে হয়তো জনগণের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হতো তারা কি চায়। তারা সম্ভবত ইসলামের একটি বিকৃত রূপকে মানুষের কাছে নিয়ে যায় তাদেরকে প্রভাবান্বিত করার জন্যে। যেখানে তারা বলে জেহাদী কর্মকান্ডে অংশ নিয়ে যদি কেউ জীবনকে উৎসর্গ করে তাহলে বেহেশতের দরজা তার জন্যে খোলা থাকবে। তারা যে জেহাদী আহবান জানায় সেটি কিন্তু ইসলামের যে মূল মর্মবাণী তার সাথে এক নয়। তবে যেহেতু তাদের প্রচার পত্র, পত্র পত্রিকা বা প্রকাশনা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায় না সে কারণে তাদের রাজনৈতিক অবস্থানটা সাধারণ মানুষসহ কারো কাছে খুব একটা পরিষ্কার নয় ।

সন্ত্রাস দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, এই বিভ্রান্তি কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আছে। যেমন, তালেবানদের মধ্যে কিন্তু ভালো মানুষও আছে আবার খারাপ মানুষও আছে। যারা খারাপ তারাই এ ধরণের জঙ্গী প্রবণতার জন্ম দিচ্ছে বিভিন্ন দেশে । কাজেই এক্ষেত্রে শিক্ষার বিস্তার ছাড়া বিশেষভাবে ইসলামের যে সত্যিকার রূপ তা যদি প্রসার ঘটানো না যায়, ইসলামী শিক্ষাকে যদি জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা না যায় ,তাহলে কিন্তু এ ধরনের জঙ্গীবাদকে মোকাবেলা করা খুব কঠিন হবে। দেশে স্কুলে যে ধর্ম শিক্ষা দেয়া হয়, সেই ধর্ম শিক্ষার মাধ্যমে ইসলামের সঠিক চিত্র তুলে ধরা সম্ভব নয়। আমাদের স্কুলে এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এমন বিধান থাকা উচিত যাতে সঠিকভাবে স্কুলের বা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীরা কোরআন অধ্যয়ন করতে পারবে এবং এ সম্পর্কে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারবে। তারা যখন সম্যকভাবে এটি উপলব্ধি করতে পারবে, তখন কিন্তু তারা জঙ্গীবাদ বা এ ধরণের কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে অনেক বেশী সোচ্চার হবে। মধ্যপ্রাচ্যে কাজের জন্যে যখন বাংলাদেশীরা যায় তখন সেখান থেকে বা টিভিতে হজ্জ বা অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে যখন অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়, তা দেখে ধর্ম সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে অনেক পরিবর্তন হয়। আর এ বিষয়টি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাথে মিশলে বা কথা বললে বোঝা যায়। যারা ইসলামকে বিকৃত করে এ ধরনের কূপমন্ডুকতা প্রচার করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার একমাত্র হাতিয়ার হচ্ছে সচেতনভাবে ইসলামের যে মৌলিক শিক্ষা সেই শিক্ষাকে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া । তা না হলে কিন্তু কখনোই এর মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না ।

ব্যাখ্যা : সংবাদটি ইরানের রেডিও তেহরানে প্রচারিত সাক্ষাতকার। এ সাক্ষাতকারে গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব মাহফুজ উল্লাহ বলেছেন, জিহাদের সাথে জঙ্গীবাদকে গুলিয়ে কেউ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে সেটা ইসলাম সমর্থন করেনা। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা,অবহেলা, আর জ্ঞানের পরিধির অভাবই ইসলাম বিকৃতির মূল কারণ। পাশাপাশি জঙ্গীবাদ মোকাবেলার কথা সেভাবে আসছেনা যতোটা জঙ্গীবাদের উপস্থিতির কথা বলা হচ্ছে।

আমেরিকা এবং আলকায়েদার মধ্যে সম্পর্ক:

(নয়াদিগন্ত, ২৬ সেপ্টেম্বর; ২০১৩ : দৈনিক জংয়ে হামিদ মীরের লেখা হতে অনুবাদ)

বিশ্বরাজনীতিতে এক জাতির জন্য যেটা ন্যায় অন্য জাতির ক্ষেত্রে তা অন্যায়। যারা জালেমদের সহযোগী, তারাই নিজেদের মজলুমের পক্ষে আছে বলে ঘোষণা দেয়। রাজনীতি ও কূটনীতিতে কোথাও অন্যায়কে ন্যায়, আবার কোথাও ন্যায়কে অন্যায় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। আমাদের মতো সাংবাদিকেরা সর্বদা অন্যায় ও ন্যায়কে আলাদা করতেই ব্যস্ত ব্যাস্ত থাকে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৮তম অধিবেশনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার বক্তব্য আমি মনোযোগসহকারে শুনেছি। এ বক্তব্যের ব্যাপারে আমেরিকা ও ভারতের কিছু সাংবাদিক আমার অভিমত জানতে চান। বললাম, তার কাছে যেটা ন্যায় মনে হয়েছে, আমার কাছে মনে হয়েছে তা অন্যায়। আমার কাছে যাদের মজলুম মনে হয়েছে, তাদের তিনি জালেম মনে করেছেন।

প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেছেন, স্বাধীন-সার্বভৌমতার আড়ালে জালেম শাসকদের হাতে মজলুম মানুষকে নির্বিচারে গণহত্যায় বিশ্বসম্প্রদায় চোখ বন্ধ করে থাকতে পারে না। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ইঙ্গিত ছিল সিরিয়া সরকারের ওপর। এ ব্যাপারে তার অভিযোগ হলো, বাশার আল আসাদ সরকার বিরোধীদের দমনে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেছে। এই বক্তব্যে ওবামা ইসরাইলের প্রতিনীতিতে অটল থাকার ঘোষণাও দিয়েছেন। তিনি কেনিয়ার একটি শপিংমল ও পেশোয়ারে খ্রিস্টানদের একটি চার্চে হামলার নিন্দা করেছেন। তবে তিনি অধিকৃত কাশ্মিরে ভারতীয় সৈন্যদের মানবাধিকার পদদলিত হওয়ার ব্যাপারে একদম নীরব থেকেছেন। বারাক ওবামা যে সময় জাতিসংঘের সদর দফতরে নিজেকে মজলুমদের সঙ্গী বলে ঘোষণা দিচ্ছিলেন, তখনই ভারতের কয়েকটি টিভি চ্যানেলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল ভি কে সিংয়ের একটি স্বীকারোক্তির ওপর বিতর্ক চলছিল। তিনি সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা ফান্ড থেকে অধিকৃত কাশ্মিরে ভারতপন্থী কিছু রাজনৈতিক নেতাকে দেশের স্বার্থের নাম ভাঙিয়ে মোটা অঙ্কের অর্থ দিয়েছেন।

বারাক ওবামার জানা থাকা উচিত, অধিকৃত কাশ্মিরে ভারতীয় সেনাবাহিনী নিত্যদিন মানবাধিকারবিরোধী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। আর তারা তাদের এই অপরাধ ঢাকার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাকে ঘুষ দিচ্ছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর জুলুম নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরার জন্য গোলাম নবী ফাইয়ের মতো কোনো কাশ্মিরি নেতা যদি আমেরিকায় সোচ্চার হন, তাহলে ওবামার প্রশাসন তাকে পাকিস্তানের এজেন্ট আখ্যায়িত করে গ্রেফতার করে। তাকে সন্ত্রাসীদের সহযোগীও বলা হয়। কিন্তু যখন ওবামাকে বলা হয়, জাতিসঙ্ঘের চুক্তি অনুযায়ী কাশ্মির একটি বিবাদপূর্ণ এলাকা। এই চুক্তি বাস্তবায়ন হওয়া দরকার। তখন জবাব আসে, এটা পাকিস্তান ও ভারতের দ্বিপক্ষীয় বিষয়। আলোচনার মাধ্যমে এর সমাধান করা যেতে পারে।

ওবামার বক্তব্য শুনে আমি ভাবছিলাম, সিরিয়ায় জুলুম-অত্যাচার দেখে যিনি সোচ্চার হয়ে ওঠেন, কাশ্মির ও ফিলিস্তিনের ভয়াবহ নির্যাতন কেন তার নজরে পড়ে না। ওবামা তার বক্তব্যে বারবার সাম্রাজ্যবাদ ও সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করেছেন। কিন্তু তিনি একবারো সন্ত্রাসবাদের কারণগুলো নিঃশেষ করার দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেননি। বর্তমানে পাকিস্তানেও সন্ত্রাসবাদের কারণ নিয়ে বিতর্ক চলছে। পাকিস্তানের বেশির ভাগ রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মত হলো, সাম্রাজ্যবাদকে রাষ্ট্রীয় পলিসি হিসেবে ব্যবহার করা ভুল। প্রশ্ন হলো, সাম্রাজ্যবাদকে কি শুধু পাকিস্তানই পলিসি হিসেবে ব্যবহার করছে?

কাশ্মিরের স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, অথচ কাশ্মিরের স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠারও আগে থেকে। আজও কাশ্মিরিদের শহীদ দিবস ১৩ জুলাই। ১৯৩১ সালের একটি ঘটনার প্রেক্ষাপটে দিনটি পালিত

হয়। অথচ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সালে। কাশ্মিরে জিহাদের পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন কাবা শরিফের ইমাম শায়খ আবদুর রহমান আস-সুদাইসসহ বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম। পাকিস্তান কাশ্মিরিদের সহযোগিতা করুক আর না করুক, তাতে কিছু যায় আসে না। তবে যত দিন কাশ্মির সমস্যার সমাধান না হবে, তত দিন এ অঞ্চলের পাহাড়-উপত্যকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না। কাশ্মির স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করতে ভারত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই আফগানিস্তানের পথ দিয়ে পাকিস্তানের গোত্রীয় (উপজাতীয়) অঞ্চলে অনুপ্রবেশ শুরু করে। রাশিয়া আফগানিস্তান দখল করলে ভারত রাশিয়াকে সহযোগিতা করে। অথচ তখন আমেরিকা পাকিস্তানের পথ দিয়ে মুক্তিকামী আফগানদের জিহাদে সহযোগিতা করাকে নিজেদের পলিসি হিসেবে গ্রহণ করে।

পাকিস্তানে জিহাদের শুরুটা হয় আমেরিকার ডলারে। আজ পাকিস্তান যে সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রবাদের মুখোমুখি, তার শেকড় তো মজবুত করেছে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ। এ বিষয়টাকেও উপেক্ষা করা যায় না যে, পেশোয়ারের একটি চার্চে বোমা হামলার ঘটনায় 'জুনদুল্লাহ'র নামও এসেছে। জুনদুল্লাহ নামে একটি সংগঠন ইরানের বেলুচিস্তানে তৎপর রয়েছে।

আমেরিকার বিখ্যাত সাংবাদিক স্যামুর হের্শ (Seymour Hersh) দ্য নিউ ইয়র্কারে (The New Yorker) লিখেছেন, ইরানের শিয়া সরকারকে দুর্বল করার জন্য আমেরিকার সিআইএ সশস্ত্র সংগঠন জুনদুল্লাহকে সাহায্য করে যাচ্ছে। হতে পারে পেশোয়ারের চার্চে বোমা হামলায় অন্য কোনো সংগঠন জড়িত আছে। যদি পাকিস্তানকে বলা হয়, সে তার গোত্রীয় (উপজাতীয়) এলাকার সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে; তাহলে আমেরিকাকেও বলতে হবে যে, তারাও যেন এ অঞ্চলে কোনো সন্ত্রাসী সংগঠনকে সহযোগিতা না করে। আমেরিকার উচিত পাকিস্তানের রাজনৈতিক সরকারকে তার নিজস্ব পন্থায় সন্ত্রাসবাদ নির্মুলের পলিসি গ্রহণ করতে দেয়া। পেশোয়ারের চার্চে হামলার পর সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর সাথে আলোচনার ব্যাপারে জনসমর্থন কমে গেছে। তবে পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলো এখনো এ ব্যাপারে একমত যে, যেসব সন্ত্রাসী সংগঠন আলোচনা করতে চায়, তাদের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে। আর যারা আলোচনা চায় না তাদের সাথে অস্ত্রের ভাষায় কথা বলতে হবে।

সম্প্রতি আলকায়েদা নেতা ডা. আইমান আল জাওয়াহেরির একটি বিস্তারিত বক্তৃতা প্রচারিত হয়েছে। এ বক্তৃতায় তিনি তার সহযোগীদের বলেছেন, তারা যেন মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী শিয়া ও অমুসলিমদের ওপর হামলা না করে। ডা. আইমান আল জাওয়াহেরির অনেক বিষয়ে মতপার্থক্য থাকতে পারে, তা সত্ত্বেও বিশ্লেষকদের অনেকেই তার এই বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছেন। আফগান তালেবানদের মুখপত্র মাসিক শরীয়ত-এর আগস্ট, ২০১৩ সংখ্যায় আবদুর রহিম সাকিব কাতারে তালেবানদের রাজনৈতিক দফতর খোলার প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, আলকায়েদার শরীয়া কমিটির প্রধান আবু হাফস আল মৌরিতানিকে ইরানে গ্রেফতার করা হয়। এখন তিনি মৌরিতানিয়ায় নজরবন্দী আছেন। তাকে যখন ইরান থেকে মৌরিতানিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়, তখন আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র এক কর্মকর্তা তার সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। তিনি জানতে চান, আমরা আফগানিস্তান থেকে সসম্মানে ফেরত যেতে কী করতে পারি? আবু হাফস তাকে বললেন, তালেবানদের সাথে আলোচনা করুন এবং তাদের ন্যায্য দাবিগুলো মেনে নিন।

উল্লেখ্য, আবু হাফস মৌরিতানি সেই ব্যক্তি, যিনি ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ সালে (নাইন ইলেভেন) আমেরিকায় হামলার মূল পরিকল্পনায় পরিবর্তন এনেছিলেন। মূল পরিকল্পনা ছিল, আমেরিকার দশটি বিমান ছিনতাই করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও কার্যালয়ে বিমান হামলা করা হবে। কিন্তু আবু হাফস শুধু নিউ ইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে আমেরিকার সামরিক ও বাণিজ্যিক শক্তির কেন্দ্রে হামলার অনুমতি দান করেন। তালেবান মুখপত্রের এই বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

দ্বারা জানা যায় যে, আফগান তালেবানদের সাথে আলোচনা সফল করতে মার্কিন প্রশাসন চুপি চুপি আলকায়েদার গ্রেফতারকৃত নেতাদের সাথেও সলাপরামর্শ চালিয়ে যাচ্ছে। আফগান তালেবান ও আমেরিকার মাঝে আলোচনা একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। কেউ মানুক আর না মানুক, এই আলোচনা আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত জরুরি। এ জন্য পাকিস্তানেও তালেবানদের যেসব গ্রুপ আলোচনায় সম্মত, তাদের সাথে আলোচনা করা উচিত। আর যারা আলোচনা করতে রাজি নয়, তাদের ব্যাপারে পাকিস্তানের আইন ও শরিয়ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হোক।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

গবেষণায় মাঠপর্যায়ে প্রাপ্ত সাক্ষাতকার বিশ্লেষণ

জঙ্গীবাদ সম্পর্কে আমরা সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের বিশিষ্টজনদের সাক্ষাতকার নিয়েছি। তাদের মতামতগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

সৈয়দ রাশেদ আহমেদ চৌধুরীঃ জাতিসংঘ মহাসচিবের সাবেক বিশেষ দূত এবং কসভোর স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বীকৃতিদানকারী প্রশাসক কূটনীতিক **সৈয়দ রাশেদ আহমেদ চৌধুরী**। চার দশকের অভিজ্ঞ এবং বিভিন্ন দেশে দায়িত্বপালনকালে তার অভিজ্ঞতার আলোকে আন্তর্জাতিক জঙ্গীবাদ প্রসঙ্গে তার মতামত হচ্ছে, নাইন ইলেভেনের পরে বিশ্বব্যাপী জঙ্গীবাদের বিস্তৃতি ঘটেছে। তার মতে, আন্তর্জাতিক একটি গোষ্ঠী বিভিন্ন দেশে শান্তি চায়না। বিশ্বব্যাপী অস্ত্র পরীক্ষা ও বিক্রি করতে সংঘাত ও দ্বন্দ্ব তৈরি করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, ঐতিহাসিকভাবে সাদ্দাম হোসেন মার্কিনীদের আস্থাভাজন ছিলেন। ইরানের সাথে যুদ্ধে তাদের অস্ত্র সাদ্দাম হোসেন প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু স্বার্থের সংঘাত তৈরি হলে ইরাক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে সে গোষ্ঠী ,যদিও পরে এ যুদ্ধ অসার প্রমাণিত হয়েছে। 'ইসলামোফোবিয়া'র নামে সারা বিশ্বের সন্ত্রাসবাদকে ইসলামের সাথে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জুড়ে দেয়া হচ্ছে। এ ইসলামোফোবিয়ার নামে নতুন নতুন যুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছে। ইসলাম ধর্ম পশ্চিমে দ্রুত এগুচ্ছে,একটা সময় মুসলিমরা শাসন করতো স্পেনের কর্ডোভায়। পশ্চিমারা জানে, মুসলমানরা আবারও ক্ষমতায় আসতে পারে। মুসলমানদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হচ্ছে আরব-ইসরাইল দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফিলিস্তিনীদের প্রতি এতো সহিংসতা ও মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা আর কোথাও হয়নি। সে সমস্যার এখনো সমাধান হয়নি। সমস্যাটা জিইয়ে রেখে অন্য জায়গায় সমাধানে যাওয়াটা হাস্যকর। ইসরাইলীদের কাছে পারমাণবিক বোমা আছে, রাসায়নিক অস্ত্র আছে, তারা এনপিটিসহ কোন চুক্তি সই করেনি। ইন্দোনেশিয়া সব সময় এ দ্বন্দ্ব সমাধানের শ্লোগান দিয়ে যাচ্ছে। ভারতে নরেন্দ্র মোদি মুসলিম নিধনের নামে ভারতের গুজরাটে ব্যাপক হত্যাকান্ড চালালেও এখন তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। সম্প্রতি গুজরাট দাঙ্গার জন্য মুসলমানদের কাছে ক্ষমাও চেয়েছেন তিনি। গণমাধ্যমও তাকে এবং তার নীতিকে সমর্থন করছে। অথচ ইসলাম বা মুসলমান শব্দ যেখানে জড়িত, সেখানে গণমাধ্যমের অন্য ধরনের চেহারা দেখা যায়। যেমন, ম্যাসাচুয়েটসে চেচনিয়ান ছাত্ররা বোমা নিক্ষেপ করেছে গণমাধ্যম তাদের চেচনিয়ান হিসেবে চিহ্নিত করে পরিচিত করেছে, অন্যদিকে এক ইহুদী স্কুলে গুলি করে বেশ কিছু স্কুল ছাত্রকে হত্যা করলেও তাকে সেভাবে গণমাধ্যম তুলে ধরেনি। এরকম অসংখ্য উদাহরণ তুলে ধরা যাবে। ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, অতীতে শিক্ষার ব্যয়টা বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার পিছনে মুসলিম শাসকদের ব্যয় অনেক বেশি ছিল,বর্তমানে সারা বিশ্বে বিশেষ করে মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে এটা সবচেয়ে কম। ইহুদীরা এখন বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশি ব্যয় করছে। অল্পশিক্ষিত মোল্লা গোষ্ঠী ব্রিটিশরা সৃষ্টি করেছিল, এরাই পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আন্দোলনকে সমর্থন করেনি। এদের মসজিদে দেয়া বক্তৃতা-বিবৃতিতে এখনো পরিবর্তন আসেনি, তাদের বক্তব্যে এখনো উগ্রবাদিতা লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষা-দীক্ষায় ইহুদীরা আমেরিকায় অনেক বেশি এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ প্রসঙ্গেঃ বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন বাংলাদেশে অটুট। সহনশীলতা, ধর্মীয় সম্প্রীতি বা বন্ধন অত্যন্ত মধুর। পৃথিবীতে এ ধরনের ঘটনা বিরল। যদিও নোয়াখালীর রামগঞ্জে একবারই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে। নির্বাচন পরবর্তী সংখ্যালঘু ইস্যুতে ,রামুতে বৌদ্ধ মন্দিরে হামলার ঘটনায় কোন ব্যক্তিকে আঘাত করা হয়নি। রাজনৈতিক মদদে স্থানীয় সন্ত্রাসীরা এসব কর্মকান্ড করছে, বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

ভবিষ্যতে সম্ভাবনাময় দেশ হয়ে উঠুক যারা এটা চায়না, তারাই মূলত জঙ্গীবাদের সাথে সক্রিয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন ইস্যু তৈরি করে সহিংসতা ছড়ানোর মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রেই বিদেশী শক্তি এগুলোতে ইন্ধন দিচ্ছে। বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ নেই, এমনটা বলা যাবেনা। তবে বাংলাদেশে এ ধরনের কোন ঘটনার সুনির্দিষ্ট শ্বেতপত্র এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের জন্য একটি মহল উঠে পড়ে লেগেছে। সরকার এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ব্যর্থতার জন্যই জঙ্গীবাদের সৃষ্টি বলে তিনি মনে করেন।

সুপারিশমালাঃ রাশেদ আহমদ চৌধুরীর মতে, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সব ইস্যুতে ঐক্যমত প্রয়োজন। বাংলাদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি দমন, সামাজিক বৈষম্য দূর করতে হবে। মাদক, বেকারত্ব, পেশাগত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনা উন্নত করা প্রয়োজন। সামরিক শক্তি ব্যবহার করে জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ, উগ্রবাদ পুরোপুরি দমন করা যাবেনা। দ্বন্দ্ব প্রথমে হৃদয় বা মন থেকে শুরু হয়। শিক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, গণতন্ত্র শক্তিশালী ও সুসংহত করা প্রয়োজন। পশ্চিমা দেশগুলো তাদের সামরিকখাতে ব্যয় কমিয়ে এদেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগ করছেনা। যতোটা তারা জঙ্গীবাদ, অস্ত্র বা অন্যখাতে বিনিয়োগে আগ্রহী, ঠিক ততোটা টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনাগ্রহী, যদিও বিষয়গুলো শুধু মনেই থেকে যায়। বাংলাদেশের মানুষের জন্য আইন, দুর্নীতি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন করলে দেশ সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবে।

ভালো মুসলিম, ভালো হিন্দু, ভালো খ্রীস্টান ও ভালো বৌদ্ধ হতে পারলে ভালো নাগরিক হওয়া যায়। আর একজন সুনাগরিক কখনো অন্যের ক্ষতি করেনা বলে মনে করেন এ সাবেক কূটনীতিক।

এম শফিউল্লাহ, সাবেক কূটনীতিক

জঙ্গীবাদ ও ইসলামী জঙ্গীবাদ শব্দটি এ মুহূর্তে বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত। কারণ এ গোষ্ঠী বাংলাদেশে জনপ্রিয়তার মাধ্যমে নয়, সহিংসতার মাধ্যমে ক্ষমতায় আসতে চায়। সমাজতন্ত্রের পতনের পর এ অবস্থা বাংলাদেশে আদর্শগত কারণে উঠে এসেছে। মাদ্রাসা তথা ধর্মীয় শিক্ষার এবং সামাজিক অনাচারের ফলে এর বিকাশ ঘটে। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জঙ্গীবাদ জনপ্রিয়তা বা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। এরা ক্ষমতায় আসতে জনমত তৈরি করতে পারেনি।

বাংলাদেশের প্রধান ধর্মীয় রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীর শাখা প্রতিটি গ্রামে আছে, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে চালু আছে। মাদ্রাসা শিক্ষিতরা আধুনিক শিক্ষার পরিবর্তে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠে। বাংলাদেশে বহু ধর্মীয় গোষ্ঠী আছে। তাদের আবার নিজস্ব ব্যাখ্যাও আছে। জামায়াতে ইসলামী ভারতে প্রতিষ্ঠিত, ১৯৪৭ এর পরে লাহোরে এর বিকাশ ঘটে এবং পূর্ব পাকিস্তানে এর শাখা খুলে। ১৯৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধে তারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সহায়তা করে। ১৯৭৫ সালের পর বাংলাদেশে এ সংগঠনটি নিষিদ্ধ হয়। ১৫ আগষ্ট পরবর্তী সময়ে জেনারেল জিয়াউর রহমানের সময়ে এ সংগঠনের সদস্যরা আবার বাংলাদেশে রাজনীতি করার সুযোগ পায়। জিয়াউর রহমান ও এরশাদের সময় এদেশে ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিকাশ ঘটে। মুসলিম প্রধান দেশ হওয়ার পরও এরা ক্ষমতায় আসতে পারেনি। জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রের মূলনীতি পরিবর্তন করে ইসলাম ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করে। বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে এরা আরো বিকশিত হয়। এ সময়ে সহিংসতার সূত্রপাত হয়। বামপন্থী সর্বহারারা যখন মানুষের ধন সম্পদ লুট করতো তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এটা নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। তখনই সিদ্দিকুর রহমান বাংলা ভাই এর তৎপরতার বিষয়টি আলোচনায় আসে। তারা মানুষকে হত্যা করে, একটা সময় তাদের কর্মকান্ড মানুষের সমর্থন পায়। সরকারের ব্যর্থতার কারণে সাধারণ মানুষের সমর্থন, এমনকি সরকারী দলের লোকজনের সমর্থনও পায় বাংলা ভাই। নির্বাচনের মাধ্যমে নয়, ভয় ভীতি দেখিয়ে সহিংসতার মাধ্যমে তারা ক্ষমতায়

Dhaka University Institutional Repository

আসতে চায়। ভীতি তৈরির জন্য তারা গণমাধ্যম ব্যবহার করে, সংবাদের সর্বোচ্চ কাভারেজ চায়, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী জনগণকে জানাতে চায়।

সুপারিশমালা: খারাপ সংবাদ গণমাধ্যমের জন্য সবসময় ভালো সংবাদ হয়। প্রতিযোগিতা বা ব্যবসায়িক কারণে তারা এ জাতীয় সংবাদ প্রচার করে। গণমাধ্যমগুলো আবার মালিকানা বা স্বার্থগত কারণে এসব সংবাদ প্রচার করে। অনেকেই সহানুভূতিশীল সংবাদও প্রচার করে। বিজ্ঞাপনের জন্য তারা এটা প্রচার করে। নিজস্ব বিবেচনাবোধ মালিক-সাংবাদিকদের নিজস্ব পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানানো, সিনেমা, শিক্ষা, পুস্তিকা, নাটক, লিফলেটের মাধ্যমে জনসচেতনতা তৈরি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ টেলিভিশন বিস্তৃত কাভারেজ দিতে পারে। মসজিদের ইমাম, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষকরা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। গণতন্ত্রের প্রকৃত শিক্ষা মুসলিম রাষ্ট্রে পুরোপুরি মানা হয়নি। সমাজে অনেক অনাচার ও অবিচার রয়েছে। ধর্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা, জু'মআর খুতবায় সহিংসতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সাংবাদিকরা তাদের সংগঠনের মধ্য দিয়ে সেমিনার, উপসম্পাদকীয়, নিজস্ব নীতিমালার আলোকে দিকনির্দেশনা দিতে পারে, তাদের নিজস্ব আচরণবিধি মেনে চলতে হবে। জঙ্গীবাদ নিয়ে গণমাধ্যম কতটুকু প্রচার করতে পারে, কতটুকু তারা দেখাতে পারে,তাদের কার্যক্রম সন্ত্রাসীদের সহযোগিতা করছে কিনা সে বিষয়েও সচেতন হতে হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেন সাবেক এ রাষ্ট্রদূত।

এম শফিউল্লাহর মতে, বাংলাদেশের মানুষ উদার। তাদের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামি নেই। তারা চরমপন্থায় বিশ্বাসী নয়। যদি তাই হয়, তাহলে আওয়ামীলীগ ও বিএনপি বার বার ক্ষমতায় আসতে পারতো না বলে তার অভিমত। তবে ক্ষমতায় যাওয়ায় স্বার্থে তারা ইসলামিক দলকে ব্যবহার করে, জোট গঠন করে। ২০০১-২০০৬ সাল এ সময়টিতে বাংলা ভাই ও জামায়াতের প্রভাব এবং পরিধি বৃদ্ধি পায় বলে মনে করেন রাষ্ট্রদূত শফিউল্লাহ। এ সময়টিতে সরকার তাদের প্রতিরোধ না করে নীরব থেকেছে। দেশের বাইরের গণমাধ্যমে এটা বেশি নেতিবাচক পরিচিতি পেয়েছে। তাদের নীতি-আদর্শ-উদ্দেশ্য বেশি প্রচারে এসেছে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে।

আফগানিস্তান থেকে যুদ্ধ ফেরত বাংলাদেশীরা ও আইএসআই এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকজন ১৯৯৮-৯৯ সালে দেশে ফিরে জামায়াতের সাথে সম্পৃক্ত হয় বলে তিনি মনে করেন। সাম্প্রতিক সময়ে দেশে রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে বিএনপি ও জামায়াতকে দায়ী করেছে রাষ্ট্রদূতরা। বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট থেকে তারা জামায়াতকে বাদ দেয়ার দাবি জানিয়েছেন ।

জামায়াত গত ৪০ বছরে জাতীয় নির্বাচনে ২-৩ শতাংশ ভোট পেয়ে আসছে। এটাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করা উচিত। বড় রাজনৈতিক দল তাদের সমর্থন না দিলে তারা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে যাবে। সরকার তাদের পর্যবেক্ষণে রেখে জনগণ ভোট না দিলে আর বড় কোন রাজনৈতিক দল তাদের সমর্থন না দিলে তারা এমনিতেই দমে যাবে বলে মনে করেন সাবেক রাষ্ট্রদূত এম শফিউল্লাহ।

মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, বীরপ্রতিক

জঙ্গীবাদ শব্দটিকে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করলে টেরোরিজম বললেও পুরোপুরি বোঝাবে না, এক্সট্রিমিজম বা মিলিট্যান্সি বললেও পুরোপুরি বোঝাবে না। কারণ প্রত্যেক ভাষায় নির্দিষ্ট কিছু শব্দ আছে যেগুলোর দ্যোতনা বা অভিব্যক্তি শুধু ঐ ভাষার জন্যই প্রযোজ্য। তবে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে দু'টি বাংলা শব্দ প্রযোজ্য। এক হচ্ছে চরমপন্থা বা চরমপন্থী আরেকটি হচ্ছে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদী।

জঙ্গীবাদ এবং জঙ্গীবাদী একটি বিশেষ্য ও একটি বিশেষণ। এ দুটি শব্দ বাংলা ভাষায় ক্রমান্বয়ে পরিচিতি পেয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের বদৌলতে। ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৯ তারিখ নিউইয়র্ক সিটিতে টুইন টাওয়ারে আক্রমণের দিন থেকে তিনি এ শব্দটিকে বেশি ব্যবহার শুরু করেন। কিন্তু তিনি ব্যবহার করতেন

Dhaka University Institutional Repository

টেরোরিজম বা ইসলামিক টেরোরিজম। বাংলাদেশে বিগত রাজনৈতিক সরকারের আমলে বিরোধীদল এবং বর্তমান রাজনৈতিক সরকারের আমলের ক্ষমতাসীন দল তথা আওয়ামীলীগ জঙ্গীবাদ শব্দটি ব্যবহার করছে এবং জঙ্গী শব্দটি ব্যবহার করছে উদ্দেশ্যপ্রনোদিত ভাবে এবং একটি ফোকাস নিয়ে। তাদের আলোচনায় জঙ্গীবাদ সাধারণত বাংলাদেশে যারা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে চায় বা মুসলিম বা ইসলামী আইনকানুন বাস্তবায়ন করতে চায় বা সাধারণত ধর্মীয় অনুভূতিকে রাজনৈতিক অঙ্গনে উচ্চারণ করেন, তাদেরকে বোঝানোর জন্য এই শব্দটি তারা ব্যবহার করছেন।

উদাহরণস্বরুপ, চরম বামপন্থী রাজনীতিবিদদের গোপন দলগুলো বাংলাদেশের পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে যে সরকারবিরোধী তৎপরতা চালায়, তাকে বলা হচ্ছে চরমপন্থীদের তৎপরতা বা চরমপন্থা। অথচ বাংলাদেশের অন্যত্র মাদ্রাসা শিক্ষিত ছাত্ররা বা ইসলামপন্থী মানুষ কোন ধরনের সরকার বিরোধী আন্দোলন করতে চায় এবং কোন ক্রমেই বা ঘটনাক্রমে সেটা গোপন হয়, সেটাকে বলা হচ্ছে জঙ্গীবাদ। বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের মাওবাদীরা যে কর্মকান্ড চালাচ্ছে, সেটাকে কোন অবস্থাতেই জঙ্গীবাদ নামে অভিহিত করা হচ্ছে না; সেটাকে মাওবাদী বা চরমপন্থী বলা হচ্ছে। কিন্তু পাকিস্তানের তালেবানদের ঘটনায় তাকে বলা হচ্ছে জঙ্গীবাদ।

সেজন্য বাংলাদেশে ইংরেজী মিলিট্যান্সি শব্দের সাথে মিল রেখে যেটা প্রযোজ্য সেটাই ব্যবহার করা উচিত। কারণ মিলিট্যান্সি শব্দটা টেরোরাইজ বা টেরোরিজম শব্দ থেকে আরো একটু সফট বা নরম এবং একটু ব্যাপক অর্থ বোঝায়।

রাজনৈতিক কর্মকান্ড করতে গিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে আন্দোলনকারীরা যখন ক্রমাগত ভাবে বাধার স্বীকার হয় এবং আইনানুগ ভাবে সে বাধা অতিক্রমের কোন উপায় আন্দোলনকারীদের হাতে থাকে না, তখন তারা বেআইনী পন্থা অবলম্বন করতে চায় এবং সে বেআইনি পন্থার মধ্যে অস্ত্র বা গোলাবারুদের ব্যবহার সহিংস পদ্ধতিতে এসে পড়ে,তাদেরকেই বলা যায় মিলিট্যান্ট গোষ্ঠী বা মিলিট্যান্সি অনুসরণকারী,আর বাংলায় চরমপন্থী বা অপ্রিয় হলেও জঙ্গীবাদী।

টেরোরিজম মানে বাংলায় অনুবাদ করলে সন্ত্রাসবাদ। কিন্তু বাংলাদেশের পরিভাষায় রাজনৈতিক এবং দৈনন্দিন জীবনযাপনের আবহাওয়ায় সন্ত্রাসবাদ বা সন্ত্রাসী বলা হয় যারা পথেঘাটে মানুষ খুন করে, বাড়ীতে গিয়ে আক্রমণ করে, হত্যা, গুমসহ গুরুতর অপরাধ করে। কিন্তু আসলে শব্দটি ব্যাপক অর্থে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের একটি চরম রূপ বা একটি এক্সট্রিম ভাষা। যে নামেই একে ডাকা হোক না কেন, এটা সমর্থনযোগ্য নয়।

অনেকেই প্রশ্ন করেন রাজনৈতিক দলগুলো কেন জঙ্গীবাদের দিকে বা চরমপন্থার দিকে যাবে? যে কোন একটি রাষ্ট্রে আইনানুগ ভাবেই বিরোধী শিবির থাকবে বা থাকতে বাধ্য। কারণ একটি রাষ্ট্রের একশত ভাগ নাগরিক কোনদিন একমতের হবে না। রাষ্ট্র যদি বৈধ রাজনৈতিক দলগুলোকে বৈধ ভাবে তাদের প্রতিবাদ জানানোর সুযোগ না দেয়, রাষ্ট্র বললেও ভুল, রাষ্ট্রের ভালো আইনগুলোকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল যদি সে আইনটিকে বিতর্কিত করে এবং আইনের অপব্যবহার করে বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের কণ্ঠ চেপে ধরে, তাহলে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো বা সরকার বিরোধী আন্দোলনকারীরা চরমপন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। চরমপন্থা অবলম্বন করা বা জঙ্গীবাদ অবলম্বন করাটি খুব প্রিয় সিদ্ধান্ত নয়। এটি আন্দোলনকারীরা সাধারণত বাধ্য হয়ে গ্রহণ করে,অর্থাৎ তাদের চেষ্টার শেষ পর্যায়ে। এই পন্থা অবলম্বন করলেও তাদের জন্য সাফল্য আসবে কেউ জানে না বা নিশ্চয়তা দিতে পারে না। পৃথিবীর বহুদেশে চরমপন্থা অবলম্বন মিলিট্যান্সি বা টেরোরিজম বা ইনসারজেন্সি আন্দোলনকারীকে সাফল্য দিয়েছে, পৃথিবীর বহুদেশে সাফল্য দেয়নি। সেজন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে সমসায়মিক রাজনীতির ছাত্র হিসেবে এটাকে কোন অবস্থাতেই অনুমোদন দেয়া যায়না বলে মন্তব্য করেন সৈয়দ ইবরাহীম। আবার এটাও বলে রাখা যায় যে, জঙ্গীবাদ বা চরমপন্থা মিলিট্যান্সি বা টেরোরিজম বা ইনসারজেন্সি কে দমন করতে গিয়ে আইনের অতিমাত্রা ব্যবহার বা অপব্যবহার এটাকে নিয়ন্ত্রণের বদলে এটার মাত্রা আরো বাড়িয়ে

Dhaka University Institutional Repository

দেয় বা উসকে দেয়। বাংলাদেশে অনেকগুলো আইন আছে, বাংলাদেশে অনেকগুলো বাহিনী আছে এবং বাংলাদেশ সরকার কাউন্টার টেরোরিজম ব্যুরো নামে একাধিক স্থানে অফিস খুলেছে, গত পাঁচ, সাত, আট বছরে বা দশ বছর যাবত। উদ্দেশ্য এ বিষয়টি নিয়ে যেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীর উর্ধতন কর্মকর্তাগণ আনুষ্ঠানিক ভাবে লেখাপড়া করার সুযোগ পায়,চিন্তা করার সুযোগ পায় এবং নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, পৃথিবীব্যাপি জঙ্গীবাদী মিলিট্যান্সি বা চরমপন্থার বা সন্ত্রাসবাদের বা ইনসারজেন্সি রূপ ব্যাপকতা, উদ্দেশ্য, সাংগঠনিক তৎপরতা কোনদিন হুবহু বা এক রকম হয় না।

সুপারিশমালা: বাংলাদেশে এ ধরনের কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করতে হলে বাংলাদেশের পরিমন্ডল, আবহাওয়া, চিন্তাচেতনা মাথায় নিয়ে কাজ করতে হবে। মিডিয়ার সাথে মিলিট্যান্সির সম্পর্ক আছে এটা বাস্তব। অর্থাৎ টেলিভিশন ক্যামেরা এবং সংবাদ বা তথ্য আধুনিক যুগে একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। এই অস্ত্রটিকে কেউ ব্যবহার করতে পারে,কেউ অপব্যবহার করতে পারে।মিডিয়া বা তথ্য প্রচারকারীগণ বা তথ্য গোপনকারীও হতে পারেন বা অতিমাত্রায় প্রচারকারীও হতে পারেন অথবা তথ্য বিকৃত ভাবে উপস্থাপনকারীও হতে পারেন। কোন সংবাদটি জনগণকে জানালে জনগণের উপকার হবে, কোন সংবাদটি জনগণকে জানালে জনগণের আবেগে আঘাত আসবে না, কোন সংবাদটি জানালে সরকার পদক্ষেপ নিতে পারবে, এ বিবেচনা বাংলাদেশের মিডিয়া জগতে এখন পর্যন্ত পুরোমাত্রায় আসেনি।

বাংলাদেশের মিডিয়া উন্মুক্ত, অনেকে বলে আংশিক ভাবে উন্মুক্ত,বাংলাদেশের সাংবাদিকরা বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বহুপ্রকারের সংবাদ দেখায় বা অভিনব ভাবে বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান দেখাচ্ছে, যেমন ক্রাইম রিপোর্টিং। টেকনোলোজি বা কারিগরি উৎপত্তি যতবেশি বিকশিত হচ্ছে, তত বেশি সংবাদ প্রচারে ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে, একজন রিপোর্টার একটি ঘটনাকে বলতেই পারেন জঙ্গীবাদীরা এমনটা করেছে, তার মুখ দিয়ে যখন একটি শব্দ বেরিয়ে যায় তখন আরেকজন রিপোর্টার তা কপি বা অনুকরণ করেন এবং ঘরে আলোচনার সময় চায়ের দোকানে আলোচনার সময় মানুষ বলে জঙ্গীবাদীরা করেছে। কারণ শব্দটি তার কানে এসেছে। আর যদি একজন রিপোর্টার এটাকে দুর্ঘটনা হিসেবে প্রচার করেন বা অন্য শব্দ ব্যবহার করেন তখন মানুষ ঐ একই শব্দ ব্যবহার করতে শিখে। এমন কিছু ঘটনা যা বেশি বেশি দেখানো হলে মানুষ উত্তেজিত হতে থাকে, দর্শকরাও উত্তেজিত হয়। আবার এমন কিছু ঘটনা আছে যা দেখালে মানুষ, দর্শক বা জনগণ আবেগাপ্লুত হয়ে সাহায্যের হাত বাড়াতে চায়। কথাটি বলার অর্থ হচ্ছে, যারা আন্দোলন করে চরমপন্থা চান তারাও অনেক সময় প্রচার চান। আবার অনেক সময় তাদের ঘটনাটি প্রচার না করাই সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলজনক। এ দুয়ের মাঝ খানের ভারসাম্য কোন জায়গায় অবস্থিত, এটা হুবহু চিকন পেন্সিল দিয়ে কাগজের উপর এঁকে দেয়া সম্ভব নয়। এটা নির্ভর করে বিবেকের উপর, দেশপ্রেমের উপর,জ্ঞান ও পরিবেশে সচেতনতার উপর। মিডিয়া ইচ্ছে করলে একজন ব্যক্তিকে জঙ্গী এবং একটি ঘটনাকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে রুপ দিতে পারে। মিডিয়া ইচ্ছে করলে একে সন্ত্রাস বা জঙ্গীবাদী না বানিয়ে একজন স্বাভাবিক আন্দোলনকারী বানাতে পারে। বাংলাদেশের মিডিয়া সম্বন্ধে অনেকের ধারণা, এখানে বেশিরভাগ মানুষ ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি ঝুঁকে আছে অথবা ধর্মবিশ্বাসহীনতার (নাস্তিকতা নয়) প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। ফলশ্রুতিতে যারা ধর্মবিশ্বাসকে প্রাধান্য দেয়, তারা মিডিয়ার নিকট একটি কঠিন পরীক্ষায় দাঁড়ায়। বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ নিয়ে লেখাপড়া ও গবেষণা কম হয়েছে, সেজন্য পত্রিকার কলাম, টিভি ও সংবাদপত্রের রিপোর্টই এক্ষেত্রে জানার প্রধান উপাদান। আনুষ্ঠানিকভাবে গবেষণা করে মিডিয়া কিভাবে ভালো মানুষকে সন্ত্রাসী বানিয়েছে, আবার একজন সন্ত্রাসীকে গণমাধ্যম কিভাবে ভালো মানুষ বানিয়েছে, সে বিষয়গুলো তুলে আনা উচিত।

ভিডিও বার্তায় বিএনপির কর্মসূচী ঘোষণাকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লাদেনের সংগঠন বা আল কায়েদার সাথে তুলনা করেছেন এ বিষয়ে জেনারেল ইব্রাহীমের মন্তব্য হচ্ছে ,যেহেতু বার্তা প্রদানকারীর গ্রেফতারের আশংকা আছে,

তাই এটাকে তিনি রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে নিয়েছেন এতে দোষের কিছু নেই। উদাহরণ হিসেবে কুষ্টিয়ায় বসে প্রধানমন্ত্রী রিমোট কন্ট্রোল চেপে রামপাল বিদ্যুত কেন্দ্র উদ্বোধন করেছেন।
জঙ্গীবাদ শব্দটি পশ্চিমা বিশ্ব খুব খায়, বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারকে অনেকেই বলেন ভারত প্রীতি বা নাস্তিকতা পন্থী, তাই ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার জন্য জঙ্গীবাদ শব্দটি তারা খুব বেশি ব্যবহার করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এবং তাদের প্রতি অনুরক্ত গণমাধ্যম এ বিষয়টি বেশি বেশি প্রচার করে।

মাহবুব হোসেন, অতিরিক্ত ডিআইজি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ (রাজনৈতিক)

জঙ্গীবাদ একটি আন্তর্জাতিক বিষয়। জঙ্গীবাদকে মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে একীভূত করা ঠিক নয়।একে আধুনিকীকরণের আওতায় না আনা এবং অবহেলা করা ঠিক হয়নি। শুধুমাত্র মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ বা উন্নয়ন করা হলে এটাই উন্নত বিশ্বে ঈর্ষার কারণ হতে পারে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ শব্দটি এক দশকের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে। ১৯৯১ এ জামায়াতে ইসলামী যখন জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করলো। পরবর্তী এক দশকে মন্ত্রীত্ব নিলো তখন জামায়াতের মধ্যে যারা সশস্ত্র বিপ্লব চাইতো বা জেহাদী মনোভাব সম্পন্ন নেতা কর্মীরা জামায়াত ত্যাগ করে জঙ্গীবাদী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হলো।এর সাথে রাজনৈতিক স্বার্থপরতা, দারিদ্র, বেকারত্ব ও হতাশাগ্রস্ত অল্প শিক্ষিত মানুষ সম্পৃক্ত হয়ে বিভিন্নভাবে নাশকতা বা বোমা হামলার চেষ্টা চালায় বা বিচ্ছিন্নভাবে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালায়। এদের উদ্দেশ্য ভয় দেখানোর পাশাপাশি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা।প্রচলিত রাজনীতির পাশাপাশি তারা নিজেদের একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার অপতৎপরতা চালায়। তবে ২০০১-২০০৬ সালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের সময় সর্বহারাদের লুটতরাজ, অপহরণ ধর্ষণের কারণে রাজশাহী অঞ্চলের পরিস্থিতি নাজুক হয়। তখন জেএমবি বা জাগ্রত মুসলিম জনতার ব্যানারে বাংলাভাই ওরফে সিদ্দিকুর রহমান, শায়খ রহমানের নেতৃত্বে কিছু লোক তাদের কর্মকান্ডকে চ্যালেঞ্জ করে। তারা পাল্টা কৌশল হিসেবে সর্বহারাদের দমন করার নামে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়। বাংলাদেশের ঐ অঞ্চলের মানুষ এতে কিছুটা শান্তি পায়। এরপর শায়খ রহমান ও বাংলাভাই সরকারের নেতাদের আনুকূল্যে আরো বেপরোয়া হয়ে নিজেদের আদর্শ উদ্দেশ্য বা বিপ্লবের পথে আরো উগ্র কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হয়। যার ফলশ্রুতিতে বেশ কিছু অপকর্মও তারা করে ফেলে। এদেরই একজন মুফতি হান্নান, ২১ শে আগষ্ট গ্রেনেড হামলা, কোটালীপাড়ায় ৭৬ কেজি বোমা পুঁতে রাখা সহ বেশকিছু ঘটনায় সে জড়িত। তবে বাংলাদেশে স্বাভাবিক গণতন্ত্র বা বাকস্বাধীনতা ব্যাহত হলে তখনই জঙ্গীবাদের বিকাশ ঘটে।

সুপারিশমালাঃ বাংলাদেশের মাটি, মানুষের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও মানুষের মন জঙ্গীবাদের উপযোগী নয় বলে মনে করেন পুলিশের বিশেষ শাখার এ কর্মকর্তা। জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে মসজিদের ইমাম, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনুপ্রাণিত করতে হবে, যাতে তারা সমাজের সাধারণ মানুষকে ধর্ম, ইসলাম ও জঙ্গীবাদ সম্পর্কে ইসলামের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারেন। এর কুফল সম্পর্কে বোঝাতে পারেন। জঙ্গীবাদ ও ইসলাম এক নয়। যারা একে একাকার করতে চায় তাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন।

বাংলাদেশের গণমাধ্যম জঙ্গীবাদ নির্মূলে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে চলেছে। নিয়মিত নিষিদ্ধ সংগঠনের কার্যক্রম মনিটরিং, গ্রেপ্তার, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সচল, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত ও সুস্থ্য সংস্কৃতির বিকাশ অব্যাহত রাখতে হবে। বাংলাদেশের মানুষ ও সরকারের আপোষহীন নীতির কারণে জঙ্গীবাদ বেকায়দায় আছে বলে মনে করেন স্পেশাল ব্রাঞ্চের অতিরিক্ত ডিআইজি মাহবুব হোসেন।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

পর্যবেক্ষণ, সুপারিশমালা ও উপসংহার

জঙ্গীবাদী বা চরমপন্থীদের অবস্থান যে বাংলাদেশে আছে তা ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সালের ঘটনায় নতুন করে প্রমাণ হয়েছে। কাশিমপুর কারাগার থেকে ময়মনসিংহ নেয়ার পথে ত্রিশালে তিন জঙ্গীকে ছিনিয়ে নেয়ার ঘটনা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এক পুলিশ সদস্যকে নিহত ও ৩ জনকে আহত করে তাদের ছিনিয়ে নেয়ার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় নতুন করে নড়েচড়ে উঠে প্রশাসন। বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ বিষয়টি অত্যন্ত কৌতুহলের। জঙ্গী সংগঠনগুলো কেন তৈরি হয়, এর কারণ কি, তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি? এ বিষয়গুলো জানা প্রয়োজন। জঙ্গীবাদের সাথে জড়িতরাও তো এদেশেরই মানুষ। শান্তিপূর্ণ উপায়ে দাবি আদায়ে না গিয়ে কেন জঙ্গীবাদের পথে যায় তারা। জঙ্গীদের কে বা কারা অর্থায়ন করে, এর সাথে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পর্ক আছে কিনা, থাকলে কতখানি? নির্বাচনের সময় কেন জঙ্গীবাদ শব্দটির ব্যবহার বেড়ে যায়, এর যৌক্তিকতা এবং উদ্দেশ্য এবং সর্বোপরি জঙ্গীবাদ নির্মূলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও গণমাধ্যমের ভূমিকা কতখানি এবং তারা সবসময় সেটা পালন করেন কিনা সেটাও মানুষের আগ্রহের বিষয়। জঙ্গীরা গণমাধ্যম ব্যবহার করে, না কি গণমাধ্যম জঙ্গীদের ব্যবহার করে এ প্রশ্নটিও এখন জোরালো হয়ে এসেছে। সাদামাটা বা খোলামেলাভাবে এসব কিছু জানতে গিয়ে অনেকের সাথে কথা বলতে হয়েছে, অনেক বই থেকে তথ্য উপাত্ত নিতে হয়েছে, বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করতে হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের সাথে খোলাখুলি কথা বলতে হয়েছে। জঙ্গীবাদের সাথে সংশ্লিষ্টরা মাঝে মধ্যেই নিজেদের শক্তি অথবা উপস্থিতি জানান দিচ্ছে, কোন রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের আশ্রয়ে, স্থানীয় পর্যায়ে অথবা কেন্দ্রীয় নেতাদের আশির্বাদেও হতে পারে সেটা।

বাংলাদেশে ১৯৯৯ সালে বেশ কিছু ঘটনার মধ্য দিয়ে জঙ্গীবাদের সূচনা ঘটলেও থেমে থেমে এ জাতীয় ঘটনা কিন্তু একেবারে কমও হয়নি। রমনা বটমূলে বোমা হামলা, যশোরে উদীচির সম্মেলনে বোমা হামলা, ময়মনসিংহে সিনেমা হলে বোমা হামলা, কোটালীপাড়ায় ৭৬ কেজি বোমা পুঁতে রাখা, ১৭ আগস্ট একযোগে ৬৩ জেলায় বোমা বিস্ফোরণ, ২১ শে আগস্ট আওয়ামীলীগ সভানেত্রীর জনসভায় বোমা হামলার ঘটনাগুলো কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে ভেবে নেয়ার অবকাশ নেই। যদিও সরকারী দলের নেতারা সবসময় বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলেই চালিয়ে নিজেদের দোষ-ত্রুটিমুক্ত ভাবতে শুরু করেন। এতগুলো ঘটনা ঘটে গেল বিগত চৌদ্দ বছরে, সে তুলনায় অপরাধীদের গ্রেফতারে বিভিন্ন সরকারের আন্তরিকতা কিন্তু স্বাভাবিক নয়। এসব অপরাধ ও অপরাধ পরবর্তী ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করেও সঠিক কোন দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়নি। বরং বছরের পর বছর রাজনৈতিকভাবে ঝুলে ছিল স্পর্শকাতর এসব ইস্যু।

জেএমবির প্রতিষ্ঠাতা সিদ্দিকুল ইসলাম বাংলা ভাই এবং শায়খ আব্দুর রহমান ও তার ভাই আতাউর রহমান সানিসহ ১০জনকে ৬৩ জেলায় বোমা হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত করা হয় বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে। সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে তাদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়। ২১ শে আগষ্ট গ্রেনেড হামলার ঘটনায় একসদস্যবিশিষ্ট একটি বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছিল। সেখানেও দেখা যায়, কমিশনের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট আলোর মুখ দেখেনি। শুধু পাঁচটি সুপারিশমালা সংবাদপত্রে ছাপানো হয়েছিল। অর্থাৎ জঙ্গীবাদ নিয়ে সব সময়ই একটি চোর-পুলিশ খেলা চলেছে। জঙ্গীবাদের বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত কোন সংজ্ঞাও এখনো নিরুপণ হয়নি। তাই এর রাজনৈতিক ব্যবহার বেশি হয়ে থাকে। সারা বিশ্বে মুসলিম ও অমুসলিম বুদ্ধিজীবী-গবেষকরা জঙ্গীবাদের যেসব কারণ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর অন্যতম হচ্ছে: ১.ইসলাম ২.ইসলামী শিক্ষা ৩.ওহাবী মতবাদ ও ৪.পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ধর্মঃ

অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত জঙ্গীবাদের জন্য ইসলাম ধর্মকে দায়ী করেন। তাদের মতে, ইসলাম তার অনুসারীদের অসহিষ্ণুতা ও জঙ্গীবাদ শিক্ষা দেয়। ইসলামে জিহাদের নামে অমুসলিমদেরকে হত্যা করার উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে। আর এর ফলেই মুসলিমদের মধ্যে জঙ্গীবাদের উত্থান। তাদের মতে ইসলামী সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ বন্ধ করার একমাত্র উপায় ইসলাম ধর্মকে নির্মুল অথবা নিয়ন্ত্রণ করা। এরা দাবি করেন যে, ইসলামী সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। একে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। বিশ্বব্যাপী জঙ্গীবাদের উত্থান 'সভ্যতার সংঘাত' তত্ত্বের সঠিকত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

এক্ষেত্রে মানব সভ্যতার সংরক্ষণের জন্য এই জঙ্গীবাদ নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায় হলো, শক্তির মাধ্যমে এদেরকে হত্যা করা, বন্দি করা ও মুসলিম দেশগুলিকে সামরিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। বিশেষত, ইসলামী শিক্ষার বিস্তার রোধ করা। এ সকল গবেষক-পণ্ডিতদেরকে মুসলিমগণ 'ইসলাম-বিদ্বেষী' বলে মনে করতে পারেন, তবে এদের অনেকের ক্ষেত্রেই এরূপ মতপ্রকাশের জন্য বিদ্বেষের চেয়ে অজ্ঞতাই বড় কারণ। এদের অনেকেই ইসলামের জিহাদ বিষয়ক কিছু নির্দেশ হয়ত পাঠ করেছেন, কিন্তু জিহাদের প্রকৃত অর্থ, শর্ত বা বিধানাবলি জানেন নি। এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিম ধর্ম-প্রচারক বা ধর্মগুরুদের প্রচারণামূলক বইপুস্তকই পাঠ করেছেন, ইসলামী জ্ঞানের সূত্রগুলি থেকে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করেন নি। এরা দেখছেন যে, কোনো কোনো মুসলিম নির্বিচারে নিরপরাধ মানুষ হত্যা করছে এবং এজন্য তারা ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কুরআনের উদ্ধৃতি পেশ করছে, কাজেই তাঁরা ধারণা করেন যে, কুরআন শিক্ষা দিয়ে থাকে। এভাবেই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, এই জঙ্গীবাদের জন্য ইসলামই দায়ী এবং ইসলামকে নির্মুল বা নিয়ন্ত্রণ করাই এই সমস্যা দূরীকরণের একমাত্র উপায়।

পাশ্চাত্যের অনেক পণ্ডিত, যারা বিভিন্ন মুসলিম সমাজ ও জনগোষ্ঠির সাথে সুপরিচিত বা ইসলাম ধর্ম ও ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা পরিচিত, তারা উপযুক্ত মতামত পুরোপরি সমর্থন করেন না। তারা মনে করেন, ইসলামে অনেক ভাল কথা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং ইসলামী সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার সহঅবস্থান সম্ভব। তবে ইসলামের মধ্যে ভাল বিষয়ের সাথে জিহাদ, ধর্মত্যাগ, বিধর্মীদের সাথে যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ক কিছু উগ্র ও অসহিষ্ণু বিষয়ও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যেগুলো মানবাধিকার বা সভ্যতার সহঅবস্থান বা বিকাশের বিপক্ষে। এ সকল শিক্ষা থেকেই জঙ্গীবাদের জন্ম। এজন্য জঙ্গীবাদ দমনের জন্য ইসলামের 'ভাল শিক্ষাগুলোর' প্রশংসা করতে হবে ও সেগুলোর বিকাশ ঘটাতে হবে। পাশাপাশি উগ্র বা 'খারাপ' শিক্ষার বিস্তার রোধ করতে হবে। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে। এ থেকে 'উগ্রতা' উৎসাহ দিতে পারে এরূপ শিক্ষা বাদ দিতে হবে। এভাবে মুসলিম সমাজে 'মডারেট ' মুসলিমদের উত্থান হবে।

ইসলামী শিক্ষাঃ

ইসলাম ধর্মই জঙ্গীবাদের জন্য যদি দায়ী হতো তবে মুসলিমের কাজে মধ্যে জঙ্গীবাদের আগ্রহ বা প্রেরণা লক্ষ করা যেত। মুসলিম পরিবারে বা সমাজে লালিত পালিত সকল ধার্মিক বা অধার্মিক মুসলিমই ইসলাম সম্পর্কে কমবেশি কিছু শিক্ষা পরিবার, প্রতিষ্ঠান বা সমাজ থেকে পেয়েছেন। কিন্তু কখনোই তারা অমুসলিম বা অন্যান্য মতাবলম্বীদের প্রতি অসহিষ্ণুতার শিক্ষা পাননি। সকল মুসলিম সমাজেই মুসলিম অমুসলিমদের সাথে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সাথে বসবাস করে আসছেন। কাজেই জঙ্গীবাদের জন্য ইসলাম কখনো দায়ী হতে পারে না। সমস্যা থাকলে অন্য কোথাও রয়েছে, ইসলামের মধ্যে নয়। তাঁরা অস্বীকার করেন না যে, কিছু মুসলিম সন্ত্রাসের সাথে জাড়িত। তবে তারা কখনোই স্বীকার করেন না যে, তাদের ধর্ম তাদের সন্ত্রাসের জন্য দায়ী। বরং এ সকল সন্ত্রাসীদের ব্যক্তিগত বিভ্রান্তি, মানসিক বিক্ষুব্ধতা, সামাজিক অনাচার বা অন্য কোনো কারণ এর পিছনে কার্যকর।

এদের অনেকেই মনে করেন যে, জঙ্গীবাদের উত্থানের জন্য মূলত দায়ী ইসলামী শিক্ষা বা মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার। কেউ মনে করছেন যেহেতু ইসলামের মধ্যেই জঙ্গীবাদের শিক্ষা রয়েছে, সেহেতু ইসলামী ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষার প্রসার মানেই জঙ্গীবাদের প্রসার। যত বেশি কুরআন, হাদীস, ফিকহ ইত্যাদি ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষা প্রসার লাভ করবে, ততোই বেশি 'জিহাদী' মনোভাব, অন্য ধর্ম ও অন্য মতের প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাব ও মোল্লাতান্ত্রিক স্বৈরাচারী সরকার জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়ার মনোভাব প্রসার লাভ করবে। এজন্য ইসলামী শিক্ষা বা ইসলামের ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষার প্রসার রোধই জঙ্গীবাদ দমনের প্রধান উপায়।

আবার অনেকে মনে করেন যে, ইসলামের মধ্যে মূলত জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসের কোনো স্থান নেই, তবে ইসলামী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান বা মাদ্রাসাগুলোতে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। অথবা এগুলোর পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী ইসলামকে জঙ্গীবাদী রূপদানের সহায়ক। অথবা ইসলামী আবেগের অপব্যবহার করে এ সকল প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষকদেরকে সহজেই জঙ্গীতে রূপান্তরিত করা যায়। কেউ মনে করছেন, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবেই ইসলামের শিক্ষা প্রদান করছে, তবে সম্ভবত শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে কিছু বিচ্যুতি রয়েছে, যে কারণে এগুলো জঙ্গীবাদের সাথে জড়িত হয়ে গিয়েছে। এদের মতে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারই জঙ্গীবাদ রোধের উপায়। "It is a fact that some of the Madrasha students have got involved with what is called 'Islamic' militancy…. Though Madrasha education may not be held responsible for these most unwanted activities, yet there are some loopholes and it is time to think about bringing Madrasha education into the mainstream."

ইসলামী জঙ্গীবাদের জন্য 'ইসলাম'-কে দায়ী করলে যেমন মুসলিমগণ হতবাক, বিস্মিত, ব্যথিত বা উত্তেজিত হয়ে এইরূপ মতকে বিদ্বেষমূলক বলে মনে করেন, ইসলামী শিক্ষা বা মাদ্রাসার সাথে জড়িত মানুষরাও এই দ্বিতীয় মতটির বিষয়ে একইরূপ বিস্ময়, ব্যথা বা উত্তেজনা অনুভব করেন।

তারা অনুভব করেন যে, যদি ইসলামী শিক্ষা বা মাদ্রাসা শিক্ষাই জঙ্গীবাদের জন্য দায়ী হতো তবে আমরা মাদ্রাসার সকল ছাত্র শিক্ষক আমাদের মধ্যে জঙ্গীবাদের আগ্রহ বা প্রেরণা অনুভব করতাম। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কখনোই তা নয়। সন্ত্রাস, হত্যা ও ধ্বংসের প্রতি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা ও বিরোধিতা অনুভব করছেন এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসা আলেম, ইমাম ও পীর-মাশায়েখ। বিগত প্রায় আড়াই শত বৎসর ধরে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা উপমহাদেশে চালু রয়েছে এবং মূলত একই পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী অনুসরণ করে চলেছে। এছাড়া অনুরূপ পদ্ধতির অগণিত মাদ্রাসা মালয়েশিয়া ও অন্যান্য মুসলিম দেশে চালু রয়েছে। এগুলো থেকে বের হয়ে আসা অগণিত মানুষ সমাজের বিভিন্ন স্তরে কাজ করেছেন, কিন্তু ইতিহাসের কোনো পর্যায়েই তাঁরা সন্ত্রাসের জন্ম দেন নি। তাঁরা অস্বীকার করেন না যে, কিছু মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষক এই অপরাধের সাথে জাড়িত; তবে তারা কখনোই বিশ্বাস করেন না যে, তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের এই অপরাধের জন্য দায়ী। বরং তা তাদের ব্যক্তিগত বিভ্রান্তি।

সংবাদ মাধ্যমের সংবাদ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিষয়। এরূপ সংবাদ, গণমাধ্যমীয় গবেষণা-প্রবন্ধ ও পর্যালোচনার উপর নির্ভর করে আমেরিকার জনগণ নিশ্চিত বিশ্বাস করেছিল যে, সাদ্দাম হোসেনের কাছে গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র (weapon of mass destruction) রয়েছে, যা আমেরিকার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য ভয়ঙ্কর হুমকি। আর এজন্যই তারা একবাক্যে প্রেসিডেন্ট বুশকে ইরাক যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছিলেন। লক্ষ লক্ষ মানব সন্তানের রক্ত ঝরানো এবং অমূল্য মানবীয় সম্পদের ধ্বংসলীলার পরে সবাই জানতে পারলেন ও স্বীকার করলেন যে, এরূপ কোনো অস্ত্র কোনোকালেই সেখানে ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদ মাধ্যমের কারণেই এখনো সবাই জানলেন না যে, এরূপ অস্ত্র থাকলেও কোনো দিনই ইরাক আমেরিকার স্বাধীনতা বা নিরাপত্তার হুমকি হতে পারত না। শুধু ইসরাইল রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার জন্যই এ গণহত্যা। সংবাদ মাধ্যমের কারণেই এশিয়ার সুনামি মহা সংবাদে পরিণত হয়, কিন্তু ফালুজার গণহত্যা ও মহাধ্বংস কোনো সংবাদই হয় না।

এজন্য গণমাধ্যমের সংবাদ বা তথ্যের উপর নির্ভর করা তো দূরের কথা, সুপ্রশিক্ষিত 'ইন্টেলিজেন্সী'র সুনিশ্চিত রিপোর্টের উপর নির্ভর করাও কঠিন। এ সকল তথ্যের বাইরে বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের আনাচে কানাচে অগণিত মাদ্রাসা ছড়িয়ে রয়েছে। এ সকল মাদ্রাসার কর্মকাণ্ড সবকিছুই সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত। এগুলোর ছাত্র শিক্ষক সকলেই সমাজের সাথে বিভিন্নভাবে জড়িয়ে রয়েছেন। এদের মধ্যে কোনো সন্ত্রাসীর অস্তিত্ব নাই। মাদ্রাসা শিক্ষিত যে সকল মানুষ জঙ্গীবাদের সাথে জড়িত হয়েছেন বলে আমরা শোনা যায় তাদের আনুপাতিক হার স্কুল-শিক্ষিত মানুষদের চেয়ে বেশি নয়। এ সন্ত্রাসের উদ্ভব 'মাদ্রাসা-শিক্ষিত গুরুদের' দ্বারা নয়, বরং সাধারণ-শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিকতা থেকে ধার্মিকতায় রূপান্তরিত 'গুরু' ও 'মুফতি'দের দ্বারা। এখানে দু'চার জন মাদ্রাসা শিক্ষিত মানুষ প্রভাবক বা প্রতারক নয়, বরং প্রভাবিত ও প্রতারিত। সন্ত্রাস বা জঙ্গীবাদের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাকে দায়ী করে মাদ্রাসা শিক্ষা, মাদ্রাসা বা মাদ্রাসা শিক্ষিতদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিলে স্বভাবতই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে সহিংসতায় লিপ্ত হবেন এবং 'ইসলাম' ও 'ইসলামী শিক্ষা'-র বিপন্নতাকে অজুহাত হিসেবে পেশ করবেন। এতে একমাত্র সন্ত্রাসীরাই লাভবান হবে এবং জাতি ভয়ঙ্কর সংঘাতের মধ্যে নিপতিত হবে।

ওহাবী মতবাদ:

'ওহাবী মতবাদ'-কে জঙ্গীবাদের কারণ হিসেবে অনেক গবেষক উল্লেখ করছেন। বর্তমান সৌদি আরবের ধর্মীয় নেতা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব (১৭০৩-১৭৯২ খৃ) প্রচারিত মতবাদকে 'ওহাবী' মতবাদ বলা হয়। তিনি তৎকালীন আরবে প্রচলিত কবর পুজা, কবরে সাজদা করা, কবরে বা গাছে সুতা বেঁধে রাখা, মানত করা ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রকারের কুসংস্কার, শিরক, বিদ'আত ইত্যাদির প্রতিবাদ করেন। তার বক্তব্য শুধু প্রতিবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। উপরন্তু তাঁর বিরোধীদের তিনি মুশরিক বলে অভিহিত করতেন। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে বর্তমান সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের অনতিদূরে অবস্থিত দিরইয়্যা নামক ছোট্ট গ্রাম-রাজ্যের শাসক আমীর 'মুহাম্মাদ ইবনু সাঊদ (মৃত্যু ১৭৬৫) তার সাথে যোগ দেন। তাদের অনুসারীগণ তাদের বিরোধীদেরকে মুশরিক বলে গণ্য করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালন শুরু করেন। ১৮০৪ সালের মধ্যেই মক্কা-হিজায সহ আরব উপদ্বীপের অধিকাংশ 'সউদী'-'ওহাবী'দের অধীনে চলে আসে।

তৎকালীন তুর্কী খিলাফত এ নতুন রাজত্বকে তার আধিপত্য ও নেতৃত্বের জন্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বলে মনে করেন। কারণ একদিকে মক্কা-মদীনা সহ ইসলামের প্রাণকেন্দ্র তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়, অন্যদিকে মূল আরবে স্বাধীন রাজ্যের উত্থান মুসলিম বিশ্বে তুর্কী খিলাফতের একচ্ছত্র নেতৃত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য তুর্কী খলীফা দরবারের আলিমগণের মাধ্যমে ওহাবীদেরকে ধর্মত্যাগী, ধর্মদ্রোহী, কাফির ও ইসলামের অন্যতম শত্রু হিসেবে ফাতোয়া প্রচার করেন। তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র এদের বিরুদ্ধে জোরালো প্রচারাভিযান চালানো হয়, যেন কেউ এই নব্য রাজত্বকে ইসলামী খিলাফতের স্থলাভিষিক্ত মনে না করে। পাশাপাশি তিনি তুর্কী নিয়ন্ত্রণাধীন মিসরের শাসক মুহাম্মাদ আলীকে ওহাবীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ পরিচালনার নির্দেশ দেন। মিশরীয় তুর্কী বাহিনীর অভিযানের মুখে ১৮১৮ সালে সউদী রাজত্বের পতন ঘটে। এরপর সউদী রাজবংশের উত্তর পুরুষেরা বারবার নিজেদের রাজত্ব উদ্ধারের চেষ্টা করেন। সর্বশেষ এই বংশের 'আব্দুল আযীয ইবনু আব্দুর রাহমান আল-সাউদ (১৮৭৯-১৯৫৩) ১৯০১ থেকে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে বর্তমান 'সৌদি আরর প্রতিষ্ঠা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে মুসলিম বিশ্বের যেখানেই সংস্কারমূলক কোনো দাওয়াত প্রচারিত হয়েছে, তাকেই সৌদি ওহাবীগণ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহাবের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত বা 'ওহাবী আন্দোলন' বলে দাবি করেছেন। অপরদিকে তুর্কী প্রচারণায় 'ওহাবী' শব্দটি মুসলিম সমাজে অত্যন্ত ঘৃণ্য শব্দে পরিণত হয়। তাদেরকে অন্যান্য সকল বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের চেয়েও অধিকতর ঘৃণা করা হয়। ফলে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার বৃটিশ বিরোধী আলিমদেরকে ওহাবী বলে প্রচার করতেন; যেন সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে তাদের গ্রহণযোগ্যতা না থাকে। এছাড়া মুসলিম সমাজের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় একে অপরকে নিন্দা করার জন্য 'ওহাবী' শব্দের ব্যাপক ব্যাবহার করেন।

মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবের সমসাময়িক ভারতীয় মুসলিম সংস্কারক শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (১৭০৩-১৭৬২ খৃ)। তাঁর মত-প্রচারের প্রথম দিকে ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি মক্কায় গমন করেন এবং তিন বৎসর সেখানে অবস্থান করেন। এরপর দেশে ফিরে তিনি ভারতে ইসলামী শিক্ষা প্রসারে বিশেষ অবদান রাখেন। তিনিও কবর পূজা, পীর পূজা, কবরে মানত করা, কবরবাসী বা জীবিত পীর বা ওলীগণের কাছে বিপদমুক্তির সাহায্য চাওয়া ও অন্যান্য শিরক, বিদ'আত, কুসংস্কার, ও মাযহাবী বাড়াবাড়ি বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা এবং প্রতিবাদ করেন। এজন্য কেউ কেউ তাকে 'ওহাবী' বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন।

তবে ভারতের সর্বপ্রথম সংবিধিবদ্ধ ও সুপ্রসিদ্ধ 'ওহাবী' নেতা ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহর পুত্র শাহ আব্দুল আযীযের (১৩৪৬-১৮২৩ খৃ) অন্যতম ছাত্র সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী (১৭৮৬-১৮৩১ খৃ)। তিনি সমগ্র ভারতে মাজার, দরগাহ নামে ব্যাক্তি পূজা, মানত, শিন্নি ইত্যাদি বিভিন্ন শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার করেন। এছাড়া তিনি বৃটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তিনি হজ্জে গমন করেন। প্রায় তিন বছর তথায় অবস্থানের পর তিনি ভারতে ফিরে আসেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বৃটিশ ভারত থেকে 'হিজরত' করে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গমন করে সেখানে 'ইসলামী রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন এবং নিজে সেই রাষ্ট্রের প্রধান হন। এরপর তার নেতৃত্বে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিম সেখানে একত্রিত হয়ে বৃটিশ ও শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। কয়েকটি যুদ্ধের পরে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বালাকোটের যুদ্ধে তাঁর বাহিনী পরাজিত হয় এবং তিনি শাহাদত বরণ করেন। পরবর্তী প্রায় ৩০ বৎসর সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর অনুসারীগণ বৃটিশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার বিচ্ছিন্ন জিহাদ ও প্রতিরোধ চালিয়ে যান।

বৃটিশ সরকার সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর আন্দোলনকে ওহাবী আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করেন। তারা দাবি করেন যে, হজ্জ উপলক্ষে আরবে গমন করে সেখানকার ওহাবীদের থেকে দীক্ষা নিয়েই তিনি তার সংস্কার ও জিহাদ আন্দোলন শুরু করেন। সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর শিষ্যদের থেকে ভারতে বিভিন্ন সংস্কারমুখী ধারার জন্ম নেয়। তার শিষ্যদের মধ্য থেকে অনেকে নির্ধারিত মাযহাব অনুসরণ অস্বীকার করে নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' বলে দাবি করেন। এছাড়া তার শিষ্য জৌনপূরের পীর মাওলানা কারামত আলী একটি সংস্কারমুখী ধারার জন্ম দেন। ফুরফুরার পীর মাওলানা আবূ বাক্র সিদ্দীকীও সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর মতানুসারী ও তার প্র-শিষ্য ছিলেন। এছাড়া দেওবন্দের আলিমগণও তারই শিষ্যদের থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন। এদের সবাইকে প্রতিপক্ষ, ঔপনিবেশিক সরকার ও সৌদি ওহাবী 'ওহাবী' বলে আখ্যায়িত করেছেন। বিশেষত আহলে হাদীস ও দেওবন্দের আলিমই এ উপাধি বেশি লাভ করেছেন। সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর অন্যতম শিষ্য ও সমসাময়িক সংস্কারক মীর নেসার আলী ওরফে তিতুমির (১৭৮২-১৮৩১) এবং সমকালীন অন্য সংস্কারক হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০)। এদের আন্দোলন ও প্রতিরোধকে ওহাবী আন্দোলন বলা হয়েছে।

বর্তমান যুগে বিশ্বব্যাপী 'ইসলামী সন্ত্রাস' বা জঙ্গীবাদের নেতৃত্বে রয়েছেন ওসামা বিন লাদেনের মত সৌদি বংশোদ্ভুত ব্যক্তিত্ব। সৌদি আরবের বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা এদের অর্থায়ন করেন বলে শোনা যায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষত উপমহাদেশে আহলে হাদীস ও দেওবন্দ-পদ্ধতির কওমী মাদ্রাসায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের এর সাথে সংশ্লিষ্টতার

কথা শোনা যায়। এছাড়া এদের মধ্যে কবর-মাযার ইত্যাদির বিরোধিতা দেখা যায়। সর্বোপরি এরা নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠার জন্য মৌখিক প্রচার ছাড়াও অস্ত্র হাতে তুলে নিচ্ছেন। এজন্য অনেক গবেষক মনে করেন যে, ওহাবী মতবাদের প্রসারই বর্তমান জঙ্গীবাদের উত্থানের কারণ।

তবে এখানে লক্ষণীয় যে, ওসামা বিন লাদেন এর আন্দোলন-এর গোড়া পত্তন হয় সৌদি-ওহাবী রাষ্ট্রের বিরোধিতার মাধ্যমে। তার অনুসারীগণ সেখানকার রাজতন্ত্র, মার্কিন সৈন্য, অনাচার ইত্যাদির বিরোধিতা করেন এবং সৌদি রাষ্ট্র ও সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম তারা অব্যাহত রেখেছেন। এছাড়া মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাবের বংশধরসহ সকল সৌদি ওহাবী আলিম বিন লাদেনের আন্দোলন ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সোচ্চার।

সর্বোপরি, বিভিন্ন দেশের সংস্কারমূলক আন্দোলন বা প্রতিরোধ আন্দোলনকে 'ওহাবী' বলে আখ্যায়িত করার কোনো ভিত্তি নেই।

আমরা জানি যে, আফগানিস্থান ও ইরাকে বিন লাদেনের মতবাদ বা জঙ্গীবাদ প্রসার লাভ করেছে। আর এই দুটি দেশই ঘোর ওহাবী বিরোধী। আফগানিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠি হানাফী মাযহাবের কঠোর অনুসারী, পীর মাশায়েখ এবং ওহাবীদের ভক্ত। ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের দীর্ঘ শাসনামলে ওহাবী বা অন্য যে কোনো সংস্কারমুখী আলিম ও মতবাদকে কঠোরভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। শুধুমাত্র পীর-মাশায়েখ ও সূফীদের বিরুদ্ধে কোনো কঠোরতা অবলম্বন করা হয় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ দুই দেশে জঙ্গীবাদের প্রসার থেকে বোঝা যায় যে, জঙ্গীবাদের কারণ অন্য কোথাও নিহিত রয়েছে।

ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র:

বিশ্বের সর্বত্রই সাধারণ আলেম ওলামা, পীর মাশায়েখ, ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও ইসলামী দলগুলো জঙ্গীবাদের বিরোধিতা এবং নিন্দা করছেন। সাধারণভাবে তাঁরা উপরের তিনটি কারণকে জঙ্গীবাদের উত্থানের কারণ বলে স্বীকার করেন না। রবং তারা দাবি করেন যে, ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্রের কারণেই এ জঙ্গীবাদের উত্থান। ইসলামকে কলঙ্কিত করতে, ইসলামী দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নতি বন্ধ করতে এবং এ সকল দেশে সামরিক আধিপত্য বিস্তার করতেই তারা গোপন অর্থায়নে কিছু মুসলিম যুবককে বিভ্রান্ত করে জঙ্গীবাদ সৃষ্টি করেছেন।

তারা এ দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারেন না, তবে অনেক যুক্তি পেশ করেন। তাঁরা দাবি করেন যে, এই বোমাবাজি, অশান্তি, সন্ত্রাস এগুলো মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে কখনো দেখা যায় নি। 'সভ্যতার সংঘাত' থিওরি আবিষ্কারের পূর্বে বিগত দেড় হাজার বছর ধরে কখনোই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে 'জিহাদ' নামে এরূপ সন্ত্রাস কখনোই দেখা যায় নি। রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচালিত যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কোথাও কোনো মুসলিম ব্যক্তিগতভাবে বা দলগত ভাবে কাউকে গুপ্ত হত্যা করেছে, কারো বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করেছে,এসবের দৃষ্টান্ত দেখা যায়নি। 'সভ্যতার সংঘাত' থিওরি আবিষ্কারের পরে পাশ্চাত্য বিশ্ব নিজ প্রয়োজনেই এ অবস্থা তৈরি করে নিয়েছে।

দীর্ঘ অর্ধ সহস্র বৎসর যাবৎ ক্রুসেড যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে ইউরোপীয় খৃষ্টান। ১ম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পতন ও মুসলিম বিশ্বে উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে ক্রুসেডের সমাপ্তি হয়েছে বলে ধারণা করেছিলেন তারা। বিংশ শতাব্দির ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষত সেভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে তারা হিসাব নিকাশ পাল্টে ফেলেন। তারা 'সভ্যতার সংঘাতের' থিওরী উপস্থাপন করেন। তারা ভালভাবেই উপলব্ধি করেন যে, মুসলিম বিশ্বকে তার নিজের গতিতে অগ্রসর হতে দিলে ২১শ শতকের প্রথমার্ধেই

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান 'বিশ্ব শক্তিতে' পরিণত হবে। অর্থনৈতিক স্থিতি, প্রযুক্তিগত শক্তি ও সমর শক্তিতে তারা শক্তিশালী হয়ে যাবে। মুসলিম উম্মাহকে ঠেকাতে হলে তাদেরকে আঘাত করতে হবে।

কিন্তু আঘাত তো কোনো 'কারণ' ছাড়া করা যায় না। স্বভাবতই কোনো মুসলিম দেশই পাশ্চাত্যের সাথে কোনো সংঘাতে যেতে রাজি নয়। কিন্তু সংঘাত না হলেও তো কাজ উদ্ধার করা যাচ্ছে না। বিশেষত দুর্বলকে সংঘাতের মধ্যে নামাতে পারলে বিজয় নিশ্চিত থাকে। এজন্যই তাঁরা এ জঙ্গীবাদের জন্ম দিয়ে থাকতে পারে।

এ সকল মুসলিম পণ্ডিত আফগান জিহাদকে অন্যতম দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেন। সোভিয়েত আগ্রাসনের প্রতিবাদে আফগানিস্তানের মুসলিম জনগোষ্ঠি প্রতিরোধ শুরু করে। আমেরিকা এ সুযোগে এ সকল প্রতিরোধ যোদ্ধাদেরকে অস্ত্র, ট্রেনিং, প্রযুক্তি ও সকল প্রকার সাহায্য দিয়ে এগিয়ে নেয়। সারা বিশ্বে এদের পক্ষে প্রচার চালায়। এরপর তারা তাদেরকে উস্কানির মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য করে। তারা বেপরোয়া হয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলেন। পরিত্যক্ত ও উত্তেজিত এ সকল মানুষ আবেগ তাড়িত হয়েও অনেক কাজ করতে থাকেন। এছাড়া এ সকল 'মুজাহিদ'দের মধ্যে আমেরীকার নিজস্ব অনুচর রয়েছে। যারা এদেরকে 'সংঘাতের পথে' যেতে প্ররোচিত করছে। এরা জিহাদ ও কিতাল বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলোর অপব্যাখ্যা করে মুসলিম উম্মাহকে 'প্রিম্যাচিউরড' সংঘাতের পথে যেতে উস্কানি দিচ্ছে। এভাবে সারা মুসলিম বিশ্বে 'জিহাদের' বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে।

'ইসলামপন্থী'দের এ দাবির যুক্তি যতই জোরালো হোক তার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। এছাড়া এ দাবিও সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে কোনো সহায়তা করে না। যদি কেউ সত্যিই ইসলামের শত্রু হন তবে তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবেন, এটা স্বাভাবিক। এজন্য তাদের দোষ দেয়া বা তার বিরুদ্ধে বিষোদগার করা অর্থহীন কাজ। ষড়যন্ত্রের শীকার কারণগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর প্রতিকার না করতে পারলে তাঁদের ষড়যন্ত্র সফলতা লাভ করবে।

উপরের চারটি বিষয়কে বাদ দিয়ে জঙ্গীবাদের উত্থান ও প্রসারের পিছনে কার্যকর অন্যান্য কারণ সন্ধান করা প্রয়োজন। বস্তুত ইসলামের নামে সন্ত্রাসের উত্থানের পিছনে অনেক কারণ বিদ্যমান। কোনো বিষয় সন্ত্রাস উস্কে দিচ্ছে, কোনো কোনো বিষয় জঙ্গীবাদ প্রচারণা ইসলাম-প্রেমিক সরল-প্রাণ যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে সাড়া জাগাতে পারছে। কারণগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর প্রতিকার করতে পারলে জঙ্গীবাদ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতে পারে।

মুসলিম সৃষ্ট কারণগুলোর মধ্যে ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের উত্থানের প্রধান কারণ বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের উপর নির্বিচার অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞ। ফিলিস্তিন, চেচনিয়া, ইরাক, কাশ্মীর, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, চীন মিয়ানমার ও অন্যান্য দেশে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নির্বিচার জুলুম, অত্যাচার ও জাতিগত নিধন (ethnic cleansing) চলছে। এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশের অদম্য আবেগই জঙ্গীবাদের জন্ম দিচ্ছে। মানুষ যখন নির্বিচার অত্যাচারের প্রতিবাদে আইনগতভাবে কিছুই করতে না পারে তখন বে-আইনীভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করে এবং তার বে-আইনী কাজকে 'আদর্শিক' ছাপ দেয়। এছাড়া সারা বিশ্বের মুসলিম মানস এই নিধনযজ্ঞের অবসান ও মুসলিম সভ্যতার বিজয় কামনা করছে। জঙ্গীবাদীরা এদের সহজেই বোঝাতে সক্ষম যে, তাদের পথই নিধনযজ্ঞের অবসান ও বিজয়ের পথ। এক্ষেত্রে ইসলামী বিধি-বিধান বিচার, আলেমদের মতামত, ফলাফলের বিচারের চেয়ে আবেগই বেশি কার্যকর। এছাড়া বেকারত্ব ও হতাশা এবং অর্ধশিক্ষিত আলেম বা ধর্মীয় নেতাদের বক্তব্য জঙ্গীবাদের মতো পথে বিভিন্ন সময় আবেগী মুসল্লিদের উৎসাহিত করে থাকে।

বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ নিয়ে রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে সুশীল সমাজসহ সবাই জঙ্গীবাদ নিয়ে কথা বলেন। কিন্তু সতর্ক বা সচেতন করার পরিবর্তে এ ইস্যু নিয়ে রাজনীতিকরণ বেশি হয়ে থাকে। তাই যেখানে জঙ্গীবাদের প্রসার ঘটে সেখানে আর আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পৌঁছে না অথবা পৌঁছালেও অনেক সময় প্রমাণাদি না পেয়ে চলে যান। রাজনীতিবিদদের এ বিষয়টি যেমন খাটো করে দেখার উপায় নেই, তেমনি এ নিয়ে ভয়-ভীতি তৈরি এবং নেতিবাচক

Dhaka University Institutional Repository

প্রচারণা বাংলাদেশের সুনাম ক্ষুন্ন করছে। তাই সময় থাকতে সরকারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এর কার্যকারণ অনুসন্ধান এবং যৌক্তিক সমাধান প্রয়োজন। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ ও নির্মূলে সহায়ক হতে পারে:

⇒ : জঙ্গীবাদকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে ।

⇒ : জঙ্গীবাদ দমনে সরকার ও বিরোধীদলের মধ্যে রাজনৈতিক প্রত্যয় অপরিহার্য ।

⇒ : সারাদেশে জঙ্গীবাদ বিষয়ক বিশেষ মনিটরিং সেল করতে হবে ।

⇒ : তথ্য ছাড়া কাউকে দোষী প্রমাণের চেষ্টা করা হলে তা হিতে বিপরীত হতে পারে ।

⇒ : আইনী বাধা না থাকলে জঙ্গী মতবাদে সম্পৃক্তদের সংশোধনের সুযোগ দেয়া যেতে পারে ।

⇒ : জাতীয় ইস্যুতে রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজকে সম্পৃক্ত করতে হবে ।

⇒ : গণমাধ্যমে জঙ্গীবাদের কুফল সম্পর্কে জনগণকে বোঝাতে হবে।

⇒ : গণমাধ্যমে জঙ্গীবাদ সম্পর্কিত প্রকৃত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ মতামত নিতে হবে।

⇒ : একাডেমিকভাবে মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এ সংক্রান্ত পাঠ্যসূচী অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

⇒ : ইসলামের শান্তিময় বাণী ছড়িয়ে দিতে মসজিদ, মাদ্রাসা, পাড়া মহল্লার ক্লাব, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনগুলোকে কাজে লাগাতে হবে ।

⇒ : কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক করে বৃত্তিমূলক কাজের সুযোগ তৈরি করে দেয়া যেতে পারে।

⇒ : সকল নাগরিকের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলতে হবে।

⇒ : ঘুষ, দুর্নীতি, অনাচার ও অবিচার বন্ধ করে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ হিসেবে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে ।

⇒ : শিশু ও নারী এবং গ্রামের মানুষকে সচেতনতার আওতায় নিয়ে আসতে হবে ।

⇒ : প্রতিটি মানুষকে উন্নয়নমূলক কাজে সমপ্ত করতে হবে ।

⇒ : বাইরের শক্তি বা বিদেশী অনুপ্রবেশকারীদের সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে ।

⇒ : জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস সম্পর্কে রিপোর্টিংয়ের জন্য গণমাধ্যম কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

⇒ : সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের সুস্পষ্ট রাষ্ট্রীয় ব্যাখ্যা নিশ্চিত করতে হবে ।

⇒ : জড়িত প্রমাণ পেলে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে ।

⇒ : দেশের সুনাম নষ্ট হয়, এমন সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে ।

⇒ : মানুষের ধর্মীয় চেতনাকে সমুন্নত রাখতে হবে।

⇒ : প্রতিবেশী উগ্র সহিংস বা সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোকে চিহ্নিত করে সেগুলো সম্পর্কে সঠিক গোয়েন্দা তথ্য (প্রয়োজন হলে) গণমাধ্যমকে জানাতে হবে।

⇒ : জঙ্গীগোষ্ঠীর কার্যক্রম সার্বক্ষণিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর নজরদারিতে আনা।

⇒ : সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় অর্থ সহায়তা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রস্তুত রাখতে হবে।

⇒ : প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে এ বিষয়ে নিয়মিত আন্ত:রাষ্ট্রীয় সংলাপ হতে হবে।

⇒ : সর্ব ধর্মের মূল মর্মবাণী প্রাথমিক বা মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পৌঁছে দিতে হবে।

⇒ : এ নিয়ে আরো উন্নত গবেষণা ও বৃহৎ পরিসরে বাজেট ও আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি সম্বলিত স্থাপনা এমনকি স্বাধীন কমিশনও গড়ে তোলা যেতে পারে।

⇒ : রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের বৈধ কর্মসূচি পালনের সুযোগ দিয়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহারে বলা যায়, বাংলাদেশের কিছু গোষ্ঠীর মধ্যে জঙ্গীবাদের প্রবণতা রয়েছে। তবে এর প্রকৃতি বা স্বরুপ রাজনীতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও বিভিন্ন চলকের উপর নির্ভর করে। কখনো ধর্মের নামে,আবার কখনো সরকারকে হুমকি দেয়া বা জনগণের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে দিতে তারা নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিয়ে থাকে। তবে আশার কথা হচ্ছে, বাংলাদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ, কিন্তু আচরণে উগ্র নয়। জঙ্গীবাদের সাথে মাদ্রাসা শিক্ষার্থী ছাড়াও উচ্চবিত্তের অনেক সন্তানরাও সম্পৃক্ত হচ্ছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, ধর্মীয় চেতনা সমুন্নত রাখা,ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা এবং গণতন্ত্রের বিকাশ ত্বরান্বিত করা হলে এ প্রবণতা অনেকখানি কমে আসবে। এটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত গোয়েন্দা নজরদারি এবং জনগণকে এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ব্যাপকভাবে সচেতন করে তোলা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে বাংলাদেশের গণমাধ্যমকেও জনমুখী নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসার কারণে অনেকসময় গণমাধ্যম তার দায়িত্ব বা পরিমিতিবোধের জায়গা থেকে সরে যায়। জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদী হামলার সংবাদ প্রকাশ বা প্রচারের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে আরো দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। জোর করে কাউকে জঙ্গী সম্পৃক্ততায় জড়িয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার সুযোগ যেমন নেই, তেমনি জঙ্গীবাদী কার্যক্রমকে মৌণ সমর্থন দেয়া বা এর বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ না নেয়াটাও অন্যায়। মনে রাখতে হবে, দেশ সকলের ; তাই এ প্রবণতা রুখতে রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন করা যেমন জরুরি, তেমনি সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি করা প্রয়োজন। তাহলেই অসাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে এদেশের মানুষ তার হাজার বছরের সম্প্রীতির ঐতিহ্য সমুন্নত রাখতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

সোবহান ফারুক (২০১০), ট্রেন্ডস অব মিলিট্যান্সি ইন বাংলাদেশ. ইউপিএল; ৮, ৩৬-৩৭, ৭৪

সোবহান ফারুক (২০০৮), কাউন্টারিং টেরোরিজম ইন বাংলাদেশ. ইউপিএল; ২৯, ৩১, ৩৩

আলী, শওকত এ এম এম, (২০০৬), ফেসেস অব টেরোরিজম ইন বাংলাদেশ; ইউপিএল;
১৪-১৫, ১৮, ২০, ২৬, ২৮, ৪২

খান রহমান জিল্লুর ও আন্দালিব সাদ সৈয়দ (২০১১) ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ. ইউপিএল; ৯৩, ৯৬

মোহসীন আমেনা ও আহমেদ ইমতিয়াজ (২০১১), উইমেন এন্ড মিলিট্যান্সি. ইউপিএল; ৭

আহমেদ ইমতিয়াজ (২০০৫), অন দ্য ব্রিন্ক অব প্রেসিপিস কনটেমপরারি টেরোরিজম এন্ড দ্য লিমিটস অব দ্য স্টেট

ইসলাম মনিরুল (২০০৯), ন্যাশনাল সিকিউরিটি বাংলাদেশ ২০০৮. ইউপিএল; ৪৫-৪৭

জাহাঙ্গীর বি কে (২০০২), ন্যাশনালিজম, ফান্ডামেন্টালিজম এন্ড ডেমাক্রেসি ইন বাংলাদেশ. আইসিবিএস

আহমার মুনিস (২০০৩), প্যারাডাইমস অফ কনফ্লিক্ট রেজ্যুলুশন ইন সাউথ এশিয়া. ইউপিএল

ওয়াল্টার লিকোর (১৯৯৯), দ্য নিউ টেরোরিজম

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ কোড (২০০৭); ভলিউম-৩৩

উল্লাহ মাহফুজ (২০১২), উলফা এন্ড দ্য ইনসার্জেন্সি ইন আসাম.এডর্ণ; ৭৭, ৭৯, ৮১-৮৩, ৯৯

হক মো:গাজীউল আবু নছর (১৯৯৬), বাংলাদেশের গণমাধ্যম আইন ও বিধিমালা. ইউপিএল

যোশী ফারুক (২০০৭), সন্ত্রাস মৌলবাদ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ; ১২৮

নজরুল নদভী হাফীজ, ২০০৯),পশ্চিমা মিডিয়ার স্বরুপ ;ব্রাড কম্প্রিন্ট পাবলিকেশন্স
৯-৯৮,১০৮,১১৫,১২৫,১২৯

খান, হাফিজউদ্দিন ২০০৮; র‍্যাব প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী জার্নাল; ৭৪ ।

www.trannationalterrorism.eu: July 23, 2008

Roy G N, ২০০৯; Terrorism New Challenges & Media শীর্ষক বক্তৃতা

হফম্যান ব্রুস, ২(০০৬), ইনসাইড টেরোরিজম; ১৭৪

আকবরজাদেহ ও স্মিথ, (২০০৫); দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অব ইসলাম এন্ড মুসলিমস ইন দ্য মিডিয়া

নাসির সাদিয়া,(২০০৯); Rise of Extremism in South Asia

ট্যান্সন্যাশনাল টেরোরিজম সিকিউরিটি এন্ড দ্য রুল অব ল' (২০০৮)

বারাকাত ড. আবুল ২৬, ২০১২ জুন,স্মারক বক্তৃতা

কিং, মার্টিন লুথার, ১৯৬৩; আই হেভ অ্যা ড্রিম

militant.askdefine.com

কালের কণ্ঠ, ২০১৩; ৩ সেপ্টেম্বর

রিয়াজ, আলী এবং আর রাজি, খ আলী ; হু আর দ্য ইসলামিস্ট

রিয়াজ আলী ও ক্রিস্টিয়ান ফেয়ার; পলিটিক্যাল ইসলাম এন্ড গভর্নেন্স ইন বাংলাদেশ

আকাশ এম এম ২০১৩; http://opinion.bdnews24.com/bangla/13/05/10

আহমদ অলি, ২০১৩; নয়াদিগন্ত

টিম পার্লম্যান এন্ড গিল পিলিং, কাউন্টার টেরোরিজম ফাইনান্স

The Guardian, (2013); 25 October

কুমার আনন্দ, (২০০৯): টেরর ফাইনান্সিং ইন বাংলাদেশ, স্ট্র্যাটেজি এনালাইসিস ভলিউম ৩৩, ৯০৩

সাঈদ এডওয়ার্ড, কাভারিং ইসলাম; হাউ দ্য মিডিয়া এন্ড দ্য এক্সপার্টস ডিটারমাইন

কিনটেজ বারসি, (১৯৯৭); হাউ উই সি দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড,

উইলিয়াম জন, (১৯৯০), দ্য রিভাইভাল অফ ইসলাম ইসলাম ইন দ্য মডার্ণ ওয়ার্ল্ড; ২৪০

এপসিতো জন, (১৯৯২) দ্য ইসলামিক থ্রেট মিথ অর রিয়েলিটি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস

জাহাঙ্গীর আব্দুল্লাহ ড. খোন্দকার, (২০০৬), ইসলামী আইন ও বিচার, ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা,

জাহাঙ্গীর আব্দুল্লাহ ড. খোন্দকার, অক্টোবর-ডিসেম্বর, (২০০৬); ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা,

হোসেন খালিদ ড. আফম,(২০১১), মাদ্রাসা শিক্ষা http://blog.priyo.com

হক ফাহমিদুল, অসম্মতি উৎপাদন

ড্রাগলি, লে:কর্ণেল (১৯৯১)

www.zcommunications.org/what do we mean by militancy

Safety & security in north Bengal, (2012); Bangladesh

The Bibles, numbers 31/17-18

Hornby A.s, Oxford advanced learners dictionary, 5th edition; 734

Mahfuzullah, http://bangla.irib.ir/images/media

মুনিরুজ্জামান মেজর জেনারেল (অব:); ট্রান্সন্যাশনাল সিকিউরিটি থ্রেটস ফেসিং বাংলাদেশ

Ganguly: (2006); www.usip.org

বিবিসি বাংলা রেডিও, (২০১৩) ৯ আগষ্ট

রেডিও তেহরান, (২০০৯) ১৯ মে

রেডিও তেহরান, (২০১১) ২মার্চ

রেডিও তেহরান, (২০১০) ১৩ ডিসেম্বর

নয়াদিগন্ত, (২০১৩) ২৬ সেপ্টেম্বর

নয়াদিগন্ত (২০০৯)২৩ অক্টোবর

নিউইয়র্ক টাইমস, (২০০৫)২৩ জানুয়ারি

হোয়াইটহেড, (২০১৩)

আজিজ ড.এডেসিনা লুকম্যান (২০০৯), Journal of Communication and Media Research

www.suite.1001.com

www.jannah.org/article/media/html

রবিনসন ম্যাথিউ, (২০০৮); মিডিয়া কাভারেজ অব টেরোরিজম

Kellner, (1990); Television and The Crisis of Democracy

Kellner, (1992); The Persian Gulf TV War

নয়া দিগন্ত, (২০১৩);১ সেপ্টেম্বর

উইকিপিডিয়া

বাংলাদেশ প্রতিদিন, (২০১৪); ২৪ ফেব্রুয়ারি

বাংলাদেশ প্রতিদিন, (২০১৪); ২৫ ফেব্রুয়ারি

বাংলাদেশ প্রতিদিন, (২০১৪); ২৬ ফেব্রুয়ারি

আমাদের সময়,(২০১৩); ১ সেপ্টেম্বর

ইত্তেফাক,(২০১৩); ০৫ অক্টোবর

প্রথম আলো,(২০১৩); ০৫ অক্টোবর

যুগান্তর, (২০১৩); ০৫ অক্টোবর

সমকাল, (২০১৩); ০৫ অক্টোবর

http://Jamestown.org /terrorism/news/articleid=2369724*)* ।

http://www.satp.org/satporgtp/countries/bangladesh/terroristoutfits/Huj.htm accessed on May 6 2009.

http://www.southasiaanalysis.org/5Cpapers27%5Cpaper2613.html and accessed on May 7 2009.

http://wwwprobenewmegazine.com/index.php?index=2&contendId5123.

www.satp.org/satporgtp/countries/bangladesh/terroristoutfits/JMB.htm+JMB time+cadres&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=in , accessed on May 8 2009.

http://www.albd.org/autoalbd/index.php?option=com_content&task=view&id 46&Itemid=37, accessed on May 8, 2009.

Bangladesh bans Dawood-funded terrorist group Al-Hikma", The Hindustan Times, Monday 17th February 2003

http://www.modernghana.com/news/211300

http://azdema.gov/museum/famousbattles/pdf/Terrorism

U.S. Army Field Manual No. FM 3-0, Chapter 9, 37, 14 June 2001

হফম্যান, (২০০৬); ১১৮

বাংলাদেশ প্রতিদিন,(২০১৩) ১৩ সেপ্টেম্বর

ওয়াটসন ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের ,কস্ট অফ ওয়ার

সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১২

ইত্তেফাক (২০১২) ১৪ জুন

যুগান্তর (২০১২) ১৫ জুন

আমার দেশ (২০১২)১৬ জুন

Bhattachariya Joyeeta (2009) Understanding 12 extremists group in Bangladesh

মান্নান আব্দুল, (২০০৬); ৩৭

আল-কুরআন আল-কারীম, সূরা-আল হুজরাত, আয়াত:৯

আল-কুরআন আল-কারীম, সূরা আনআম, আয়াত: ৫৭; সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪০

আল-কুরআন আল-কারীম, সূরা-আল মায়েদা, আয়াত: ৪৪

আল-বুখারী, আল জামি আস-সহীহ, ১ম সংস্করণ; কায়রো: দারু আশ-শাআব, ১৪০৭ হি/১৯৮খৃ) খ.৫:২০৭; ইবনে মুসলিম বৈরুত: দারুল আফাক আল-জাদীদ

ইমাম বুখারী, আল-জামি আস-সহীহ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৪৪

ইমাম বুখারী,আল-জামি আস-সহীহ, প্রাগুক্ত, খ.৯:৩২

ইমাম বুখারী, আল-জামি আস-সহীহ, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৮০

ইমাম বুখারী, আল-জামি আস-সহীহ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩২

ইমাম বুখারী,আল-জামি আস-সহীহ, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ-১৯

ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ-৫৬

ইমাম বুখারী, আল-জামি আস সহীহ, প্রাগুক্ত, খ.৮, পৃ-৩২

ইমাম বুখারী, আল-জামি আস-সহীহ, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৭৮

ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৬ পৃ. ২০

ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৬ পৃ. ২২

ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৬ পৃ. ২৩

ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৬ পৃ. ২৪

আল কুরআন, সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ৭৮

ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ৫০

ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ-৬০

বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবী, তা.বি. খ. ২ পৃ. ৩২৫

বৈরুত: দারু ইহইয়া আত-তুরাছিল আরাবী, তা.বি. খ. ৫, পৃ. ৩২৫

কায়রো: মুয়াচ্ছাছাতু কারতাবা, তা.বি. খ. ১, পৃ. ২০৬

আল-কুরআন আল-কারীম, সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৯০

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদ আল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০০

ইমাম বুখারী, আল-জামে আস সহীহ, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ-১২০

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

জঙ্গীবাদ ও আন্তর্জাতিক আইনঃ

প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে সন্ত্রাস প্রতিরোধে সময়ের প্রয়োজনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সন্ত্রাসবিরোধী আইন প্রণয়ন করেছে। বোমা হামলা বা হত্যা করার বিরুদ্ধে আইন। এ ধরনের আইন নিয়ে সমালোচকরা বলে থাকেন যে, শাসকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে এ আইনের প্রয়োগ করে। যা কি না অনেক সময় গণতন্ত্রকেই বিপদে ফেলে দেয়। ১৯ শতকের শেষ দিকে রাশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকা সহিংসতা ও অবৈধ কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে তৈরি হওয়া একটি আন্দোলনের মুখে পড়লো। এটা প্রথম টিসারিস্ট রাশিয়া নামের একটি সংগঠন যারা তরুণ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত তারা সিজারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলো। সার্গেই নেচায়েভ ১৮৪৭-১৮৮২ এমন এক আন্দোলন শুরু করলো যা ইউরোপে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল নিহিলিস্ট আন্দোলন নামে। পরবর্তিতে বিভিন্ন দেশে তৈরি হওয়া আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মানুষের চলাচলের স্বাধীনতা, অভিবাসন এবং সবশেষ ২০ কুকের শেষে ইসলামী সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব হয়।

সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কিত ও সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আন্তর্জাতিক কনভেনশন ১৯৩৪ সাল থেকেই যখন লিগ অব নেশনস বা জাতিসংঘ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয় তখন থেকেই এটি একটি আন্তর্জাতিক ইস্যু। যদিও ১৯৩৭ সালে এটি এজেন্ডাভুক্ত হয়, কিন্তু এটি তখনো কার্যকর হয়নি।বর্তমানে ১৩ টি সন্ত্রাসবাদবিরোধী শক্তি কাজ করছে। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ও আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি সংস্থার অধীনে। ২০০৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ কৌশল গ্রহণ করে।

সব দেশের জন্য এ সভা উন্মুক্ত রাখা হয়েছেঃ

১৯৬১ : ভিয়েনা কনভেনশন অন ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশন

১৯৬৩ : ভিয়েনা কনভেনশন অন কনস্যুলার রিলেশনস

১৯৬৩ : কনভেনশন অন অফেন্সেস এন্ড সারটেনন আদার এক্টস কমিটেড অন বোর্ড এয়ারক্যাফট (টোকিও কনভেনশন)

১৯৭০ : কনভেনশন ফর দ্য সাপ্রেশন অফ আনলফুল সিজার অফ এয়ারক্র্যাফট (হগ কনভেনশন)

১৯৭১ : কনভেনশন ফর দ্য সাপ্রেশন অফ আনল'ফুল এ্যাক্টস এগেইনস্ট দ্য সেইফটি অফ সিভিল এভিয়েশন(মনট্রিল কনভেনশন)

১৯৭৯ : কনভেনশন অন দ্য ফিজিক্যাল প্রটেশশন অফ নিউক্লিয়ার ম্যাটারিয়াল (নিউক্লিয়ার ম্যাটারিয়াল কনভেনশন)

১৯৮৮ : প্রটোকল ফর দ্য সাপ্রেশন অফ আনল'ফুল এ্যাক্টস অফ ভায়োলেন্সএট এয়ারপোর্টস সার্ভিং ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন

১৯৮৮ : কনভেনশন ফর দ্য সাপ্রেশন অফ আনল'ফুল এ্যাক্টস এগেইনস্ট দ্য সেইফটি অফ মেরিটাইম নেভিগেশন

১৯৮৮ : প্রটোকল ফর দ্য সাপ্রেশন অফ আনল'ফুল এ্যাক্টস এগেইনস্ট দ্য সেইফটি অফ ফিক্সড প্ল্যাটফর্ম লোকেটেড অন দ্য কন্টিনেন্টাল শেলফ

১৯৯১ : কনভেনশন অন দ্য মার্কেটিং অফ প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভস ফর দ্য পারপাজ অফ ডিটেনশন

১৯৯৭ : ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দ্য সাপ্রেশন অফ টেরোরিস্ট বোম্বিংস

১৯৯৯ : ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দ্য সাপ্রেশন অফ দ্য ফাইনান্সিং অফ টেরোরিজম

২০০৫ : ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দ্য সাপ্রেশন অফ এাক্টস অফ নিউক্লিয়ার টেরোরিজম

২০১০ : কনভেনশন অন দ্য সাপ্রেশন অফ আনল'ফুল এ্যাক্টস রিলেটিং টু ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন (বেইজিং কনভেনশন)

২০১০ : প্রটোকল সাপ্লিমেন্টারি টু দ্য কনভেনশন ফর দ্য সাপ্রেশন অফ আনল'ফুল সিজার অফ এয়ারক্রাফট (বেইজিং প্রটোকল)

কম্প্রিহেনসিভ কনভেনশন অন ইন্টারন্যাশনাল টেরোরিজম নিয়ে ১৬ তম কনভেশনের আলোচনা প্রস্তাবনায় রয়েছে।

নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তগুলো :

জাতিসংঘ নিরাপত্তা কাউন্সিল রেজ্যুলুশন ৭৩১ (জানুয়ারি ২১, ১৯৯২)

জাতিসংঘ নিরাপত্তা কাউন্সিল রেজ্যুলুশন ৭৪৮ (মার্চ ৩১, ১৯৯২)

জাতিসংঘ নিরাপত্তা কাউন্সিল রেজ্যুলুশন ৮৮৩ (নভেম্বর ১১, ১৯৯৩)

আঞ্চলিক কনভেনশন:

ইউরোপ : ১৯৭৭: ইউরোপিয়ান কনভেনশন অন দ্য সাপ্রেশন অফ টেরোরিজম (স্ট্রাসবার্গ, জানুয়ারি ১৯৭৭)৬

২০০৩ : প্রটোকল (স্ট্রাসবার্গ, মে ২০০৩)৭

২০০৬ : কাউন্সিল অফ ইউরোপ কনভেনশন অন দ্য প্রিভেনশন অফ টেরোরিজম ৮

কমনওয়েলেথর স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ:

ট্রিয়েটি অন কোঅপারেশন এমং স্টেটস মেম্বারস অফ দ্য কনমওয়েলথ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস ইন কমব্যাটিং টেরোরিজম (মিনস্ক, জুন ১৯৯৯)

আমেরিকা : অর্গানাইজেশন অফ আমেরিকান স্টেটস কনভেনশন টু প্রিভেন্ট এন্ড পানিশ এ্যাক্টস অফ টেরোরিজম টেকিং দ্য ফর্ম অফ ক্রাইমস এগেইনস্ট পার্সনস এন্ড রিলেটেড এক্সটোরশন দ্যট আর অফ ইন্টারন্যাশনাল সিগনিফিকেন্স (ওয়াশিংটন ডিসি,ফেব্রুয়ারি ১৯৭১)

ইন্টার-আমেরিকান কনভেনশন এগেইনস্ট টেরোরিজম এজি/আরইএস. ১৮৪০ (ব্রিজটাউন, জুন ২০০২)

আফ্রিকা : অর্গানাইজেশন অফ আফ্রিকান ইউনিয়ন কনভেনশন অন দ্য প্রিভেনশন এন্ড কমব্যাটিং অফ টেরোরিজম (আলজিয়ার্স, জুলাই ১৯৯৯) এবং

দ্য প্রটোকল টু দ্যট কনভেনশন (আদ্দিস আবাবা জুলাই, ২০০৪)

এশিয়া : সার্ক রিজিওনাল কনভেনশন অন সাপ্রেশন অফ টেরোরিজম (কাঠমুন্ডু ,নভেম্বর ১৯৮৭)

এডিশনাল প্রটোকল টু দ্য কনভেনশন, ইসলামাবাদ, জানুয়ারি ২০০৪)

দ্য আসিয়ান কনভেনশন অন কাউন্টার টেরোরিজম, সেবু ফিলিপাইনস, জানুয়ারি ১৩, ২০০৭ ২২জানুয়ারির ২০১৩ সালের মধ্যে সব আসিয়ান সদস্যদেশ এতে স্বাক্ষর করে ।

লিগ অব আরব স্টেটস আরব কনভেনশন অন দ্য সাপ্রেশন অফ টেরোরিজম (কায়রো, এপ্রিল ১৯৯৮)

অর্গানাইজেশন অফ দ্য ইসলামিক কনফারেন্স কনভেনশন অফ দ্য অর্গানাইজেশন অফ দ্য ইসলামিক কনফারেন্স অন কমব্যাটিং ইন্টারন্যাশনাল টেরোরিজম (ওয়াগাদোয়াগাও, জুলাই ১৯৯৯)

Dhaka University Institutional Repository

সন্ত্রাস বিরোধী আইন বিভিন্ন দেশেঃ

অস্ট্রেলিয়া : অস্ট্রেলিয়ান সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৪

অস্ট্রেলিয়ান সন্ত্রাসবিরোধী এ্যাক্ট, ২০০৫ কানাডা কানাডিয়ান সন্ত্রাস প্রতিরোধধারা, ২০০১ অ্যাক্টঃ

ভারত : টেরোরিস্ট এন্ড ডিসরাপ্টিভ এ্যাক্টিবিটিজ (প্রিভেনশন)এ্যাক্ট (১৯৮৫-১৯৯৫)

প্রিভেনশন অফ টেরোরিস্ট এ্যাক্টিভিটিজ এ্যাক্ট (২০০২-২০০৪)

পাকিস্তান সাপ্রেশন অফ টেরোরিস্ট এ্যাক্টিভিটিজ অর্ডিন্যান্স,১৯৭৫ জুলফিকার আলী ভুট্টো, সন্ত্রাসবিরোধী আইন ১৯৯৭, ১৭ আগস্ট সই হয়। সন্ত্রাস বিরোধী আইন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ জারি, ২৪ অক্টোবর, ১৯৯৮ পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী অধ্যাদেশ, ১৯৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নমালা

গবেষণায় একটি প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের মতামত ও মন্তব্য জানতে চাওয়া হয়েছে।

১. জঙ্গীবাদ সম্পর্কে আপনার ধারণা কেমন?
স্পষ্ট. অস্পষ্ট. মোটামুটি

২. জঙ্গীবাদ বিস্তারে নিচের কোন কারণটি প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করেন?
রাজনৈতিক, ধর্মীয়, বাহ্যিক

৩. গণমাধ্যমের সাথে জঙ্গীবাদের সম্পর্ক কি?
ভাল, মোটামুটি, পরিপূরক

৪. শাসকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে জঙ্গীবাদ ইস্যুকে ব্যবহার করে এ ধারণার সাথে আপনি একমত কিনা?
একমত. ভিন্নমত. মন্তব্য নাই

৫. জঙ্গীবাদ নিরসনে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের উপর আপনার আস্থা কতখানি?
মোটামুটি. নাই. অল্প

৬. গণমাধ্যমে প্রচারিত জঙ্গীবাদের খবরের উপর আপনি কতখানি আস্থাশীল?
গুজব. বানানো. মোটামুটি

৭. গণমাধ্যমের এজেন্ডা নির্ধারণে জঙ্গীবাদ ইস্যুটি অতিরঞ্জিত মনে করেন কিনা ?
মনে করি. সাজানো .করি না

৮. জঙ্গীবাদ সম্পর্কিত রিপোর্টের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের আরো দায়িত্বশীল হওয়া উচিত মনে করেন কি না?
অবশ্যই. প্রয়োজন নেই. বস্তুনিষ্ঠ হওয়া উচিত

৯. রাজনীতির সাথে জঙ্গীবাদের সম্পর্ক আছে কি না?
আছে. নাই. মন্তব্য নেই

১০. বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ নিরসনে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের রিপোর্টে আপনি কতখানি সন্তুষ্ট?
মোটামুটি. সন্তুষ্ট নই. বাড়াবাড়ি

১১. বাংলাদেশের ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান জঙ্গীবাদ প্রসারে সহায়ক কিনা ?
সহায়ক . সহায়ক নয় . মন্তব্য নেই

১২. বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ বিকাশে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীগুলোর সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে আপনি মনে করেন কি না?
সম্পৃক্ততা রয়েছে. সম্পৃক্ততা নেই. থাকতেও পারে

১৩. জঙ্গীবাদ বিস্তারে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন আছে কি না?
আছে. নেই. জানিনা

১৪. দারিদ্র্য, ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব এবং বেকারত্ব জঙ্গীবাদের নেপথ্যে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে কি না?
করছে. করছে না. জানিনা

১৫. জঙ্গীবাদ ইস্যুটি ইন্দো-মার্কিন জোটের সৃষ্ট বলে আপনি মনে করেন কি না?
মনে করি. মনে করি না. মন্তব্য নেই

১৬. জঙ্গীবাদ বিস্তারে পশ্চিমা মিডিয়ার ভূমিকায় আপনি সন্তুষ্ট কি না?
সন্তুষ্ট. সন্তুষ্ট না. জানি না

Dhaka University Institutional Repository

১৭. মুসলিম দেশগুলোতে জঙ্গীবাদ বিস্তারে ইন্দো-মার্কিন সাম্রাজ্যনীতি প্রভাব ফেলছে কিনা ?
ফেলছে. ফেলেনি. সামান্য ফেলছে

১৮. বাংলাদেশে এ যাবত ঘটে যাওয়া বোমা হামলা ও সন্ত্রাসী ঘটনাগুলোকে জঙ্গীবাদ মনে করেন কিনা?
মনে করি. মনে করি না. মন্তব্য নেই

১৯. জঙ্গীবাদ বিস্তারে পাশ্ববর্তী দেশের ইন্ধন রয়েছে বলে মনে করেন কি না?
অবশ্যই রয়েছে. ইন্ধন নেই. কিছুটা

২০. জঙ্গীবাদ রোধে গণমাধ্যমে প্রকাশিত আরো কি ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারে ?
সচেতনতামূলক. অনুসন্ধানী. বিশেষজ্ঞ মতামতধর্মী

২১. জঙ্গীবাদ নির্মূলে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্য ও সৎসাহস জরুরী বলে মনে করেন কি না?
জরুরী. দরকার নেই. হলে ভালো

২২. জঙ্গীবাদ রোধে আইনশঙ্খলা বাহিনী গণমাধ্যমকে সাথে নিয়ে কিভাবে কাজ করতে পারে?
প্রকৃত চিত্র জানানো. নেপথ্যের কারণ তুলে ধরা. নেতিবাচক দিক তুলে ধরে ইতিবাচক আলোচনা

২৩. আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এ সম্পর্কিত সংবাদগুলো কতটুকু আমলে নেয়?
আমলে নেয়, নেয় না. মোটামুটি

২৪. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা আছে বলে মনে করেন কিনা?
মনে করি. ভূমিকা নেই. মন্তব্য নেই

২৫. জঙ্গীবাদের সাথে মাদ্রাসা শিক্ষাকে জড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করেন কিনা?
প্রয়োজন. প্রয়োজন নেই. মন্তব্য নেই

২৬. ইসলাম প্রসারে বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কর্মতৎপরতাকে আপনি জঙ্গীবাদ মনে করেন কিনা?
মনে করি. মনে করি না. মন্তব্য নেই

সমাপ্ত